মা বোনেদের প্রতি কেন এত বীভৎসতা!

পরমেশ চৌধুরী

ঃ পরিবেশক ঃ
পুঁথিপত্র
৯, এন্টনি বাগান লেন,
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয়া মা
প্রফুল্ল চৌধুরী

নারী নির্যাতনের মূলে

প্রেমে শান্তি, আনন্দ, শক্তি, আধ্যাত্মিকতা, সেক্সে নেশা, হিংসা, ঘৃণা। সেক্স প্রধান, ভোগ প্রধান এ-সভ্যতায় তাই হিংসার বাজত্ব, ঘৃণার রাজত্ব। সেক্সে হতাশা, নিরাশা। তাই, সেক্সপ্রধান সভ্যতায় নারী পণ্য মাত্র। তাকে যে কোন ভাবে ভোগ করতে পারলেই হলো! নারী নির্যাতনের যে সব কারণ (বিভিন্ন সমাজ সচেতন নরনারীর) দেখিয়েছি, তাতে এদিকটার ওপর কেউ তেমন ভাবে জোর দেননি। 'আমার অভিজ্ঞতা' শীর্ষক অধ্যায়ে এ-সম্বন্ধে যতোটা আলোকপাত করা উচিৎ ছিল ততোটা করিনি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি আমার 'সখি ভালবাসা কারে কয়' (১ম খন্ড) নামক উপন্যাসে। উক্ত উপন্যাস থেকে মনঃসমীক্ষকের উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

> **"তোমরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছ। সচেতন মনে না হোক অন্ততঃ অবচেতন মনেই তোমরা অনুভব কর জন্ম তোমাদের ভালবাসা থেকে। তোমাদের জীবনের গতি আধ্যাত্মিকতার দিকে। কিন্তু তোমাদের জীবনে ভালবাসার আনন্দ নেই। বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারছ নরকাভিমুখেই তোমাদের জীবনের গতিপথ প্রধাবিত। তাই তোমরা হতাশ, তোমরা নিরাশ, তোমরা হিংস্র। ভালবাসার পথ যখন রুদ্ধ, ঘৃণার পথ যখন উন্মুক্ত — মুক্তির নামে অধঃপতনের দিকেই এগনো যাক। মানুষের পরম শত্রু শয়তানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তোমরা অভিমানে ফেটে পড়ে বলছ ঃ Evil be thou my good, — হে শয়তান, তোমাতেই গতি হোক।" — *W. R. W. Fairbairne***

> **"আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এইটেই লক্ষ্য হওয়া উচিৎ — কি করে মানুষ ভালবাসতে পারে অর্থাৎ নিজের ব্যক্তিসত্ত্বাকে অন্য একটা সত্ত্বায় মিশিয়ে দিতে পারে ভালবাসায়, সহানুভূতি, শ্রদ্ধায় সম্পৃক্ত হয়ে।" — *Michael Balint***

> **"বিভিন্ন অসামাজিক প্রবণতা প্রদমনে প্রেমের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা যদি সমাজবিজ্ঞানীরা মেনে নেন তাহলে মানব প্রগতির পথ প্রশস্ত হয় .... এক খন্ড উত্তপ্ত লোহা মানুষকে শুধু পীড়িতই করে।" — *Bertrand Russel***

নারীরা হলেন প্রেম, ভালবাসা, মায়া, মমতার আধার। কিন্তু এ-যুগে পুরুষের সঙ্গে অসুস্থ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের স্বাভাবিক গুণগুলো হারিয়ে ফেলছেন। ফলে তাদের সন্তানরাও হিংস্র শয়তানে পরিণত হচ্ছে।

ঃ সূচীপত্র ঃ

কী বীভৎস!

দৃশ্য - ১

কী বীভৎস। বহবমপুবেব ঘটনা। ধর্ষিতা হয়েও নিস্তাব পেল না ৮ বছবেব বালিকা। ডাক্তাবি পবীক্ষা কবাতে তাকে নিয়ে ববিবাব সকাল থেকে বাত পর্যন্ত তিনটি সবকাবি হাসপাতালে ছুটে নাজেহাল হতে হয়েছে পুলিশকে। মেয়েটিকে শেষ পর্যন্ত একটি মাতৃসদনে ভর্তি কবানো হলেও তাব প্রতি সবকাবি হাসপাতালেব চবম অবহেলা ধর্ষণেব অত্যাচাবকে ছাপিয়ে গিয়েছে বলে পুলিশেব অভিমত।

দৌলতাবাদ থানাব মদনপুব-নতুনপাডাব ৮ বছবেব ওই বালিকা শুক্রবাব সন্ধ্যায় খেলাধূলা কবে বাড়ি ফিবছিল। সেই সময় গ্রামেবই এক যুবক তাকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে মুখে কাপড গুঁজে ধর্ষণ কবে। ক্ষতবিক্ষত এই বালিকাব শবীব থেকে প্রচুব বক্তক্ষবণ হয়। তাব বাবা জানান, "গ্রামেব মোডলেবা প্রথমে পুলিশেব কাছে যেতে নিষেধ কবেন। তাবা বলেন 'গ্রামেই ঘটনাব মীমাংসা হয়ে যাবে।' গ্রামেবই এক হাতুডে ডাক্তাব মেয়েব চিকিৎসা শুরু কবেন। কিন্তু মেয়েব শবীবেব অবস্থাব অবনতি হতে থাকে। মীমাংসাব কোন লক্ষণ দেখা যায নি।" গুরুতব আহত অবস্থায় ববিবাব সকালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয ইসলামপুব গ্রামীন হাসপাতালে। সেখানকাব চিকিৎসকেবা ঘটনাটি শুনে চিকিৎসা না কবে থানায নিয়ে যেতে বলেন। তখন মেয়েটিকে থানায নিয়ে যাওয়া হয়।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় দৌলতাবাদ থানা থেকে মেয়েটিব ডাক্তাবি পবীক্ষাব জন্য পাঠানো হয বহবমপুব সদব হাসপাতালে। দৌলতাবাদেব ও সি দীপক দাস বলেন, "ওই হাসপাতালেব কর্মীবা জানান, ববিবাব কোন পবীক্ষা হবে না। ওকে অন্য জায়গায় নিয়ে যান।" সদব হাসপাতাল থেকে এব পব তাকে নিয়ে যাওয়া হয় নিউ জেনাবেল হাসপাতালে। সেখানে বলা হয়, 'না। অন্য জায়গায় যেতে হবে।' এদিকে, মেয়েটি ক্রমশ ঝিমিয়ে পডছিল। এবাব তাব পবীক্ষাব জন্য যাওয়া হয সদব হাসপাতাল পবিচালিত মাতৃ সদনে। মেয়েটিব বাবা বলেন, "এক চিকিৎসকেব দয়ায মাতৃ সদনে মেয়েকে ভর্তি কবানো হয়।" সদব হাসপাতালেব ওই চিকিৎসকেব নাম বিমান চট্টোপাধ্যায। তিনি বলেন, "নিউ জেনাবেল হাসপাতাল থেকে ফেবত পাঠানোব পবে তাকে ভর্তি নেওয়া হয়েছে।"

ভর্তি কবানো হলেও তিন দিনেব বক্তক্ষবণ ও টানাহ্যাঁচডায মেয়েটি গুরুতব অসুস্থ হয়ে পডে। চিকিৎসকেবা জানান, খুব তাডাতাডি বক্ত দিতে হবে। না-হলে ওকে বাঁচানো সম্ভব নয়। বালিকাব বক্তেব গ্রুপ 'ও পটিজিভ'। ওই গ্রুপেব বক্ত হাসপাতালে ছিল না। ওসি দীপকবাবু বলেন, 'হাসপাতাল থেকে থানায ওই খবব পৌঁছনোব পবে কয়েকজন হোমগার্ড ও এলাকাব যুবককে জিপে কবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদেব দেওয়া বক্তেই কোনও মতে ওই

বালিকা বেঁচে আছে। অক্সিজেন, স্যালাইন, রক্ত সবই বাইরে থেকে এনে দেওয়া হচ্ছে।" ধর্ষণের ঘটনায় মিজান শেখ নামে এক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দৌলতাবাদ থানার এক অফিসার বলেন, "তিনটি সবকারি হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্মীরা যেভাবে একটি বালিকার চিকিৎসা নিয়ে ট্যানাহ্যাঁচড়া করেছে, তা ধর্ষণের অপরাধকেও হার মানিয়েছে। ধর্ষণের ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রায়ই এই ধরণের অমানবিক আচরণ করে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বিজন কুমার মন্ডল বলেছেন, "রবিবার আমি জেলাব বাইরে ছিলাম। ঘটনার কথা এই প্রথম শুনলাম। যথাযথ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" বহরমপুর সদব হাসপাতাল ও নিউ জেনারেল হাসপাতালের সুপার ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বোগীকে প্রথমে ভর্তি না নিয়ে ফেবত পাঠিয়ে পরে ভর্তি নেওয়া হয়েছে কি না, খোঁজ নিয়ে দেখছি। ঘটনা সত্যি হলে রোগীকে হয়রান করে মারাত্মক অন্যায় করা হযেছে। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

দৃশ্য - ২

আগেকার ডাকাতদের পৌরষত্ব ছিল, বীরত্ব ছিল। তারা চট্ করে মেয়েদের গাযে হাত দিন না, অসম্মান করত না, কিন্তু এখনকার ডাকাতবা ভীরু, দুর্বল অপদার্থের দল। এরা টাকাপয়সা, গয়নার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের দেহটাও ডাকাতি করে। সন্তানের সামনে এক মহিলাকে ধর্ষণ করে সোনার গয়না ও টাকাকড়ি লুঠ করেছে এক দল দুষ্কৃতী। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের সালার থানার পৌয়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটেছে। মহিলার স্বামী জীবিকার সন্ধানে কয়েক মাস আগে দিল্লী গিয়েছেন। মহিলা একলা রয়েছেন জানতে পেরে দুষ্কৃতীরা তার উপরে চড়াও হয়। ধর্ষণেব পরে তার মুখে কাপড় গুঁজে খুঁটিতে হাত-পা বেঁধে রেখে যায়।

অত্যাচারের অবশ্য এখানেই শেষ নয়। তিন ও পাঁচ বছরের দুই সন্তানের জননী ওই মহিলাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে গ্রামবাসীরা এক হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাকে সালার ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ব্লক মেডিক্যাল অফিসার বহরমপুর সদর হাসপাতালে পাঠানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু সালার থেকে টেঁয়া স্টেশনে পৌঁছে মহিলার অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। তার অবস্থা দেখে স্টেশন ম্যানেজার তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস থামিয়ে তাকে বহরমপুরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যায় বহরমপুর সদর হাসপাতালে পৌঁছনোর পরেও তার দুর্ভোগের শেষ হয় নি। সেখানকার এক চিকিৎসক ব্লক মেডিক্যাল অফিসারের লিখিত নির্দেশ না পড়েই তাকে নিউ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানোর নির্দেশ দেন। সালার হাসপাতাল থেকে তাঁকে সদর হাসপাতালে পাঠানোর নির্দেশে ব্লক মেডিক্যাল অফিসার পরিষ্কার লিখে দিয়েছেন, ওই মহিলা ধর্ষিত কিনা, নিশ্চিত হওয়ার জন্য সদর হাসপাতালে পাঠানো হল'। তবুও কেন মহিলাকে নিউ সদর হাসপাতাল থেকে অন্যত্র পাঠানো হল সেই প্রশ্নের জবাবে ওই চিকিৎসক বলেন, "আমি লেখা না পড়েই মহিলাকে নিউ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানোর কথা লিখেছি।" শেষ পর্যন্ত অবশ্য চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের চাপে ওই মহিলাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। কিন্তু সারা দিনের এই টালবাহনায় তার মেডিক্যাল পরীক্ষা এদিন আর হয়ে ওঠেনি।

মহিলার আত্মীয়রা পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের অভিযোগ, 'সকালেই থানায় ফোন করে ও সি'কে সব কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু এদিন দুপুরে সালার থানার একজন

অফিসার এসে তার সঙ্গে কথা বলার পরেই চলে গিয়েছেন।" কান্দির মহকুমা পুলিশ অফিসার কল্লোল গনাইয়ের বক্তব্য, "ঘটনার কথা জানা নেই। কি ঘটেছে খোঁজ নিয়ে দেখছি। তারপর যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" (আনন্দবাজার ৬/০৭/০৩)

দৃশ্য - ৩

ধর্ষিত ও টানা রক্ত ক্ষরণে মুমূর্ষু পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গিয়ে মঙ্গলবার গোটা রাত হত্যে দিয়ে পড়ে রইলেন বিপন্ন বাবা। সুবিচারের আশায়। কিন্তু আবেদন-নিবেদন, বিস্তর কাকুতিমিনতি সত্ত্বেও তার অভিযোগটুকু পর্যন্ত নেওয়া হয নি। বরং পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বিষয়টি নিয়ে বেশি হইচই না করে নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে ফেলুন।

এই ডামাডোলে গুরুতর অসুস্থ শিশুটির মেডিক্যাল পরীক্ষাও এখনও হয নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধান্যখেড়ুর গ্রামে যেতেই তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশের পরামর্শ শুনে বর্ধমানের মন্তেশ্বর থানা এলাকার ধান্যখেড়ুর গ্রামের বাসিন্দা, ধর্ষিতার বাবা মহাদেব হেমব্রমের প্রশ্ন 'এরা কি মানুষ?'

মহাদেববাবুর আরও প্রশ্ন, "মেয়েকে নিয়ে যাওযার পরে ওরা গভীর রাত পর্যন্ত বসিয়ে রাখল। যে আমার মেয়ের উপরে অত্যাচার করেছে, সে আমাদের এলাকার এক সি পি এম নেতার ছেলে। সেই জন্যই কি পুলিশ আমাকে মীমাংসা করে নেওয়ার পরামর্শ দিল?"

ধান্যখেড়ুর বাসিন্দারা জানান, সি পি এম নেতার ছেলেটি মহাদেববাবুর মেয়েকে গ্রামের মাঠে একা পেয়ে ধর্ষণ করেছে। মঙ্গলবার সকালের এই ঘটনার পরে ওই দিন দুপুরে তার মেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু যন্ত্রণার চোটে প্রথমে সে কোনও কথাই বলতে পারেনি।

কিছু পরে সামান্য সুস্থ হযে শিশুকন্যাটি যতটুকু বলতে পারে, তা থেকে তারা বুঝতে পারেন, সে ধর্ষিত হযেছে। বাড়ির লোকজনকে শিশুটি ওই যুবকের নামও বলে দেয়। শিশু কন্যাটিকে বুধবাব বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে বলা হয়, ধর্ষণের ফলে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে শিশুটির। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মঙ্গলবার দুপুরে শিশুটি বাড়িতে ফেরার পরে তার বাবা মহাদেব হেমব্রম ওই অবস্থাতেই তাকে নিয়ে সন্ধ্যায় মন্তেশ্বর থানায চলে যান। পেশায় ক্ষেতমজুর মহাদেববাবুর অভিযোগ, থানায় ধর্ষণের অভিযোগ নিযে যাওয়ার পরেই তাকে ভাগিয়ে দেওয়া হয়।

মহাদেববাবুও সি পি এমের কট্টর সমর্থক। তিনি সি পি এমের মন্তেশ্বর-৩ লোকাল কমিটির অফিসে গিয়ে গোটা ঘটনার কথা বিস্তারিত ভাবে জানান। মহাদেববাবুর মুখে সব শুনে লোকাল কমিটির সম্পাদক নীলু ভট্টাচার্য থানায় টেলিফোন করে ধর্ষণের অভিযোগ নথিভুক্ত করা এবং অবিলম্বে অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ও সি-কে অনুরোধ করেন। নীলুবাবুর কথায় আশ্বস্ত হয়ে মহাদেববাবু মেয়েকে নিয়ে ফের থানায় যান। শিশুটি ততক্ষণে প্রচন্ড জ্বরে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে।

বুধবার বিকেলে নীলুবাবু জানান, পুলিশ প্রথমে রাজি না হলেও মঙ্গলবার গভীর রাত পর্যন্ত বাবা ও মেয়েকে থানায় বসিয়ে রেখে অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে ডায়েরী নিয়েছে। কিন্তু স্থানীয় সি পি এম নেতা এ কথা বললেও মন্তেশ্বর থানার ও সি সামশের আলি মহাদেববাবুর দু'বার থানায়

ছুটে যাওযার কাহিনী নস্যাৎ করে দেন এবং উল্টে দাবি করেন, "আমার কাছে ধর্ষণের ব্যাপারে কোন অভিযোগই দায়ের হয় নি। মহাদেব হেমব্রম থানায় এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি বলে গিয়েছেন, বিষয়টি নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নেবেন। তাই আমরা কাউকে ধরতেও পারিনি।"

ও সি-র এই বক্তব্য শুনে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ নীলু ভট্টাচার্য বলেন, "আমার জানা ছিল না যে, পুলিশ অভিযোগ নেয়নি। এত বড় ঘটনাটা পুলিশ চেপে যাচ্ছে কি করে? দরকার হলে আমরাই ছেলেটিকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেব।"

সি পি এম সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতেই এক দল কর্মী অভিযুক্ত যুবকটিকে ধরার জন্য ওই এলাকায় খোঁজ চালাচ্ছেন।

মহাদেববাবু জানান, "ও সি বললেন, বাড়ি গিয়ে ব্যাপারটা মিটমাট করে নাও। সারা রাত থানায় বসে থাকার জন্য মেয়েকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারি নি। সকালে ওকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি।"

কিন্তু গুরুতর অসুস্থ শিশুটির এ দিন রাত পর্যন্ত মেডিক্যাল পরীক্ষা হয় নি। হাসপাতালের ডেপুটি সুপার মঞ্জুর মুর্শেদ রাতে বলেন, "পুলিশ বা আদালতের নির্দেশ ছাড়া আমরা মেডিক্যাল পরীক্ষা করাই না। পুলিশ বা আদালত যদি বলে, তা হলে শিশুটির ওই পরীক্ষা হবে।"

জেলার পুলিশ সুপার বি এন রমেশ অবশ্য থানায় অভিযোগ না নেওয়ার এই ঘটনার কথা জানেন না। তিনি বলেন, "এই ধরণের ঘটনার কথা আমার জানা নেই। তবে অভিযোগ দায়ের না-করে পুলিশ কাউকে মীমাংসা করে নিতে বলার অধিকারী নয়। আমি এখনই অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে ওই অভিযোগের ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছি। দোষী প্রমাণিত হলে ও সি কঠোর শাস্তি পাবেন।"

তদন্ত চলুক, ততক্ষণে ছোট্ট মেয়েটির শরীর থেকে হয়তো বেরিয়ে যাবে আরও আরও রক্ত।

দৃশ্য - ৪

মানব সমাজ আজ সত্যিই শাপদসংকুল অরণ্যে পরিণত হয়েছে। খবর পড়লাম (০৭/০২/০৩) নদীয়া থেকে অনিমেশ সরকারের রিপোর্ট ঃ

বিয়েবাড়ির দুটি বাস, একটি মালবোঝাই টেম্পো ও একটি গাড়ির যাত্রীদের সর্বস্বান্ত করেছে ডাকাতেরা। পুরুষ যাত্রীদের বাস দু'টির ছাদে তুলে দিয়ে মহিলাদের উপরে রাতভর অত্যাচার চালায় তারা। দুষ্কৃতীদের বাধা দিতে গিয়ে বাসের চালকও খুন হন। বুধবার রাতে ভয়াবহ এই ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার ধানতলা থানার আইসমালিতে। রাতে ওই রাজ্যে সড়কে ছিল না কোনও টহলদার পুলিশবাহিনী। সেই সুযোগে রাত সাড়ে দশটা থেকে ভোর চারটে — সাড়ে পাঁচ ঘন্টা ধরে লুঠপাঠ ও মহিলাদের উপর অত্যাচার চালায় সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা। থানা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে ঘটনা ঘটলেও সকাল পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেননি পুলিশ। সাম্প্রতিক কালে এ রাজ্যে এ-রকম ভয়াবহ ডাতাতির ঘটনা ঘটেনি।

দুষ্কৃতীরা যে দু'টি বাসে বাসের মহিলাদের শ্লীলতাহানি করেছে, আক্রান্ত মহিলাদের কথাতেই তা পরিষ্কার। বাসের যাত্রী বেলা গুহরায় বলেন, "ডাকাতেরা আমাদের সঙ্গে চরম অসভ্যতা করেছে।" দুই তরুণীকে বাস থেকে নামিয়ে তাদের উপর অত্যাচার চালানো হয়েছে

বলে অভিযোগ করেছেন বেলাদেবী। বাসের যাত্রী কণিকা দে বলেন, "আড়াই বছরের মেয়ে বন্যাকে বাস থেকে নামিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। এর পরে আমার শরীর থেকে একে একে খুলে নেয় সোনার গহনা।" মহিলারা জানিয়েছেন, "আমাদের উপরে যখন অত্যাচার চলছিল তখন, রাস্তার পাশে নির্মিয়মান স্কুলবাড়ির ভিতর থেকে মেয়েদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।" পুলিশ জানিয়েছে, তাদের কাছে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেছেন বেশ কয়েকজন মহিলা। তবে ধর্ষণের অভিযোগ করেননি কেউই। রানাঘাট-রথতলা থেকে ধানতলার রাস্তার মাঝখানে মজজিদপাড়া। রাস্তার পাশে তৈরী হচ্ছে একটি স্কুল। এই স্কুলের মধ্যেই দুষ্কৃতীরা লুকিয়ে ছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। তারা সংখ্যায় ছিল অন্তত ১৫ জন। ঘটনার সূত্রপাত বুধবার রাত সাড়ে দশটায়। রিভলবার, কুড়ুল, রামদা, লাঠি ও বোমা নিয়ে তারা একটি মালবাহী টেম্পো আটকায়। টেম্পোটি দিয়েই দুষ্কৃতীরা রাস্তা বন্ধ করে দেয়। টেম্পোটি নির্মীয়মান স্কুলটির সামনে জমি থেকে মটরশুঁটি তুলতে এসেছিল। দুষ্কৃতীরা মটরশুঁটির বস্তাগুলি ও স্কুল তৈরির জন্য রাখা ইট দিয়ে ব্যারিকেড করে দেয়। গাড়ির চালক দেবগ্রামের বাসিন্দা আলা মন্ডলকে কলাগাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিয়ে বাড়ির একটি বাস এসে পড়ে। বাসটি রানাঘাট থানার কামগাছি উত্তর ২৪ পরগণার গোপালপুর থানার কুঁচিয়ামোড়ায় যাচ্ছিল। দুষ্কৃতীরা ওই বাসের চালক সমীর ঘোষকে দরজা খুলে দিতে বলে।

বাসযাত্রীরা বলেন, "সমীরবাবু দুষ্কৃতীদের বলেন, 'এ কাজ করিস না।' দুষ্কৃতীরা সমীরবাবুর কপালে রিভলবার ঠেকিয়ে গুলি করে। লুটিয়ে পড়েন সমীরবাবু।" তখনও বাসযাত্রীরা বুঝতে পারেননি, কী ঘটতে চলেছে।

দুষ্কৃতীরা চালকের কেবিনের দরজা খুলে বাসের মধ্যে ঢুকে লুঠপাঠ চালায়। বৃহস্পতিবার সকালে কুঁচিয়ামোড়া গ্রামের কার্তিক ঘোষের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, বৌভাতের প্রস্তুতি থেমে গিয়েছে। কার্তিকবাবুর ছেলে মিলনের বিয়েতে কমপক্ষে ৫০ জন বরযাত্রী গিয়েছিলেন। ফেরার পথে ডাকাতদের হামলার মুখে পড়তে হবে, এমন আশঙ্কা বরযাত্রীরা করেছিলেন। তাই চালককে তারা বলেছিলেন, রাতে কামগাছি থেকে রওনা না-হওয়াই ভাল। বরযাত্রীদের কথায়, "আমাদের অভয় দেন সমীরবাবু।"

বাস আইসমালিতে মসজিদপাড়ায় আসতেই চালক দেখেন রাস্তা বন্ধ। বাস দাঁড়িয়ে যায় টেম্পোর পিছনে। এর পরেই বাসের দখল নেয় দুষ্কৃতীরা। বাসের যাত্রীরা জানান, ছেলেদের সর্বস্ব কেড়ে তাদেক বাস থেকে নামিয়ে বাসের ছাদে তুলে দেওয়া হয়। বাসে তখন মহিলা ও শিশুরা রয়েছে। মহিলাদের সব কেড়ে তাদের কয়েকজনকে নির্মীয়মান স্কুল বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় বলে যাত্রীদের অভিযোগ। সেখানে ওই মহিলাদের উপর অত্যাচার চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

তখনই বরযাত্রী বোঝাই আর একটি বাস ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সেটি থেমে যায় প্রথম বাসটির পিছনে। রাত তখন সওয়া একটা। ধানতলা থানার নওয়াপাড়া থেকে এড়ুলিতে যাচ্ছিলেন ওই বারযাত্রীরা। প্রথম বাসের পিছনে দ্বিতীয় বাসটি থামা মাত্রই দুষ্কৃতীরা সেটির চালককে ঘিরে ধরে। বাসচালকের কপালে রিভলবার ঠেকিয়ে তাকে বাস থেকে নামিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। চালকের কেবিনের খোলা দরজা দিয়ে জনা পাঁচেক দুষ্কৃতী বাসের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ওই বাসের যাত্রী

অরিন্দম সমাজদার, তাপস সরকার, প্রতাপ বৈদ্যরা জানান, "আমরা ডাকাতদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। ওরা গালিগালাজ করতে শুরু করল। তার পরেই লুঠপাট।" ওই বাসটিতে ৮০ জনের মতো যাত্রী ছিলেন। তাদের মধ্যে ২০ জন পুরুষকে বাস থেকে নামিয়ে ছাদে তুলে দেয় দুষ্কৃতীরা। এর পরে মহিলাদের উপরে চলে অত্যাচার।

বৃহস্পতিবার সকালে এডুলিতে গিয়ে দেখা যায়, সৌমিত্র বিশ্বাসের বৌভাতের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শিকেয় উঠেছে। রাতের ভয়াবহ ঘটনার জের কাটিয়ে উঠতে পারেননি সৌমিত্রবাবুর আত্মীয়েরা। ডাকাতির প্রতিবাদ করতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে মার খেয়েছেন ওই বাসের যাত্রী তাপস শিকদার। তিনি বলেন, "মার খেয়ে আমি বাসের ছাদে মুখ বুজে পড়েছিলাম। দুষ্কৃতীরা তখন বলছে, "আগের বাসের চালককে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। তোরা কেউ কথা বললে তোদেরও মারা হবে।"

এর মধ্যেই একটি টাটা সুমো গাড়ি সেখানে পৌঁছায়। দুষ্কৃতীরা সেই গাড়ির উপরেও চড়াও হয়। তাদের নির্মিয়মান স্কুল বাড়ির মধ্যে বেঁধে রাখা হয়। বাসযাত্রীরা জানান, ভোর চারটে নাগাদ দুষ্কৃতীরা তাদের ছেড়ে দিয়ে ফাঁকা মাঠ দিয়ে পালায়। তখন বাসযাত্রীরা চিৎকার করে আইসমালি পশ্চিমপাড়ার লোকেদের ডাকেন। গ্রামবাসীরাই পুলিশকে খবর দেন। খবর যায় বিয়ে বাড়িতেও। পুলিশ ও বরের বাড়ির লোকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সবাইকে উদ্ধার করেন।

চরমভাবে লাঞ্ছিত বাসযাত্রীদের অভিযোগ, রাতভর দুষ্কৃতীরা হামলা চালালো অথচ পুলিশ টেরও পেল না। বুধবার ওই আইসমালির রাস্তায় কেন পুলিশি প্রহরা ছিল না, তা পুলিশকর্তারা খতিয়ে দেখছেন। রাজ্য পুলিশ অবশ্য ঘটনাটিকে পুলিশের ব্যর্থতা বলতে রাজি নন। কলকাতায় রাজ্যের আই. জি. (আইনশৃঙ্খলা) চয়ন মুখোপাধ্যায় বলেন, জাতীয় সড়কে পুলিশ পাহারা থাকে। কিন্তু ওই দু'টি বাস যাচ্ছিল রাজ্য সড়ক দিয়ে। গ্রামের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাকা রাস্তা। সেখানে সাধারণত পুলিশ থাকে না। চয়নবাবু বলেন, নদীয়া জেলাতেই মাস সাত-আটেক আগে এ-রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। দুষ্কৃতীরা ধরা পড়েছিল বলে দাবী রাজ্য পুলিশের আই. জি.-র। এই নারকীয় বীভৎস ঘটনার নায়ক যারা তারা স্থানীয় সি পি এম সদস্য। সেই দিন কত জন নারী ধর্ষিতা হয়েছিলেন? বামফ্রন্ট মনোনীত মহিলা কমিশনের মতে ২ জন। সি আই ডি-র মহিলা অনুসন্ধানী দলের মতে ৪ জন। বি জে পি সংসদীয় দলের মতে ৭ জন।

পুলিশ-প্রশাসন যে প্রথম থেকেই নারী-নির্যাতনের বিষয়টি চেপে যেতে চেয়েছে, মহিলা কমিশনর রিপোর্টের ছত্রে ছত্রে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

- আইসমালি রোডের ঘটনাস্থল থেকে আধ কিলোমিটার দূরে পুলিশ ফাঁড়ি থাকা সত্ত্বেও গভীর রাতে গুলি এবং কান্নকাটির আওয়াজ শুনতে পায় নি পুলিশ।
- ঘটনার পরেই অপরাধীদের সঙ্গে পুলিশকে এলাকায় ঘুরতে দেখা গিয়েছে। অপরাধীর সঙ্গে মাখামাখির ব্যাপারে বিশেষ করে স্থানীয় থানার ও সি সুভাষ রায়ের নামে অভিযোগ করেছে কমিশন।
- ঘটনার পরে ধানতলা থানায় গিয়ে স্থানীয় সি পি এম নেতা সুবল বাগচি (পরে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ) খোদ এস পি-কে ধর্ষণের কথা জানিয়েছিলেন। থানা থেকে সেই ব্যাপারে কোন তদন্তই করা হয় নি।

- ধানতলা থানার ও সি জানিয়েছেন, একটি পুলিশ ভ্যান এক দিন অন্তর রাতে আইসমালি রোডে টহল দেয়। ঘটনার দিন ওই ভ্যানটি ছিল না। যে-দিন টহলদার ভ্যান থাকে না, সে-দিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা কী থাকে, তার সদুত্তর দিতে পারেননি ও সি।

পুলিশ যে গোটা ঘটনাটিকে হাল্কা করে অভিযুক্তদের বাঁচাতে চেয়েছে, তা বোঝাতে মহিলা কমিশন আরও কিছু তথ্য তুলে ধরেছে। যেমন —

- ওই বাসযাত্রীদের কাছ থেকে পুলিশ ১৬১ ধারায় যে-বিবৃতি নিয়েছে, সব ক্ষেত্রেই ভাষা হুবহু এক।
- কমিশনেব সদস্যরা বারবার প্রশ্ন করা সত্ত্বেও ধানতলা থানার ও সি জানিয়েছিলেন, নারী নির্যাতনের কোন অভিযোগই তিনি পান নি। কোনও মহিলাকেই বাস থেকে নামানো হয় নি।
- বাসের খালাসি দিলীপ ঘোষ মহিলাদের বাস থেকে নামানো এবং অত্যাচারের কথা থানার ও সি-র কাছে জানিয়েছিলেন। কমিশনের সদস্যাদের কাছেও ও সি বিষয়টি চেপে গিয়েছিলেন। দিলীপ ঘোষের এজাহার থানায় লিপিবদ্ধ করা নেই।

যশোধরাদেবী বলেছেন, তদন্তের নামে পুলিশ নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। তা বন্ধ করতে হবে। নিহত বাসচালকের স্ত্রীর জন্য চাকরি ও মেয়েদের পড়াশোনা চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে। তদন্ত-রিপোর্টে বলা হয়েছে, ৫ ফেব্রুয়ারী রাতে ঘটনা ঘটলেও ২২ ফেব্রুয়ারীর আগে পুলিশরে কাছে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। কমিশনের সদস্যাদের সামনে ওই দিন ছ'জন এফ আই আর করেছিলেন। মোট ২৪ জন মহিলা যাত্রী ছিলেন দুটি বাসে। কমিশনের সদস্যারা কথা বলেছেন ১০ জনের সঙ্গে। বাকিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পাবেননি তারা। সদস্যারা নির্যাতিতাদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছেন, রাস্তাব পাশে নির্মিয়মান স্কুলবাড়িতে নয়, মহিলাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পাশের কলাবাগানে ও মাঠে। ধর্ষণ হলেও ধানতলায় গণধর্ষণের কোনও ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে মহিলা কমিশন।

পুলিশ ধানতলায় ধর্ষণ-বৃত্তান্ত এড়াল কেন, প্রশ্ন জাতীয় মহিলা কমিশনের

বাস থেকে টেনে নামিয়ে ধর্ষণ করার পরেও পুলিশ কেন ঘটনাটি এড়িয়ে গেল, সেই প্রশ্ন তুলল জাতীয় মহিলা কমিশন। গোটা ঘটনা জানার পরে পুলিশ নিজ দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করেছে কিনা, তা নিয়েও কমিশনের সন্দেহ। জাতীয় মহিলা কমিশনের চার প্রতিনিধি ধানতলা গিয়েছিলেন। দিল্লী ফিরে যাওয়ার আগে কমিশনের নেত্রী সুধা মালিয়া জানালেন, ধানতলা কান্ড নিয়ে ৪ মার্চের মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে রিপোর্ট পেশ করা হবে। রিপোর্ট পাঠানো হবে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছেও।

রাজ্য মহিলা কমিশন ধানতলা নিয়ে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন। ওই রিপোর্টে ধর্ষণের ঘটনার সত্যতা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের ভূমিকার তীব্র সমালোচনাও ছিল। বিরোধী দলের ঢঙে কমিশন পুলিশের সঙ্গে দুষ্কৃতীদের মাখামাখির প্রসঙ্গও তোলা হয়েছিল। ধানতলা থানার ও সি-র বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ এনেছিল মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। মহিলা কমিশনের রিপোর্ট দেওয়ার পরে ধৃতদের বিরুদ্ধে পুলিশ ডাকাতি, নির্যাতনের পাশাপাশি ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হলো। তবে ধানতলা থানার ও সি বহাল তবিয়তে রয়ে গিয়েছেন

নিজের পদেই। মহাকরণে এ দিন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জানিয়ে দিলেন, "যা বলার বিধানসভায় বলব।"

আইসমালি পঞ্চায়েত অফিসের সামনে সি পি এমের গ্রাম প্রধান হিমাংশু বিশ্বাস নির্যাতিতাদের কমিশনের সামনে হাজির করান। ধানতলা ছাড়াও উত্তর ২৪ পরগণার গোপালনগরের কুচিয়ামোড়া গ্রামে যান কেন্দ্রীয় কমিশনের সদস্যরা। সেখানেও নির্যাতিতাদের সঙ্গে একান্তে কথা হলো তাদের। পরে জাতীয় মহিলা কমিশনের নেত্রী সুধা দেবী বলেন, "৫ ফেব্রুয়ারী রাতে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনার পিছনে কারা আছে, তা খতিয়ে দেখতেই আমরা এখানে এসেছি।" তিনি জানান, ছ'জন মহিলা কমিশনের কাছে সেই রাতে তাদের উপরে অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছেন।

রাজ্য মহিলা কমিশনের রিপোর্ট মোতাবেক, পুলিশ প্রথম থেকে মহিলাদের উপরে নির্যাতনের ঘটনা চেপে যেতে চেয়েছিল। এখনও ওই ঘটনায় অভিযুক্ত কয়েকজনকে পুলিশের সঙ্গে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল। কমিশন ধানতলা থানার ও সি সুভাষ রায়ের বিরুদ্ধেও অভিযোগ এনেছিল। মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডি আই জি দুর্গাপ্রসাদ তারানিয়া অবশ্য ওই সব অভিযোগ মানতে চান নি। নদীয়ার পুলিশ সুপার বিনয় চক্রবর্তীকে পাশে বসিয়ে ডি আই জি বলেন, "ধর্ষণের অভিযোগ চেপে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। অভিযোগ আসার সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।" ডি আই জি-র দাবি, সামাজিক কারণে মহিলারা প্রথমে মুখ খোলেননি। অভিযোগ দেরীতে নথিবদ্ধ হওয়ায় নির্যাতিত মহিলাদের ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয় নি।

জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যাদের প্রশ্নের মুখে এদিন জেরবার হতে হয় ধানতলা থানার ও সি সুভাষ রায়কে। কমিশনের দুই প্রতিনিধি সুধা মালিয়া ও নাফিসা হোসেন তার কাছে জানতে চান, সেই রাতে পুলিশ কোথায় ছিল? নিকটবর্তী পুলিশ ক্যাম্প ঘটনাস্থল থেকে কত দূরে? সেখানে পুলিশের সংখ্যা কত? ও সি-র কাছে কমিশনের অন্য দুই প্রতিনিধি পি আর কক্কর এবং কে গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশ্ন ছিল, এত বড় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও পুলিশ তা জানতে পারল না? সেই রাতে যেখানে তুলে নিয়ে গিয়ে মহিলাদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়েছিল, সেই নির্মিয়মাণ মাদ্রাসা কারা চালান, পুলিশ প্রশাসনের কাছে তা-ও জানতে চান কমিশনের প্রতিনিধিরা। রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশের স্পেশাল সুপার রামফল পাওয়ার জানান, এখনও পর্যন্ত ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সুলতান সহ কয়েকজন দাগী অপরাধীকে হন্যে হয়ে খোঁজা হচ্ছে। সুলতানই বাসচালক সমীর ঘোষকে গুলি করে খুন করেছে বলে তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে।

ধানতলার ঘটনার তদন্তে আসা জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিদের অত্যাচারিতাদের কাছে যেতে দেওয়া হয়নি বলে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মানস ভুঁইয়া অভিযোগ করেছেন। ওই প্রতিনিধিদলের কাছে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারী প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাণাঘাটের মহকুমাশাসকের দফতরের সামনে বিক্ষোভ-সমাবেশ হবে বলে মানসবাবু জানিয়েছেন। তার দাবি, "ধানতলা থানার ও সি-কে বরখাস্ত এবং জেলার পুলিশ সুপারকে অপসারণ করতে হবে।" অন্য দিকে, পি ডি এসের সাধারণ সম্পাদক সমীর পুততুন্ড দাবি করেছেন, ধানতলার ঘটনার তথ্যপ্রমাণ লোপাটের কাজে যুক্ত সকলকে শাস্তি দিতে হবে।"

দৃশ্য - ৫

ধানতলার কায়দায় কন্যাযাত্রীদের গাড়ি লুঠ করে পাঁচ নাবালিকাকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে তাদের ধর্ষণ করল দুষ্কৃতীরা। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড় থানা এলাকার পাথরডোবা জঙ্গলে।

গোয়ালতোড় থানার পুলিশ অবশ্য ঘটনাটি চাপা দেওয়ার চেষ্টায় দাবি করেছে, 'এমন কোন ঘটনা ঘটেনি। কন্যাযাত্রীদের গাড়িতে ডাকাতির খবরও ঠিক নয়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীনিবাস কিন্তু স্বীকার করেছেন, "ডাকাতি হয়েছে। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।" জেলাশাসক জানান, ডাকাতির সঙ্গে গ্রামাবাসীরা শ্লীলতাহানির অভিযোগও করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই ঘটনার পরেই সেখানে হাজির হয়ে টহলদার পুলিশ অফিসার তাদের অভিযোগ নথিভুক্ত করেছিলেন। অত্যাচারিত এক নাবালিকাকে জঙ্গল থেকে এক পুলিশকর্মীই উদ্ধার করে আনেন। রাতে ওই ঘটনার ঘটে এবং তার পরেই পুলিশ সেখানে গিয়ে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে। কিন্তু তার পরেও মঙ্গলবার পর্যন্ত গোয়ালতোড় থানা ঘটনাটি অস্বীকার করে চলেছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তদন্তভার নিয়েছেন।

শনিবার রাতে এই ধরণের ঘটনা ঘটলেও রবি ও সোমবার পুলিশ-প্রশাসনের কোনও কর্তাই ঘটনাস্থলে যাননি। মঙ্গলবার দুপুরের পরে জেলাশাসক এম ভি রাও, অতিরিক্ত জেলা শাসক ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারা সদলবলে ঘটনাস্থলে দৌড়ন। এদিন বেলা ১১টা থেকে কাদরার মোড়ে পথ অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা।

এ দিন মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, "ঘটনা একটা ঘটেছে। অফিসারেরা ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। ওরা ফিরলে রিপোর্ট পাব। তার পরে বিস্তারিত ভাবে বলতে পারব।"

ঘটনাস্থল থেকে ফিরে জেলাশাসক রাও বলেন, "এস ডি ও (সদর) ওখানে গিয়েছিলেন। গ্রামবাসীরা লিখিত অভিযোগে বলেছেন, 'গাড়ি দাঁড় করিয়ে ডাকাতি হয়েছে। দুষ্কৃতীরা কান থেকে টেনে গয়না খুলেছে। মহিলাদের টেনে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দু'ঘন্টা পরে তাদের উদ্ধার করা হয়। গোয়ালতোড় থানায় মামলা শুরু হয়েছে।" গ্রামবাসীরা যেহেতু বলেছেন, নাবালিকাদের জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাই অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক।

গোয়ালতোড় থানা এলাকার উমরাপাতা গ্রামের বাসিন্দা মোহন আহিরের মেয়ে কাজলের বৌভাত ছিল শনিবার রাতে, চন্দ্রকোণা রোডে। মোহনবাবুর দাদা হরিপদ আহির জানানা, ৬০-৬৫ জন কন্যাযাত্রী ম্যাটাডর ভ্যানে করে রাতে ফিরছিলেন। বৃষ্টির জন্য ফিরতে একটু দেরি হয়ে যায়। চন্দ্রকোণা রোড থেকে গোয়ালতোড়ের পথের দু'ধারে ঘন জঙ্গল। ঘাঘরা ও কাদরার জঙ্গলে মধ্যে পাথরডোবায় রাস্তার গাছের গুঁড়ি ফেলে দুষ্কৃতীরা ভ্যানটিকে আটকায়। হরিপদবাবুদের ভ্যান ছাড়াও দাঁড়িয়ে যায় দু'টি লরি ও একটি বাস। সেই বাসেও অন্য একটি বিয়েবাড়ির কন্যাযাত্রীরা ছিলেন। রাত সাড়ে ১১টা থেকে প্রায় দু'ঘন্টা ধরে ৬-৭ জন দুষ্কৃতী সব গাড়িতে অবাধে লুঠপাঠ চালায়। ফেব্রুয়ারির গোড়ায় নদিয়ার ধানতলায় বিয়েবাড়ির বাস আটকে লুঠপাঠ চালিয়ে মেয়েদের উপরে অত্যাচার করেছিল দুষ্কৃতীরা।

গোয়ালতোড়ের ঘটনায় কন্যাযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন উমারপাতা গ্রামের প্রহ্লাদ আহির,

মোহর সোরেন ও কুনো হাঁসদা। তারা বলেন, "ডাকাতদের মধ্যে একজন বন্দুক নিয়ে গাড়িতে উঠে পুরুষ যাত্রীদের নামিয়ে দেয়। আমাদের ঘাড় নিচু করে বসিয়ে রেখে সব কিছু কেড়ে নিয়ে ওরা মারধর করে।" প্রহ্লাদবাবুর রক্তমাখা জামা দেখিয়ে বলেন, "মারধরের পরে ওরা আমাদের পিছনের বাসে উঠে যেতে বলে। মহিলাদের নামিয়ে আনে ভ্যান থেকে।" মোহনবাবুর বড় মেয়ে মঞ্জু শিশুসন্তান নিয়ে সেই ভ্যানে ছিলেন। তিনি বলেন, "আমরা ২০-২৫জন মহিলা ছিলাম। ওরা আমাদের সমস্ত গয়না খুলে নেয়। পাঁচ জন নাবালিকাকে আলাদা করে আবার আমাদের গাড়িতে উঠে যেতে বলে। ওরা হুমকি দেয়, 'শুয়ে পড়। না-হলে গুলি করে মারব।' ১৪-১৫ বছরের পাঁচ নাবালিকাকে রেখে ওরা বাকিদের চলে যেতে বলে। আমরা ভয়ে চলে যাই।"

সেই সময় চন্দ্রকোণার আলু ব্যবসায়ী নান্টু কারক মোটরবাইক চালিয়ে মঙ্গলপাড়ায় বাড়িতে ফিরছিলেন। ডাকাতেরা তাকে দাঁড় করিয়ে লাঠিপেটা করে। মেদিনীপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নান্টুবাবু বলেন, "ডাকাতির সময় আমি ওখানে পৌঁছে যাওয়ায় ওদের রাগ হয়। আমি প্রাণভয়ে বাইক ফেলে একটি লরি ধরে রক্তাক্ত অবস্থায় গ্রামে চলে যাই।" চারটি গাড়ি থেকে দুষ্কৃতীরা প্রায় তিন লক্ষ টাকার জিনিস লুঠ করে বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। অত্যাচারিত এক নাবালিকা বলে, "আমাদের ফেলে সবাই চলে যেতেই ডাকাতেরা আমাদের পাঁচ জনকে নিয়ে জঙ্গলে ঢোকে। ওদের হাতে বন্ধুক ছিল। তাই চিৎকার করার সাহস পাই নি। তিন জন ডাকাত আমার উপরে অত্যাচার চালায়। তারা জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে আমাকে বিবস্ত্র করে অত্যাচার করে।" তার দিদি বলেন, "ঠিক কি ঘটেছিল, বোন আমাদের তা বলেনি। শুধু অঝোরে কেঁদে চলেছে। তার জামাকাপড় ও শরীরে রক্ত লেগে ছিল।"

এদিকে, কিছুক্ষণের মধ্যেই আহত নান্টুবাবু দলবল নিয়ে হাজির হন ঘটনাস্থলে। প্রায় একই সময়ে হরিপদবাবুরা পাশের গ্রাম থেকে লোকজন জোগাড় করে হাজির হন সেখানে। দেখা যায়, বিধ্বস্ত অবস্থায় বালিকারা কাঁদতে কাঁদতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে। ওই সময় টহলরত একটি পুলিশের জিপ ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে যায়। হরিপদবাবু বলেন, "জিপে যে অফিসার ছিলেন, তিনি আমাদের কথা ডায়েরিতে লিখে নেন। পাঁচ জনের মধ্যে চার জন ফিরে এলেও একজন তখনও ফেরেনি। এক পুলিশকর্মীই তখন জঙ্গলের ভিতর থেকে তাকে উদ্ধার করে আনেন।"

চন্দ্রকোণা রোড থানার ও সি রাজেন্দ্র মিত্র বলেন, "আমাদের এলাকায় এমন কোন ঘটনা ঘটেনি। তবে রবিবার গোয়ালতোড় থানার এক অফিসার আমাদের থানার অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে যৌথ অভিযান চালান। কিন্তু সেখানে কিছুই পাওয়া যায় নি।" গোয়ালতোড় থানার ও সি শ্যামল দাস বিষয়টিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, "নান্টু কারক নামে এক ব্যবসায়ী আক্রান্ত হয়েছেন বলে আমরা জানতে পারি। কিন্তু ডাকাতির ঘটনা ঘটেনি। শ্লীলতাহানির প্রশ্নই ওঠে না।"

গোয়ালতোড়ের স্থানীয় তৃণমূল নেতা রবি রায় বলেন, "ভোটের আগে পুলিশ বিষয়টি চেপে দিতে চাইছে।" স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ, গোয়ালতোড় থানার পুলিশ ম্যাটাডর ভ্যানের চালককে থানায় ডেকে পাঠিয়েছিল। তাকে বলা হয়েছে, ঘটনাটি চন্দ্রকোণা রোড থানা এলাকায় ঘটেছে বলে তিনি যেন সকলকে জানান।"

শনিবার গভীর রাতে গোয়ালতোড়ে কন্যাযাত্রীদের গাড়ির পাঁচ নাবালিকাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। এই নারকীয় ঘটনা দু'দিন ধরে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত পুলিশ স্বীকারও করেছে, মহিলাদের শ্লীলতাহানি হয়েছে। বুধবার

পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার কৈলাসচন্দ্র মীনা বলেন, "শ্লীলতাহানি তো হয়েছেই। তবে ধর্ষণ হয়েছে কি না , তা স্পষ্ট নয়। পাঁচ জনের মধ্যে এক বালিকার দেহে আঘাতের চিহ্ন আছে। তাদের দেহরসের নমুনা কলকাতায় ফরেনসিক ল্যাবরেটারিতেও পাঠানো হয়েছে।

পঞ্চায়েত ভোটের মুখে এই ঘটনা অন্য মাত্রা পেতে পারে, তা বুঝতে পেরেই মহাকরণ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে তড়িঘড়ি এক জন পুলিশ অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। শো-কজ করা হয়েছে অন্য এক অফিসারকে। অন্য তিন অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, "ধর্ষণের ঘটনার সঙ্গে সি পি এমের কর্মীরা যুক্ত। ধানতলার মতো ওখানে বলা সত্ত্বেও প্রথমে এফ আই আর নেওয়া হয় নি। পরে তৃণমূলের পথ অবরোধে বাধ্য হয়ে পুলিশ এফ আই আর নেয়।" তৃণমূল এই ঘটনার কথা উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবাণীকেও জানিয়েছেন। এস ইউ সি, সি পি আই (এম এল) লিবারেশন, পি ডি এস-ও এই ঘটনায় সি পি এমের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ও ঘটনার নিন্দা করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কিন্তু রাত পর্যন্ত কোনও বিবৃতি দেওয়া হয় নি। রাজ্য মহিলা কমিশন এই ঘটনার ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়েছে। সেই সঙ্গে মহিলা কমিশনের প্রতিনিধি দল তদন্তেও যাচ্ছে।

পুলিশ সুপার বলেন, "ডাকাতির খবর পাওয়ার পরেও কোনও ব্যবস্থা না নেওযায় কর্তব্যে গাফিলতির জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে চন্দ্রকোণা রোড বিট হাউসের অফিসার রাজেন্দ্র মিত্রকে। যে-হেতু ঘটনাস্থল গোয়ালতোড় থানার অধীন, তাই সেই থানার আই সি শ্যামল দাস সহ সংলগ্ন গড়বেতা থানার আই সি মহাকাশ চৌধুরী এবং ডি আই বি অফিসার শাজাহান মোল্লার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। শো-কজ করা হয়েছে গোয়ালতোড়ের সি আই সত্যেন্দ্র দত্তকে।"

গোয়ালতোড়ের ঘটনার কথা জানাজানি হতেই মঙ্গলবার বিকাল থেকে উমারপোতা গ্রামে যান পুলিশ সুপার ও প্রশাসনের কর্তারা। পুলিশ সুপারের কাছে পুরো ঘটনার কথা জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বুধবার ভোরের আগেই পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে যান। মঙ্গলবার বিকাল থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত উমারপোতা গ্রামের বাসিন্দাদের দফায় দফায় ডাকাতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। যে তিন জন গ্রামবাসী সংবাদ মাধ্যমের কাছে মুখ খুলেছিলেন, তাদেরও তুলে নিয়ে যাওয়া হয় গোয়ালতোড় থানায়।

মঙ্গলবার ৯টা নাগাদ পুলিশ চার নাবালিকাকে নিয়ে কাছের কেওয়াকুল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায় ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য। সেখানকার সরকারি খাতার সিরিয়াল নম্বর ১৭৯৭ থেকে ১৮০০। চার জনের নামের পাশেই লেখা আছে 'রেপ কেস'। এক নাবালিকাকে চিকিৎসার জন্য তার আত্মীয়েরা দূরে নাসিংহোমে নিয়ে যান। পরে বুধবার ভোরে কড়া পুলিশ প্রহরায় ওই পাঁচ বালিকাকে মেদিনীপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য। সেখানে টানা দু'ঘন্টা পরীক্ষার পরে তাদের কড়া পুলিশ প্রহরায় গ্রামে দিয়ে আসা হয়। মেদিনীপুরের জেলা মেডিক্যাল অফিসার দীপঙ্কর মাঝি বলেন, "ডাক্তারি পরীক্ষার পরেও নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না, তাদের ধর্ষণ করা হয়েছিল কি না।" যেহেতু ঘটনার প্রায় ৮০ ঘন্টা পরে ওই তিন নাবালিকাকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়, তাই চিকিৎসকেরা নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে চাননি।

বুধবার দুপুরে উমারপোতা গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, এক দিনের মধ্যে গোটা দৃশ্য আমূল

বদলে গিয়েছে। মঙ্গলবার যারা ওই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিলেন, এ দিন তারাই মুখে কুলুপ এঁটেছেন। কেউ সরাসরি হাতজোড় করে চলে যেতে বলেছেন। গ্রামের মাতব্বরেরা হুমকিও দিয়েছেন। গ্রামবাসীরা বলেন, "আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। দয়া করে আর ক্ষতি করবেন না।" যার মেয়ের বিয়ে থেকে ফেরার সময় ওই ঘটনা ঘটে, সেই মোহন আহিরের বাড়ি দাওয়ায় মঙ্গলবার বেশ কিছু মানুষকে পাওয়া গিয়েছিল ডাকাতির ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার জন্য। এ দিন ঘরের দরজা খোলা থাকলেও তাদের কাউকে পাওয়া যায়নি। প্রতিবেশীরা বলেছেন, "সবাই মাঠে গিয়েছে চাষ করতে।" অবশ্য গ্রামবাসীদের মধ্যেই কেউ কেউ বলেছেন, "মঙ্গলবার থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত পুলিশ দফায় দফায় আসে। পুলিশ দায়িত্ব নিয়েছে তিন দিনের মধ্যে অপরাধীদের খুঁজে বার করার। পার্টিও দায়িত্ব নিয়েছে।" বুধবার সারা দিনই বি ডি ও অফিস থেকে শুরু করে থানা পর্যন্ত চক্কর দেওয়ার সময় সেই পার্টির লোকেরাই কিন্তু ছায়ার মতো আগাগোড়া অনুসরণ করে গিয়েছে সংবাদপত্রের গাড়িকে।

কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ ছাড়াও অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশ কর্তাদের অভিযোগ, গোয়ালতোড়ের মত এত বড় ঘটনার বিষয়ে তারা উর্ধ্বতন অফিসারদের এক বার জানানোরও প্রয়োজন বোধ করেননি। কিছু জানানো হয় নি জেলার পুলিশ সুপারকেও। মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের এক পদস্থ অফিসার এই ব্যাপারে খবর পেয়েছিলেন সাংবাদিকদের কাছ থেকে। তিনি শেষ পর্যন্ত নিজেই জেলা পুলিশে ফোন করেন। এক জন সাব-ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে খবর নিয়ে ঘটনাটির কথা জানতে পারেন। ধানতলার ঘটনার পরে জেলা পুলিশকে মহাকরণ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বরযাত্রী বা কন্যাযাত্রীদের কোনও দল রাতে বাস নিয়ে বেরোলে গাড়ির নম্বর দিয়ে সেই খবর যেন সংশ্লিষ্ট পুলিশ কন্ট্রোলে জানানো হয়। তাতে পুলিশের টহলদার ভ্যানগুলি সতর্ক থাকবে। অন্য দিকে, গ্রামে গঞ্জে আর জি পার্টিকেও আরও সক্রিয় করা হবে।

রাজ্য মহিলা কমিশনের ভাইস চেয়ারপার্সন রমা দাস বলেন, "নারী-নির্যাতনের যে-কোনও ঘটনায় কমিশনের দল পাঠিয়ে তদন্ত করি। এই ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না।" রমাদেবী বলেন, "ধানতলা থেকে শুরু করে বাসন্তী — প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছি। পাথরডোবার এই ঘটনাতেও আমরা চুপ করে বসে থাকব না।

দৃশ্য - ৬

উত্তর ২৪ পরগণার গোপালনগরে গত ডিসেম্বরে বিয়েবাড়ি বাসে ডাকাতি ও নারী-নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল বলে ধানতলার ঘটনার তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশ (সি আই ডি)। কিন্তু সেই ঘটনা পুরোপুরি চেপে গিয়েছিল স্থানীয় পুলিশ। স্থানীয় পুলিশ ওই ঘটনার কথা নথিভুক্তই করেনি। ডিসেম্বরের ঘটনাস্থল ধানতলার খুব কাছেই। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের দেওয়া রিপোর্টে সি আই ডি ওই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে।

ওই ঘটনা নথিভুক্ত না করার জন্য দোষী পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, তা জানতে চাওয়া হলে রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশের এ ডি জি এস আই এস আমেদ বলেন, "দেখুন না, কী হয়।" ধানতলার দুষ্কৃতীরাই গোপালনগরে ওই কান্ড ঘটিয়েছিল কিনা, সেই বিষয়ে পুলিশ এখনও নিশ্চিত নয়। আহমেদ বলেন, "ধানতলার ঘটনার মূল পান্ডা এ হাতিম পলাতক। তার

বাংলাদেশ পালিয়ে যাওয়ার সম্ভবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ।"

সি আই ডি রিপোর্ট বলেছে, ১৬ ডিসেম্বর রাতে বরযাত্রী বোঝাই একটি বাস থামিয়ে পুরুষ যাত্রীদের আটকে রেখে মহিলাদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালায় এবং সব লুঠ করে দুষ্কৃতীরা। সি আই ডি-র তদন্তকারীরা গোপালনগরে নিগৃহীতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। ওই মহিলাদের অভিযোগ, তারা থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে এই ঘটনা সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সামাজিক লজ্জার কারণে তারাও তদন্ত নিয়ে চাপাচাপি করেননি। ইতিপূর্বে গাইঘাটায় এক দল স্থানীয় দুষ্কৃতী প্রায় ছ'মাস ধরে মহিলাদের ধর্ষণ করলেও থানা কোনও অভিযোগ নথিভুক্ত করেনি। পরে রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশ তদন্তে নামলে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করা হয়।

ধানতলার ঘটনাটিও পুলিশ চেপে যেতে চেয়েছিল বলে মহিলা কমিশন অভিযোগ তুলেছে। এক গোয়েন্দা অফিসার জানান, ধানতলার ঘটনায় বাসের চালক সমীর ঘোষ খুন হওয়ায় ঘটনাটি পুরোপুরি চেপে যাওয়া সম্ভবপব হয় নি। তিনি বলেন, ডাকাতির ঘটনাকে ছিনতাই বা চুরি বলে চালিয়ে দেওয়া হয় হামেশাই। প্রভাবশালী কারও চাপ না থাকলে সাধারণ ডাকাতির ঘটনা নথিভুক্ত করা হয় না। তবে কেউ খুন হলে বা গুরুতর আহত হলে এবং জনতা কাউকে হাতেনাতে ধরে দিলে সেই সব ঘটনা পুরোপুরি চেপে যাওয়া সম্ভবপর হয় না। তার কথায় "ধানতলা অপরাধপ্রবণ এলাকা বলে কাগজে লেখালেখি হলেও আমরা তদন্তে নেমে এক বছরে গোটা তিনেকের বেশি ডাকাতির রেকর্ড পাইনি।"

বাসচালক খুন না হলে ধানতলার ঘটনা গোপালনগরের মতোই ধামাচাপা পড়ে যেত বলে মনে করেন গোয়েন্দারা। জেলা পুলিশ খুন ও ডাকাতির কথা বললেও ধর্ষণের অভিযোগ সম্পর্কে প্রথমে উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু ধানতলার ঘটনার তদন্তে নেমে প্রাথমিক রিপোর্টেই ধর্ষণের অভিযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গোয়েন্দা কর্তারা ডেপুটি সুপার জ্যাকুলিন দোরজিকে নির্যাতিতাদের সঙ্গে কথা বলেন। দোরজি বছর চব্বিশের এক বিবাহিতা মহিলা ছাড়াও আরও চারজনের সঙ্গে কথা বলতে পাঠান। তাদের সকলেরই বয়স চব্বিশের নীচে। ১৩ থেকে ১৯-এর মধ্যে। তাদের কেউই ধর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে থানায় এজাহার দিতে চাননি। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে গোয়েন্দা পুলিশ ধর্ষণের মামলা করতে চেয়েছে বলে তিনি জানানোয় দু'জন থানায় অভিযোগ দায়ের করতে রাজি হন।

দৃশ্য - ৭

ফাজিলপুরের কলেজছাত্রী জাহানার খাতুনের নারকীয় হত্যাকাণ্ড এবার রাজনৈতিক মাত্রা পেতে চলেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপান-উতোর। হত্যাকাণ্ডের পরেই প্রদেশ কংগ্রেসের এক দল প্রতিনিধি ঘুরে এসেছেন নিহত ছাত্রীর বাড়ি। রবিবার গেলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এ-দিন সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী যখন ফিরে আসছেন, তখন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা প্রচার করেন, জাহানারাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন তাঁদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

ওই ছাত্রী-হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা অবস্থা নিয়ে সরব হয়েছিল প্রদেশ কংগ্রেস। আর মুখ্যমন্ত্রী এদিন জাহানারার বাড়িতে বসে জানিয়ে দিলেন, "এই খুনের সঙ্গে

জড়িত তিন জনকে ধরেছি। পুলিশকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছি, যারা এর পিছনে আথে, তাদের সবাইকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টেনে বার করুন। ওরা ভাঙড় থেকেও লোক নিয়ে এসেছিল।" মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরের গুরুত্ব যে কতটা, গ্রামবাসীরা তা বুঝে গিয়েছেন। ছয় কিলোমিটার দুর্গম রাস্তা এক রাতের মধ্যে বালি ফেলে গাড়ি চলাচলের যোগ্য করে তোলা হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগণায় এ-দিন মুখ্যমন্ত্রীর অন্য কোন কর্মসূচী ছিল না। কলকাতা থেকে তিনি সোজা চলে যান দেগঙ্গায়। ফাজিলপুর গ্রামে গিয়ে তিনি জাহানারার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের সান্ত্বনা দেন। পরে ওই গ্রামেই এক জনসভায় তিনি বলেন, "এটি অত্যন্ত নৃশংস ঘটনা। দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা করব, যাতে এরা কোনও দিনই জেল থেকে ছাড়া না পায়।" গত বুধবার গভীর রাতে জাহানারাকে তার বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে ও বোমা মেরে খুন করে এক দল দুষ্কৃতী। তার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। শনিবার সকালে জেলার পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতেই এই খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত জাকির হোসেনের বাড়িটি পুড়িয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা।

সন্ধ্যা পৌনে ৬টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী ফাজিলপুরে পৌঁছন। তিনি সরাসরি জাহানারাদের বাড়িতে চলে যান। বুদ্ধবাবুর এই সফর উপলক্ষে তাদের বাড়ি এ-দিন কার্যত দুর্গের চেহারা নেয়। জাহানারার খুনের রাতে তিনি ও তার পরিবারের অন্যদের আর্ত চিৎকারে কেউ এগিয়ে না-গেলেও এ দিন কিন্তু বহু আগে থেকেই তাদের বাড়ি ঘিরে ফেলে পুলিশ ও র‍্যাফ। সঙ্গে ছিলেন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীরাও। কাউকেই ওই বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। পরিবারের কারও সঙ্গে কথাও বলতে দেওয়া হয়নি। গোটা গ্রাম জুড়ে ছিলেন লাঠিধারী সি পি এম ক্যাডারেরা। মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে আশপাশের গ্রামের বহু লোক ফাজিলপুরে হাজির হন।

জাহানারার বাবা মকসেদুর রহমান ও মা আফিজা বিবির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন বুদ্ধবাবু। পরে ওই বাড়ির সামনেই তৈরি মঞ্চে মকসেদুর ও তার ছেলে মামুদকে সঙ্গে নিয়ে উঠে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই শান্ত গ্রামে যে ঘটনা ঘটেছে, তা অত্যন্ত নারকীয়। কয়েকটা খুনি, বদমায়েশ ওই বাড়িতে আক্রমণ চালিয়েছে। বাবাকে মেরেছে, ভাইকে মেরেছে। শেষ পর্যন্ত জাহানারাকে বাড়ি নিয়ে যেতে না-পেরে নির্মম ভাবে বোমা মেরে হত্যা করেছে। জাহানারা ভূগোলে অনার্স নিয়ে মৃণালিনী কলেজে পড়ছিল। তার ইচ্ছা ছিল অনেক বড় হওয়ার। কিন্তু ওরা তা হতে দিল না।"

"জাহানারার পরিবারকে ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু না জানালেও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা সকলে মিলে এই পরিবারের পিছনে দাঁড়াব।" পরে জাহানারার বাবা, লক্ষ্মীপুর মাদ্রাসার শিক্ষক মকসেদুর রহমান জানান, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তিনি তার পরিবারের নিরাপত্তা এবং এক জনের চাকরীর ব্যাপারে আর্জি জানিয়েছেন। যদিও মুখ্যমন্ত্রী তাকে নির্দিষ্ট কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি।

বুধবারের ঘটনার পর জেলার পুলিশ সুপার বাসুদেব বাগ এ ক'দিন আলাদাভাবে এই খুন নিয়ে কথা না-বললেও রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর দেগঙ্গা সফরের কয়েক ঘন্টা আগে রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে তিনি বলেন, "ওই দিন দুষ্কৃতীরা মেয়েটিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই এসেছিল। বাড়ির উঠোনের একটি গাছ আঁকড়ে বাঁচার চেষ্টা করেছিল মেয়েটি। সে দুষ্কৃতীদের চিনে ফেলে। জাহানারাকে তুলে নিয়ে যেতে না পেরেই দুষ্কৃতীরা তাকে খুন করে।"

এদিকে, প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সোমেন মিত্র এই ঘটনায় দোষীদের অবিলম্বে

গ্রেফতারের দাবি জানালেন। এই ঘটনার সি আই ডি-তদন্তের দাবি জানান তিনি। ঘটনার চারদিন পরে মুখ্যমন্ত্রীর দেগঙ্গা সফরের সমালোচনা করে সোমেন বলেন, "সামনে পঞ্চায়েত ভোট। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরের সমালোচনা করে সোমেন বলেন, "সামনে পঞ্চায়েত ভোট। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।"

ধর্ষিতারা বিনা অপরাধে অপরাধিনী কেন?

স্ব-ইচ্ছায় যারা নিজেদের দেহগুলোকে যখন তখন বিলিয়ে দেয়, লাম্পট্যে আসক্ত হয়ে কিংবা অর্থের বিনিময়ে সমাজের চোখে তারা সতী সাবিত্রী, কিন্তু ধর্ষিতা হন যে সব নারী বা মেয়ে কিংবা বালিকা তারা বিনা অপরাধে অপরাধিনী হয়ে থাকবে কেন সমাজের চোখে? এপ্রসঙ্গে কৃষ্ণা বসুর (প্রতিদিন, ২২/০২/০৩) একটি নিবেদন ঃ

"একদা ছাত্রী, বর্তমানে একটি সাংস্কৃতিক স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠানের অন্যতমা সেই মেয়ে, তার ডাকে গিয়েছিলাম প্রাচীন যমুনা নদীর মজে যাওয়া তীরে এক বিকেলে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে বাংলার যে যমুনা নদীর উল্লেখ আছে 'যমুনা বিশাল অতি' — সেই বিশাল যমুনার প্রসারিত প্রবাহ আজ বিরাট বিরাট বিচ্ছিন্ন জলায় পরিণত হয়েছে। সেই বিপুল জলাধারের পাশে অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার আগে, সেই মেয়েটির দু'জন সঙ্গিনীর সঙ্গে পায়চারী করছি, এমন সময় একটি মেয়ে একটি ছোট কোঠা বাড়ি দেখিয়ে গলা নামিয়ে নিম্ন কণ্ঠে আমাকে বলল, 'দিদি ওই মেয়েটাকে দেখুন, দেখে রাখুন, এখন নয়, পরে বলছি!' বলেই চুপ করে গেল। দেখি একটি মলিন বিবর্ণ কোঠা বাড়ি, তার আঙিনায় একটি তরুণী মেয়ে, সুশ্রী মেয়ে, কিন্তু মুখে তার অজস্র বিষণ্ণতা, উঠোনের কাপড় শুকোনোর তার থেকে একটি একটি করে জামা কাপড় তুলছে। আমার সঙ্গের সেই মেয়েটি এবার নীচু স্বরে বলে, 'ওই যে মেয়েটাকে দেখলেন ওর জীবনে ভীষণ একটা ঘটনা আছে!' আমি তাকে প্রশ্ন করি, 'কেন মেয়েটি কি বোবা, আমরা নির্জন রাস্তায় কথা বলতে বলতে হাঁটছি, একবার তাকিয়ে দেওলও না?' সেই মেয়েটি আমাকে যা জানায় তা শোনবার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। কয়েক বছর আগে মেয়েটি তখন সদ্য তরুণী, সন্ধ্যার পরে তার ছেলে বন্ধুর সঙ্গে হাঁটছিল, হঠাৎ চারজন পুরুষ এসে তাকে তুলে নিয়ে যায় পাশের জঙ্গলে এবং চারজনেই মেয়েটির উপর অত্যাচার করে; ধর্ষিতা মেয়েটিকে ফেলে তার ছেলে বন্ধুটিও পালিয়ে যায়। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার পর থেকে সেই ছেলেটি এই মেয়েটির সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখে নি। পাড়ার সবাই প্রথম প্রথম মুখে সমবেদনা জানালেও সেই মেয়েটির সম্পর্কে এক ধরণের প্রত্যাখ্যান তৈরী হয়ে ওঠে সমাজ। কোনও দোষ ছিল না তার, কণামাত্র দোষ করেনি সে, ধর্ষণকারীদের হাতে অপমানিত লাঞ্ছিত মেয়েটি ওই অপমানের হাত থেকে বাঁচতেই পারেনি। কেন ওই নিরপরাধ মেয়েটিকে সারা জীবন 'ধর্ষিতা' এই বিশেষণে বিশেষিত হতে হবে? কেন কোনও বিবেকবান, হৃদয়বান পুরুষ তাকে বিয়ে করতে, জীবনসঙ্গিনী করতে এগিয়ে আসবে না? কেন যে অপরাধ সে করেনি, সে করেনি কোনও যৌন অনাচার, করেছে অন্য পুরুষেরা তার প্রতি, তার জন্য বলি দিতে হবে কেন তার মানবী জীবন? কেন সে আর দশটি মেয়ের মতো জীবনসঙ্গী পাবে না? সামাজিক সম্মান পাবে না? কেন সমাজে বাস করেও এই ধরণের মেয়েদের 'প্রান্তিক মানবী' হয়ে, কোণঠাসা নারী হয়ে, বেঁচে থাকতে হবে? কেন হবে? সমাজে কেন কোনও কোনও উদারমনা, আদর্শবাদী, মানবিক পুরুষ এদের জীবন-সঙ্গিনীর আসনে বরণ করে নেবেন না? কিসের শিক্ষার অহঙ্কার করি আমরা? কিসের

সংস্কার-মুক্তির কথাই বা বলি উচ্চকণ্ঠে? যাঁরা মানব মনস্তত্ত্ববিদ, যাঁরা চিকিৎসক তাঁরা যদি বলে দেন যে এই দুর্ঘটনা, এই অসামাজিক কদাচার যা মেয়েটির উপর, মেয়েগুলির উপর হয়েছে, তার পরেও তারা মনে এবং শরীরে 'জীবনমুখী' হয়ে বেঁচে থাকার যোগ্যতা রাখে, তবে কেন বড় মনের মানুষেরা এদের জীবনে গ্রহণ করবেন না?

ভারতবর্ষে প্রতি চুয়ান্ন সেকেন্ডে একটি করে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, পরিসংখ্যান এই কথা বলছে; এই বিকার, এই কদর্য আচরণ যারা করে তাদের তো কঠিনতম দৃষ্টান্তমূলক, ঐতিহাসিক শাস্তি দেওয়াই উচিত এবং এই সমস্ত বিকৃতমনা পুরুষদের সর্বোতভাবে ঘৃণা করা, বর্জন করা উচিত। অনেক সময়েই দেখা যায় এই ধরণের অন্যায় করার পরেও পুরুষেরা তাদের প্রভাবশালী দাদা, মামা, কাকার জোরে ছাড়া পেয়ে যায়, অনেক সময় অত্যাচারিতা মেয়েটিকে মেরে ফেলে সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপ করে দেয় জঘন্য ইতর এই মানুষ নামের অযোগ্য জীবগুলি। কখনও কখনও সামাজিক হেনস্থার ভয়ে এই বিপন্ন মেয়েটি মুখ খুলতেই চায় না। যেসব পুরুষেরা এগিয়ে এসে ভালবাসা ও মমতা দিয়ে এই ধরণের মেয়েকে জীবনসঙ্গী করে নেবেন, তাদের আলাদা করে মর্যাদা ও সামাজিক সম্মান দেওয়া হোক। রুগ্ন ও অসুস্থের সেবা যদি মানবিকতা হয়, তা হলে এই ধরণের বিপন্ন ও বিপর্যস্ত মেয়েদের কাছে এগিয়ে আসাটিও মহত্তম মানবতা বলেই মনে করি।

আমাদের সমাজে 'শহীদ'-এর মর্যাদা অপরিসীম। এইসব মেয়েগুলি, যারা তাদের উপর জঘন্য কদর্য আচরণের পরেও বেঁচে থাকে, তাদেরও তো এক ধরণের 'শহীদ'-ই বলা যায়। বেঁচে থেকেও মরমে মরে আছে, সামাজিক চাপে নুয়ে আছে, কোনও অন্যায় না করেও মরে আছে তাদের উপর যে সামাজিক অন্যায়, ভয়ঙ্কর অন্যায় করা হয়েছে, তা করেছে কিছু বিকৃত, নষ্ট, শাস্তিযোগ্য পুরুষ। সেই সব মার খাওয়া, বিপন্ন মেয়েগুলির পাশে যদি হৃদয়বান পুরুষেরা না দাঁড়ান তো কে দাঁড়াবে? অনেক সময় দেখা যায় ওই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা ওই সব মেয়েদের মনোজগতকেই বিপর্যস্ত করে দেয়। শারীরিক ক্ষতির থেকেও সেটা আরও বড় ক্ষতি।

প্রেম সম্পর্কে, নরনারীর জীবনের স্বাভাবিকতা সম্পর্কে তাদের একটা গূঢ় গভীর বিরাগ তৈরী হয়ে যায়, সেই অস্বাভাবিকতা থেকে, মনোগঠনের সেই রোগের থেকে তাদের কে বার করে আনবে? সমাজ যদি এগিয়ে না আসেন, তবে কারা আসবে এই সামাজিক দায় বহন করতে? সংবেদনশীল সহৃদয় বিবেকী মানুষ ছাড়া আর কে করবে? মনুষ্যত্বের গর্ব করি আমরা আর সেই মনুষ্যত্বের পরিচয় এই মারখাওয়া মানবীদের প্রতি দেব না আমরা? এইসব 'ধর্ষিতা' মেয়েগুলির মেডিক্যাল পরীক্ষার পরে, এদের সুস্থ করে তোলার পরে, রাষ্ট্রের, সরকারের, বড় বড় প্রতিষ্ঠানের উচিত এদের কর্মে নিযুক্ত করা। এদের আর্থিক পুনর্বাসনের, নিরাপত্তার, বেঁচে থাকার প্রাসঙ্গিক উপকরণ যোগানের ব্যবস্থার দায় রাষ্ট্রের, সরকারের, দায়িত্বশীল বড় প্রতিষ্ঠানের।"

মধ্যযুগে হিন্দুদের উদারতা

আমরা কি এগিয়ে যাচ্ছি না পেছিয়ে যাচ্ছি। গায়ে আধুনিকতার ছাপ লাগিয়ে, ভোগ্য পণ্যের বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে আরও বেশি অমানুষ হয়ে যাচ্ছি। আমরা যেন এক একটা নিষ্প্রাণ বিবেকহীন, হৃদয়হীন যন্ত্রদানব। হিন্দু সমাজে ধর্ষিতা নারীর স্থান কি ছিল তা বিবেচনা করলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে শ্রী কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য্যের 'প্রবাসী' (অগ্রহায়ণ, ১৩৪০) প্রতিবেদনটি পড়লে।

এক সময় সমাজ নারীকে কত উচ্চ স্থান দিত তার প্রমাণ শ্রী শ্রী চন্ডীতে পাওয়া যায়। মহামায়ার স্তব করতে করতে দেবতারা বলছেন 'স্ত্রিয়াঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ইত্যাদি। এর থেকে প্রমাণিত হচ্ছে তখনকার সমাজে মহামায়ার অংশসম্ভূতা নারী জাতি অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর প্রাধান্য বর্ণনা করা হয়েছে — "স্ত্রিয় দেনাঃ স্ত্রিয় প্রাণাঃ স্ত্রিয় এব বিভূষণা"। স্ত্রীলোক প্রাণ স্বরূপিনী, আভরণরূপিনী দেবতা।

শ্রী চন্ডীতে উল্লেখ আছে 'মহামায়া প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণী'। তন্ত্রশাস্ত্র বলছে — নারীর অপরাধ যতই তীব্র হোক না কেন, 'স্ত্রীণাং শতাপরাধেন পুষ্পেনাপিন তাড়য়েৎ।" এতেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে সেযুগে নারীর উপর কোন অবস্থাতেই অত্যাচার হতো না। প্রাচীন বঙ্গসমাজে ধর্ষিতা নারীকে পুনর্গ্রহণ করা হতো। শ্রী কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য সেই সময়ের কয়েকখানা চিত্র এঁকেছেন এভাবে ঃ

"সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন, বাংলার রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তেত্রিশটি মেলবন্ধন আছে। হরিকবীন্দ্র বিরচিত 'মেলবন্ধন' কারিকায় লিখিত আছে, নানা দোষের একত্র মিলনহেতু মেলের উৎপত্তি। পূর্বে কুলীন সমাজে অসংখ্য দোষ প্রবেশ করেছিল। গুণের পরিবর্তে ব্রাহ্মণসমাজে দোষেরই সর্বাধিক প্রাবল্য ছিল। হোসেন শাহের রাজত্বকালে দেবীবর মিশ্র আবির্ভূত হন। তিনিই দোষে দোষে মিলাইয়া কুলীনদের কুলবন্ধন করেন, ইহারই নাম মেলবন্ধন —

দোষ নাই যার,
কুল নাই তার।।

'দোষা নামিহ মেলনাৎ সমুদিতা কু লঞ্জেস বৈ' (কুলতাত্ত্বার্ণব ৫৯৫)। আমি এখানে তাহারই দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, যথা 'কুলিয়ামেল' এই মেলে নাদা, ধাঁধা, বারুইহাটি ও মুলকজুরী দোষ আছে।

ধাঁধা নামক খালের নিকট হাসাই নামক এক থানাদার থাকিত। শ্রীনাথ চট্টের (চট্টোপাধ্যায়) দুই অবিবাহিতা কন্যা সেই খালে জল আনিতে যায়। হাসাই তাহাদিগকে ধরিয়া বলাৎকাব করে। ঐ কন্যাদ্বয়ের একজনকে গদাধন বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন।

"অনাথ শ্রীনাথ সুতা ধান্ধাঘাটস্তলে গতা।
হাসাই হানাদারেণ যবনেন বলাৎকতা" (মেঘমালা)

শ্রীনাথ চট্টের ধাঁধাদোষ। বারুইহাটি গ্রামের ব্রাহ্মণ কন্যাগণের অবারিত মুসলমান সংশ্রবহেতু ঐ গ্রামে কেহ বিবাহ করিলে পতিত হইত। দেবীবর মিশ্রের কল্যাণে বারুইহাটির ব্রাহ্মণগণ কুলীন গণ্য হইলেন।

'সর্বানন্দীমেল' রাঘব গাঙ্গুলীর কন্যা অবিবাহিতা অবস্থায় কৈবর্ত কর্তৃক দৃষ্ট হয় ও ঘরের বাহির হইয়া যায়। গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কন্যাকে বিবাহ করেন। রাঘব গাঙ্গুলীর সঙ্গে সর্বানন্দের কুলবন্ধন হয়।

'পন্ডিবত্নী মেল' সূর্য ঘোষালের কন্যাগণ অবিবাহিতা অবস্থায় নীচজাতি সংস্রব ও ভ্রূণহত্যা পাপে দুষ্ট হয়।

লক্ষ্মীনাথ যে কন্যাকে বিবাহ করেন সে অবিবাহিতা অবস্থায় নীচ জাতির এক পুরুষের সহিত দুষ্ট হয়। পন্ডিতরত্নের পিতামহ (বিষ্ণু) উহাদের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

এই রূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পূর্বে ঐরূপ করা হত বলেই হিন্দু জাতি আজও বিদ্যমান আছে। কিন্তু এখন সমাজে গোঁড়ামি এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে, স্ত্রীকে যদি একজন মুসলমান বা অন্য কোন জাতি একবার ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে সমাজ তাকে আর গ্রহণ করে না। আজ থেকে ৭০ বছর আগেও ব্যাপারটা যেমন ছিল, আজও তেমন আছে।

"এ-সুযোগে অহিন্দু জাতিরাও সুযোগ বুঝিয়া হিন্দুনারীকে ফুসলাইতে অথবা অপহরণ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করিতেছে না। কারণ তাহারা জানে, হিন্দু সমাজে ধর্ষিতার স্থান নাই। ফলে এইরূপ অবস্থাই দাঁড়াইয়াছে যে, প্রায় প্রত্যহই দুই-একটি হিন্দুনারীহরণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। মৌলবাজারের (শ্রীহট্ট) অন্তর্গত উতরভাগ গ্রামের প্যারী দামের কন্যা অপহৃতা শ্রীমতী প্রতিভাবালা দামকে অনুসন্ধান করিতে গিয়া কুলাউড়া যুবকসঙ্ঘের শ্রীযুক্ত সুবীরকুমার পালচৌধুরী প্রায় ত্রিশটি অপহৃতা হিন্দু রমণীর সংবাদ দিয়াছেন। এই সমস্ত স্ত্রীলোককে মুসলমান বসতিবহুল স্থানে রাখা হইয়াছে। অনেকে হয়ত স্বেচ্ছায়ই বাহির হইয়া গিয়াছে।

নারীহরণের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলেই পারিবারিক উৎপীড়নের জন্য স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত অনিচ্ছাবশতঃও স্বামী গৃহ ত্যাগ করে এবং সুযোগ বুঝিয়া অহিন্দুরাও ফুসলাইয়া অথবা হরণ করিয়া তাহাদের সর্বনাশ করে। তাহারা যখন দেখিতে পায়, হিন্দু সমাজের ধর্ষিতাদিগকে তাহাদের গৃহ অথবা প্রকাশ্য বাজারে আশ্রয় লইবার উপদেশ দেন, তখন দ্বিগুণ উদ্যমে নারীহরণ করিতে আর সঙ্কোচ করে না। কিন্তু, আমরা দেখাইতে পারি যে, পূর্বে যেরূপ ধর্ষিতা হিন্দুনারীকে সমাজে গ্রহণ করা হইত, সেরূপ মুসলমান মহিলাকেও শুদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণরা বিবাহ করিতেন। রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের যেমনি মেলবন্ধন আছে, বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণেরও ঠিক তেমনি পটী-বন্ধন আছে। শব্দদ্বয় একই পর্যায়ভুক্ত। 'আনিয়াখানি' পটীতে যবন সংসর্গ আছে। 'কতুবখানি' পটীতে দেখা যায় যে, কুতুব খাঁ নামক মুসলমান যে কন্যাকে বরণ করিয়াছিল, তাহাকে মথুরা মৈত্র বিবাহ করিয়াছিলেন"। ('বর্ত্তমান সমাজের ইতিবৃত্ত', শ্রী ভাগবতচন্দ্র দাশ)

"লালবিহারী কবিভূষণ লিখিয়াছেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের কুলীনের পটীবন্ধন এবং রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণসমাজের মেলবন্ধনের মূলেও দুই-এক স্থানে ভিন্নজাতি সংশ্রব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জনৈক মৈত্র একটি পরমাসুন্দরী মুসলমান মহিলাকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়া নাম 'ভূষণ' রাখিয়া সেবাদাসী করিয়াছিলেন বলিয়াই বারেন্দ্র সমাজে 'ভূষণপটী' কুলীনের উদ্ভব হইয়াছে।

সুতরাং ধর্ষিতা নারীকে সমাজে গ্রহণ সম্বন্ধে কোন অন্তরায়ই থাকিতে পারে না। অপিচ আমার মতে শুদ্ধি করিয়া অন্য জাতীয় মহিলাকেও পূর্বের ন্যায় সমাজে গ্রহণ করা উচিৎ। 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিছুদিন পূর্বেও নাকি পূর্ববঙ্গে নদীতে নদীতে নৌকা (ভরা) বোঝাই করিয়া ঘাটে ঘাটে মেয়ে ফেরি করিয়া বিক্রয় করা হইত। এই সব কন্যা অন্ত্যজ শুদ্র ও মুসমমান বংশ হইতেই অধিকাংশ সংগ্রহ করা হইত। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজে কন্যার অভাব পরিলক্ষিত হইত, তাঁহারা ঐসকল কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া সমাজের পুষ্টি করিতেন। ইহারা 'ভরার মেয়ে' বলিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

কাজেই ধর্ষিতা হিন্দুনারীকে সমাজে 'পুনর্গ্রহণ সম্বন্ধে যাঁহারা গোঁড়ামী করিতেছেন, তাঁহারা যেন একবার প্রাচীনের সন্ধানে ছুটেন"।

কিন্তু কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য-র মতো বিবেকবান উদার ব্রাহ্মণদের উপদেশ গ্রহণ না করে, প্রাচীনপন্থাকে ঘৃণা করে যতই আধুনিকতা নামক সোনার হরিণের পেছনে ছুটতে আরম্ভ করলাম, ততই মানসিত স্থবিরতা ও সংকীর্ণতার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়লাম আমরা।

সেকালে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৭২ বছর আগে হিন্দু নারীকে কি ধরণের পারিবারিক অত্যাচার সহ্য করতে হতো তারও একটা চিত্র উপহার দিয়েছেন শ্রী কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য।

"স্বামী ও শাশুড়ীর অত্যাচার যখন একান্ত অসহনীয় হইয়া উঠে। অত্যাচারের মূর্তি যখন প্রজ্জ্বলিত 'হাতা' বা 'লৌহ শলাকার' ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া অভাগিনীর কোমলাঙ্গে অভিশাপের চিহ্ন পর্যন্ত অঙ্কিত করিয়া দেয়, তখন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গৃহত্যাগ করিয়া নারী জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করে। দিন কয়েক পূর্বেও এ-রূপ দুই একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক স্থলে আমি নিজেই স্বচক্ষে স্বামী ও শাশুড়ীর অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছি।"

"অনেক স্থলে অত্যাচার বংশগত মর্যাদাহিসাবেও হয়, মেয়ের পিতা হয়ত বংশগত মর্যাদায় বরের পিতা অপেক্ষা হীন। বিবাহের পর অর্থ সম্বন্ধে যদি একটু মনোমালিন্য হয় তাহা হইলে স্বামী ও শাশুড়ীর প্রতিহিংসা অসহায়া বধূর উপর আত্মপ্রকাশ করে। পণপ্রথা ও কৌলিন্য মাহাত্ম্য এই সকল স্থানেই প্রকাশিত হয়।"

'আমরা মুসলমান সমাজকে অপরাধী ভাবি না কেন, তাহাদের অপরাধ অপেক্ষা আমাদের অপরাধ সব দিকেই বেশি।'

বধূ হত্যা

দৃশ্য - ১

বধূ লড়ছেন, মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। তার অপরাধ ছিল সায় না দেওয়া। তার প্রতি গৃহশিক্ষক সেলিম মন্ডলের দুর্বলতা ছিল দীর্ঘদিনের। শঙ্করী দাসের ছেলেকে পড়াচ্ছিল অনেক দিন ধরে। ধীরে ধীরে পরিবারের খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। শঙ্করী দাসও তাকে নিজের বাড়ীরই একজন ভাবতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু, সেলিমের উদ্দেশ্য ছিল অন্য। শঙ্করীর সঙ্গে সহজ সরল সম্পর্ক মাত্র তার অভিপ্রেত ছিল না। শঙ্করীর লোভনীয় দেহটির প্রতিই তার ছিল লোভ।

দীর্ঘকাল পুষে রাখা অসুস্থ আকাঙ্খা একদিন প্রকাশ্যে এল। সেলিম দিয়েই ফেলল কু-প্রস্তাবটা। শঙ্করীর কাছে ওটা ছিল অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। সেলিম যে অতোটা গর্হিত বাসনার আগুণে ঝলসে উঠতে পারে তা এতটুকু বুঝতে পারেনি। তাই প্রস্তাবটা শুনে ভর্ৎসনাই করলো তাকে। সেলিম কিন্তু ছাড়ার পাত্র নয়। সে চাপ দিয়েই চলল। বাধ্য হয়ে শঙ্করী তাকে ছাঁটাই করল।

অপমানে অতৃপ্ত কামনার দহনে অস্থির প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে ওঠে সেলিম। এক দিন রাতে সে গোপনে ঢুকে পড়ে তার ঘরে। উপর্যুপরি কয়েক বার ছুরিকাঘাত করে। সে যাত্রায় বেঁচে যায় শঙ্করী। কয়েক দিনের মধ্যেই মাঝ রাতে সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে শঙ্করীর ওপর। মারাত্মকভাবে আহত করে তাকে।

প্রথমে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় এক ডাক্তারের কাছে। সেখান থেকে আর জি করে। সেখানে তিনি এখনো মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন। (হিন্দুস্থান টাইমস্ — ৯/০৪/০৩)

দৃশ্য - ২

নাকাশিপাড়ার ঘটনা। যুব কংগ্রেসের এক স্থানীয় নেতার বৌভাতের অনুষ্ঠানে ঢুকে দুষ্কৃতীরা দলবদ্ধ ভাবে লুঠপাঠ চালিয়ে নববধূ সহ বাড়ির মহিলাদের উপরে নির্যাতন চালিয়েছে। ধানতলায় বিয়েবাড়ির বাসে ডাকাতি ও ধর্ষণের ঘটনার পরে এ বার বিয়েবাড়িতে ডাকাতি ও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটল, সেই নদীয়ারই নাকাশিপাড়া থানার শ্রীবাটী গ্রামে, মঙ্গলবার রাতে। মহিলাদের উপর অত্যাচার চালানো হলেও পুলিশ অবশ্য ঘটনাটিকে নিছক ডাকাতি বলতে নারাজ। জেলা পুলিশের এক ডি এস পি দিলীপ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই দুষ্কৃতীরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।" যুব কংগ্রেসের ওই নেতা নিমাই বিশ্বাসের অভিযোগ, সি পি এমের মদতপুষ্ট গুন্ডারাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। যদিও সি পি এমের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শঙ্কর সিংহ বলেন, "ধানতলার পরে এই ঘটনা পুলিশ-

প্রশাসনের অবস্থাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার না-করলে আমরা জেলা জুড়ে আন্দোলনে নামব।"

এর পাশাপাশি, ওই রাতেই ডাকাতির আরও একটি ঘটনা ঘটেছে রাণাঘাট থানার ঘটকপাড়ার এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে। বাধা দিতে গিয়ে ডাকাতদের হাতে জখম হয়েছেন ওই ব্যবসায়ী। তাঁকে রাণাঘাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই দু'টি ঘটনাতেই বুধবার রাত পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

নাকাশিপাড়ার শ্রীবাটী গ্রামে মঙ্গলবার বৌভাত ছিল মাঝেরগ্রাম এলাকার যুব কংগ্রেসের সভ-সভাপতি নিমাই বিশ্বাসের। রাত ২টো নাগাদ বৌভাতের আসরে ঢুকে পড়ে দুষ্কৃতীরা। তাদের হাতে ছিল বন্দুক, লাঠি, ভোজালি ও বোমা। নিমাইবাবু বলেন, "ওরা বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই আমার খোঁজ করে। আমি তখন কোনও রকমে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই।" নববধূকে ফেলে পালিয়ে গিয়ে নিমাইবাবু প্রাণে বেঁচেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশের ধারণা, দুষ্কৃতীরা তাকে খুন করতেই এসেছিল।

নিমাইবাবুকে খুঁজে না পেয়ে দুষ্কৃতীরা হামলা করে নববধূর উপরে। তিনি তখন সিংহাসনে বসে ছিলেন। লণ্ডভণ্ড ঘরে বসে ওই বধূ বলেন, "ওরা আমাকে সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে অত্যাচার করেছে। খুলে নিয়েছে সব গয়না।" নববধূর বাক্সপ্যাঁটরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। শূণ্য গয়নার বাক্স পড়ে রয়েছে এ-দিক ও-দিক। পড়ে রযেছে প্রসাধনের সরঞ্জাম। তারই মধ্যে বসে কাঁদছিলেন ওই নববধূ। নিমাইবাবুর দিদি চন্দনা মালাকাবের অভিযোগ, "ওরা শুধু লুঠপাঠই করেনি, মেয়েদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহারও করেছে।" বাধা দিতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে মার খেয়েছেন চামেলি দে নামে এক মহিলা। বন্দুকের গুঁতোয় তার পিঠ ফুলে গিয়েছে। নিমাইবাবুর বৌদি শম্পাদেবী বলেন, "গায়ের গয়না খুলে দিতে দেরি হওয়ায় ওরা শুধু আমার উপরে অত্যাচারই করেনি, আমার স্বামীকেও মারধর করেছে।"

পুরুষদেব ভয় দেখিয়ে এক পাশে সরিয়ে বৌভাতে আসা মহিলাদের উপরে যখন অত্যাচার ও লুঠপাঠ চলছে, তখন তাদের আর্ত চিৎকারে প্রতিবেশীরা ইটপাটকেল ছুঁড়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। কিন্তু দুষ্কৃতীরা পাল্টা বোমা ছুঁড়লে গ্রামবাসীদের পিছু হটতে হয়। দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব করে চলে যাওয়ার পরে নিমাইবাবু যখন বাড়ি ফেরেন, তখন রাত শেষ। খবর পেয়ে পুলিশ তদন্তে আসে। নিমাইবাবু পুলিশকে জানিয়েছেন, দুষ্কৃতীদের মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকলেও তাদের অনেককেই তিনি চিনতে পেরেছেন। তার অভিযোগ, "দুষ্কৃতীরা এলাকার পরিচিত সমাজবিরোধী। তাদের সঙ্গে সি পি এমের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।" তবে এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে সি পি এমের মহিলা সমিতির মাঝেরগ্রাম ইউনিটের সম্পাদিকা ফরিদা ইয়াসমিন পাল্টা অভিযোগ করেছেন, "অপপ্রচার করার জন্যই ডাকাতির ঘটনায় বিরোধীরা আমাদের দলকে জড়িয়ে দিচ্ছে।" (আনন্দবাজার, ১৭/০৭/০৩)

এর পরদিনই (১৮/০৭/০৩) আনন্দবাজার এই ঘটনার জন্য সি পি এমকেই দায়ী করেছিল। ডাকাতির উদ্দেশ্য ছিল বিরোধী কংগ্রেস নেতাকে হেনস্থা করা, তার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। নোংরা রাজনীতি! অসভ্য বন্ধ্যা রাজনীতির দাপট সর্বত্র।

দৃশ্য - ৩

বেলপাহাড়ি থানার পচাপানি গ্রামের এক গৃহবধূকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করার সময় পুলিশের প্রশ্ন ছিল, তুই কি করিস? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমি গৃহবধূ। এরপর তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পদস্থ অফিসারদের সামনে তাকে নগ্ন করা হয়। এবং বলা হয়, যে মহিলা একঘর পুরুষের সামনে নগ্ন হয়, সে আর গৃহবধূ থাকে না। এরপর চলে মারধর।

বাঁশপাহাড়িতে তল্লাশির সময় এক ১৫ বছরের কিশোরীকে রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে পুলিশ বলে, তুই ছেলে না মেয়ে, সেটা সবার সামনে প্রমাণ দিতে হবে। এরপর তাকে প্রকাশ্যে নগ্ন করা হয়।

এক মহিলার কোলে থাকা শিশুসন্তানকে ছিনিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। তারপর মহিলাকে অনেকটা পথ হেঁচড়ে পুলিশ ভ্যানে তোলা হয়।

পুলিশ খুঁজছে খবর পেয়ে বাঁকুড়া জেলার বরাগড় গ্রামের সুভাষ কর্মকার মেটালি জঙ্গলের কাছে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পন করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। বাঁকুড়ার একটি বাড়িতে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো রাখার অপরাধে সেই বাড়ির ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কুমারগ্রামে একটি বাড়িতে হানা দিয়ে কয়েকজন গ্রেপ্তার করার পর বাড়িতে পুলিশ আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ৪০টি সুপারিগাছ কেটে নেয়।

দৃশ্য - ৪

গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করতে না চাওয়ায় এক বধূকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ মৃতার স্বামী ও তার এক বন্ধুকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানায়, মৃতার নাম চন্দনা দাস (১৯)। ধৃতদের নাম, সৌমিত্র দাস ও দীপক রায়। প্রথম জন চন্দনা দেবীর স্বামী। হলদিয়ার এস ডি পি দেবাশিস বেজ বললেন, "সৌমিত্র কবুল করেছে, সে ও বন্ধু মিলে চন্দনাকে খুন করেছে।"

পুলিশ জানাল, রাই রায়চক গ্রামের বাসিন্দা হলদিয়ার গর্ভনমেন্ট কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সৌমিত্রর সঙ্গে চন্দনা হালদারের বিয়ে হয়। চন্দনা দেবীরও বাড়ি একই গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যে সৌমিত্র অন্য মহিলার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে চন্দনা গর্ভবতী হয়ে পড়েন। সৌমিত্র স্ত্রীকে গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করার জন্য চাপ দেয়। কিন্তু তাতে চন্দনা রাজি হননি। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। চন্দনা দেবী বাপের বাড়ি চলে যান।

পুলিশ জানায়, সৌমিত্র স্ত্রীকে হলদিয়া উৎসবে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে চন্দনার বাড়িতে খবর পাঠায়। খবর পেয়ে চন্দনা দেবী সে দিন সন্ধ্যায় উৎসবে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হন। পরের দিন সকালে হলদিয়ার একটি খালে তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। চন্দনা দেবীর গলায় রুমালের ফাঁস লাগানো ছিল। হলদিয়ার মহকুমা পুলিশ অফিসার জানান, সৌমিত্র স্বীকার করেছে মেলায় যাওয়ার পথে গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করা নিয়ে চন্দনা দেবীর সঙ্গে তার বচসা হয়। তাদের সঙ্গে বন্ধু দীপকও ছিল। এর পরে চন্দনা দেবীর গলায় রুমালের ফাঁস জড়িয়ে খুন করা হয়।

দৃশ্য - ৫

অনেক সময় স্ত্রীর লাঞ্ছনার, অপমানের, নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন হতে হয় স্বামীদেরও। দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

বসিরহাটের দক্ষিণ বাগুন্ডির কাছে একটি ইট ভাটার খাল থেকে পুলিশ মঙ্গলবার একটি পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। বুধবার রাত পর্যন্ত মৃতদেহটির পরিচয় পাওয়া যায় নি। তবে মৃতদেহের পোষাক পরিচ্ছদ দেখে পুলিশ ধারণা করছে সেটি জয়ন্তী দাসের স্বামীর। গত ১১ জানুয়ারী সোলদানা বি এস এফের হাতে জয়ন্তী দাস নামে ওই বাংলাদেশী মহিলা লাঞ্ছিত হন বলে অভিযোগ।

বি এস এফ অবশ্য মৃতদেহের ব্যাপারে পুলিশের ধারণার কথা মানতে নারাজ। তাদের বক্তব্য, যতক্ষণ না জয়ন্তী দেবী ওই মৃতদেহটি তার স্বামীর বলে সনাক্ত করছেন, ততক্ষণ কিছু বলা উচিত নয়। মৃতদেহটি নিয়ে এইভাবে পুলিশ-বি এস এফের চাপান-উতোর শুরু হয়েছে। বসিরহাটের এস ডি ও, এস ডি পি এবং বি এস এফের ডেপুটি কমাড্যান্ট পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে যান। ফিরে এসে বসিরহাটের এস ডি পি ও শিশির দাস বলেন, "মৃতদেহ সনাক্ত করার জন্য আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে জয়ন্তীকে আনা হবে।"

পুলিশ জানিয়েছে, গত ১০ জানুয়ারী বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসার জন্য এপারে আসা এক মহিলা, তার স্বামী, দুই শিশু সহ ৭ জন বি এস এফের ১২২ ব্যাটেলিয়নের হাতে বসিরহাটের ইছামতী সেতুতে ধরা পড়েন। জয়ন্তী দেবী পুলিশে অভিযোগ করেন, সোলাদানা ক্যাম্পে থাকার সময়ে এক জওয়ান তার শ্লীলতাহানি করে। শুধু তাই নয়, ওই মহিলার আরও অভিযোগ, শ্লীলতাহানির পরে জয়ন্তী দেবী সহ ওই ৭ জনকে ফুটো নৌকায় তুলে দিয়ে মাঝ নদীতে মারার চেষ্টা করে বি এস এফ। সেই সময় দক্ষিণ বাগুন্ডির বাসিন্দারা ওই মহিলী এবং তার এক শিশু কন্যাকে জল থেকে উদ্ধার করলেও ওই নৌকার বাকি যাত্রীরা এখনও নিখোঁজ।

দৃশ্য - ৬

নিজের স্ত্রীকে খুনের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে আদালতে মামলা দায়ের করে বিপাকে পড়েছেন এক ব্যক্তি। গত ১৪ ফেব্রুয়ারী কালনা এস ডি জে এম আদালতে এই মামলা দায়ের করেন পূর্বস্থলীর নসরতপুর ইন্দিরা পল্লীর বাসিন্দা গোপাল মন্ডল। আর সে দিনই সন্ধ্যায় পুলিশ তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কাছে পাঠানো আবেদনপত্রে তিনি অভিযোগ করেছেন, থানায় দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা দিয়ে পুলিশ তাকে দিয়ে স্বীকার করাতে চেষ্টা করে যে স্ত্রী গঙ্গা মন্ডলকে গোপালবাবুই খুন করেছেন। ওই রাতে পুলিশ তাকে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিলেও কালনার সার্কেল ইন্সপেক্টর শিশির রায় বলেন, "ওই লোকটাই খুনি।" তদন্ত শেষের আগেই কে খুনি তা তিনি বুঝলেন কি করে জানতে চাইলে শিশিরবাবু তার জবাব দেন নি। অন্য দিকে, থানার ওসি বীরেন্দ্র পাঠকের কথায়, "গোপালবাবু যে খুনের ঘটনায় জড়িত, ওঁকে জেরা করে সে তথ্য মেলেনি। তাই ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।"

গত ২৬ জানুয়ারি রাতে গোপালবাবুর ছেলে পিনাকী মন্ডল বাড়ি ফিরে অনেক ডাকাডাকি সত্ত্বেও মা দরজা না খোলায় পাঁচিল টপকে বাড়ি ঢুকে দেখেন, রক্তাক্ত গঙ্গা দেবী বারান্দায় মৃত

অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। গোপালবাবু ওই দিন দুপুরে মন্তেশ্বরের পুরশুনা গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা করতে। ঘটনার পর পূর্বস্থলী থানায় তিনি জানান, তার সন্দেহ তার নিজের দুই ভাই দলবল জুটিয়ে বাড়িতে ঢুকে গঙ্গা দেবীকে খুন করেছেন। এই দু'ভাই দলবল জুটিয়ে বাড়িতে ঢুকে গঙ্গা দেবীকে খুন করেছেন। এই দু'ভাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে গোপালবাবুর সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ চলছিল। এক বছর আগে এই লোকেরা তাকে মারধর করে খুনের চেষ্টা করে বলে গোপালবাবুর অভিযোগ। পুলিশ তাদের থানায় ডেকে পাঠালেও এ পর্যন্ত গ্রেফতার, এমনকি জেরা পর্যন্ত করেনি বলে গোপালবাবুর অভিযোগ। তিনি বলেন, "খুনের যথাযথ তদন্ত এবং দোষীদের গ্রেফতারের দাবীতে জেলার পুলিশ সুপারের কাছে গত ৭ ফেব্রুয়ারী আবেদন জানাই। তাতেও কোন ফল না হওয়ায় বাধ্য হযে দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে ১৪ ফেব্রুয়ারী মামলা দায়ের করি।"

গোপালবাবুর অভিযোগ, আদালতে খুনিদের ধরার জন্য তিনি মামলা করেছেন খবর পেয়ে পুলিশ তার উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ১৪ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে ও সি এবং সি আই-এর নেতৃত্বে জেরার নামে উলঙ্গ করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, "ওরা আমাকে দিয়ে বারবার বলানোর চেষ্টা করেন যে অন্য মহিলার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক থাকায় আমিই আমার স্ত্রীকে খুন করেছি। তদন্ত শেষ না করে কেন আমার উপরে দোষ চাপানো হচ্ছে জানতে চাইলে অফিসারেরা কোনও উত্তর দেন নি।" রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে পাঠানো আবেদনে গোপালবাবু লিখেছেন, 'পুলিশ তদন্তের উপরে আস্থা হারিয়ে আমি আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি। এই ঘটনার যাতে নিরপেক্ষ তদন্ত হয় এবং প্রকৃত দোষীরা শাস্তি পায়, সে জন্য সি আই ডি-কে তদন্ত করতে বলা হোক।'

অন্য দিকে, ও সি এবং সি আই তাদের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। সি আই বলেন, "ওই ব্যক্তি স্ত্রীকে মেরে ফেলে নিজেকে বাঁচাতে সব জায়গায় বিচার চেয়ে নাটক করছেন। কিন্তু কিছু হবে না। ওঁকে গ্রেফতার করা হবেই।" জেলার পুলিশ সুপার বি এন রমেশ জানান, গোপালবাবুর অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে। পুলিশ গোপালবাবুর বিরুদ্ধে তার স্ত্রীর খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত বললেও গোপালবাবুর বিরুদ্ধে তার শ্বশুরবাড়ির কেউ অভিযোগ দায়ের করেননি। উল্টে তার শ্যালক মনোজ কুমার মন্ডল বলেন, "গোপালকে পুলিশ মিথ্যা অভিযোগে জড়ানোর চেষ্টা করছে।"

দৃশ্য - ৭

বঁটি দিয়ে স্ত্রীকে মারাত্মক ভাবে আঘাত করে আত্মঘাতী হয়েছেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার উত্তর কলকাতার ডালিমতলা লেনে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই মহিলা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। পুলিশ জানিয়েছে, সঞ্জীবশঙ্কর সাহা (৫৮) নামে ওই ব্যক্তি পারিবারিক কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। একটি সুইসাইড নোটও রেখে গেছেন তিনি। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পুলিশের বক্তব্য, সঞ্জীববাবুদের মুম্বই নিবাসী একমাত্র মেয়ে কলকাতায় এলেও মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন না। সঞ্জীববাবুর স্ত্রী সন্ধ্যারাণীও মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন না। এই সব কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝাটি হত। সম্ভবত মানসিক অবসাদ থেকেই

স্ত্রীকে মেরে সঞ্জীববাবু আত্মহত্যা করেছেন বলে পুলিশের অনুমান।

বড়তলা থানার খুব কাছে ডালিমতলা লেনে বয়েজ ওন লাইব্রেরীর পাশে রাস্তার উপর একটি চারতলা বাড়ির এক তলায় ভাড়া থাকত সাহা পরিবার। ওই বাড়ির মালিক সঞ্জীববাবুদেরই দূর সম্পর্কের আত্মীয়। সঞ্জীববাবুর বই বাঁধাইয়ের ব্যবসা আছে রাজাবাজারে। একমাত্র মেয়ে সঙ্গীতা বিবাহিত, তিনি থাকেন মুম্বাইয়ে। এই দিন বেলা বারোটা নাগাদও সঞ্জীববাবু কারখানায় না যাওয়ায় খোঁজ শুরু করেন তার ভাইপো ও কর্মচারীরা। ফ্ল্যাটে এসে দরজার উপর কাচের জানলা দিয়ে তারা দেখেন সঞ্জীববাবুর দেহ পাখার সঙ্গে ঝুলছে। পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙ্গে গুরুতর জখম অবস্থায় সঞ্জীববাবুব স্ত্রী সন্ধ্যারাণীকে হাসপাতালে পাঠায়।

এই দিন ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, হলুদ রঙের চারতলা বাড়ির সামনে ছোটখাটো জটলা। ভিড় করে মূলত সঞ্জীববাবুর আত্মীয়স্বজনরাই। সঞ্জীববাবুর ভাইপো প্রদীপ সাহা জানান, এই দিন সকালে গড়পাড়ে তিনি নিজেব বই বাঁধাইয়ের কারখানায় বসেছিলেন। তখন তাব কাকার কারখানার কর্মচারীরা টেলিফোনে জানান, সঞ্জীববাবু বেলা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আসেননি। বেলা আর একটু বাড়ার পর প্রদীপবাবু ও সঞ্জীববাবুর কর্মচারী ননী ডালিমতলা লেনের ফ্ল্যাটে যান। প্রদীপবাবু বলেন, "আমরা এসে দেখি দরজা বন্ধ। বারবার কলিং বেল বাজিয়েও কেউ দরজা খুলছিল না। আমার কাকা কানে কম শুনতেন। কাকিমার একটু মাথা খারাপ ছিল। বেশ কিছুক্ষণ দরজা ধাক্কা দেবার পর কেউ না খোলায় ননী দরজার উপরে ভাঙা কাচ দিয়ে উঁকি মেরেই চিৎকার করে ওঠে। আমরা দেখি কাকা পাখার সঙ্গে ঝুলছেন। কাকিমাকে তখন দেখতে পাইনি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুলিশে খবর দিই।"

বড়তলা থানার ও সি, এ কে ঘোষ জানান, খবর পেয়ে তাঁরা এসে দরজা ভেঙে ফেলেন। পুলিশের সঙ্গে প্রদীপবাবুরা ভিতরে ঢুকে দেখেন সন্ধ্যারানী বিছানায় পড়ে, সারা মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কপালে কোপানোর দাগ। মহিলাকে প্রশ্ন করায় তিনি শুধু হাত নেড়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, তবে কিছুই বলতে পারেননি। অন্য দিকে ডাইনিং স্পেসে স্ত্রীর শাড়ির ফাঁস গলায় দিয়ে পাখার সঙ্গে ঝুলছিলেন সঞ্জীববাবু। পাশে ছিল একটি সুইসাইড নোট। তাতে কয়েকজন আত্মীয়ের উদ্দেশে সঞ্জীববাবু লিখেছেন, 'তোমাদের মুক্তি দিলাম'। ও সি জানান, সঞ্জীববাবুর মেয়ে সঙ্গীতা জ্যাঠা শিবশঙ্কর সাহার কাছেই মানুষ। আগে দাদার সঙ্গে সল্টলেকে থাকতেন সঞ্জীববাবু। পরে কোনও কারণে তিনি আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে আসেন।

এর পরে মেয়েরও বিয়ে হয়ে যায়। পুলিশ জানায়, মেয়েও বাবা-মায়ের বাড়িতে না এসে সল্টলেকে জ্যাঠা-জেঠিমার কাছেই উঠতেন। কী কারণে তারা মানসিক অবসাদের শিকার হয়েছিলেন তা নিয়েও পুলিশ খোঁজ করছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, একাকিত্বই সমস্যার মূলে। মুম্বাইয়ের সঙ্গীতা ও তার স্বামী পার্থ সাহাকে খবর পাঠানো হয়েছে।

দৃশ্য - ৮

ব্যভিচারের অভিযোগ এনে গ্রামের মাতব্বরেরা এক গৃহবধূর উপরে মধ্যযুগীয় অত্যাচার চালিয়েছেন। গ্রামে 'বিচারসভা' বসিয়ে সেই অত্যাচারকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টাও হয়েছে। তথাকথিত ওই বিচারসভায় মাতব্বরদের মধ্যে স্থানীয় সি পি এম, কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেতারাও ছিলেন। রওশননগর গ্রামে এই ঘটনাটি ঘটেছে প্রজাতন্ত্র দিবসে। অত্যাচারিত

সেই গৃহবধূ পুলিশের কাছে অভিযোগও দায়ের করেছেন। এতদিন পরে ঘটনাটি জেলা সদরে জানাজানি হয়েছে। কিন্তু কেউ গ্রেফতার হয় নি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যৌন ব্যভিচারের অভিযোগে খাজেমা বিবি নামের বছর তিরিশের ওই গৃহবধূকে ২৪ জানুয়ারী গভীর রাত পর্যন্ত লাঠি পেটা করা হয়। তার হাঁটুতে পেরেক পুঁতে রক্তাক্ত করে দেওয়া হয়েছে। মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাতও করা হয়। পরদিন সকালে গ্রামের মোড়লেরা 'বিচারসভা' বসিয়ে মহিলার চুল কেটে দেওয়ার আদেশ দেন। শীতে তাঁর গা থেকে খুলে নেওয়া হয় চাদর। মাথার ক্ষতস্থানে মোবিল ঢালা হয়। শরীর বেয়ে সেই মোবিল গিয়ে পড়ে হাঁটুর ক্ষতস্থানেও। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে থাকেন তিনি। সহানুভূতি তো দূরের কথা, তাকে ঘিরে পৈশাচিক উল্লাসে মাতেন মাতব্বরেরা।

এখানেই শেষ হয় নি অত্যাচার। মহিলা ও তাঁর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে বলে অভিযুক্ত যুবককে এক সঙ্গে একটি সাইকেলের টায়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যার সঙ্গে ওই গৃহবধূর ব্যভিচারের অভিযোগ তুলেছেন মোড়লেরা, তিনি সম্পর্কে ওই মহিলার ভাসুরপো। তাদের প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকা ঘোরানো হয়। চারপাশে টিন বাজিয়ে, হাততালি দিয়ে উল্লাসে মাতে মোড়ল-সঙ্গীরা। মহিলাকে অর্ধনগ্ন করে দেওয়া হয়। ১১জন মোড়ল ছিলেন বিচারসভায়। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আলি মহম্মদ এবং স্থানীয় সি পি এম, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য রমজান আলি। দু'জনেই দাপটের সঙ্গে বলেন, "আরও কঠোর বিচার হওয়া উচিত ছিল। এটা পাকিস্তান নয় বলেই তা হয় নি।"

সি পি এমের পঞ্চায়েত সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান ও কংগ্রেস নেতা আনেশ মন্ডল 'বিচারসভা'-র অন্যতম সদস্য ছিলেন। তারা দু'জনেই বলেন, "ওই মহিলা চরিত্রহীন। নিজের ভাসুরপোর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের জন্যই তাঁর বিচার হয়েছে।" কিন্তু সি পি এমের ফরিদপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক হকমান সরকার বলেন, "এটি চরম অন্যায়। আদিম বর্বরতা। পার্টির কেউ জানায়নি। ও সি-র কাছে প্রথম শুনলাম। দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" জলঙ্গি থানার ও সি অবশ্য বলেন, "খাজেমা বিবি ১১জন মোড়লের বিরুদ্ধে এফ আই আর করেছেন। কিন্তু সকলেই পলাতক।" খাজেমা বিবি এখন আশ্রয় নিয়েছেন খেতমজুর দাদার ঘরে। ঘটনার এতদিন পরেও মাথা ও হাঁটুর ক্ষত শুকোয়নি তাঁর।

দুটি সন্তান রেখে আত্মঘাতী হন তার দিদি অত্যাচারিতা জিজান বিবি সতেরো বছর আগে। খাজেমার বয়স তখন ১২/১৩ বছর। খাজেমা বলেন, "তখন তেমন বুদ্ধি-সুদ্ধি হয় নি। দিদির দুই সন্তান পালনের জন্য জামাইবাবুর সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেন বাবা-মা। তারপর সতেরো বছর ধরে অত্যাচারে জ্বলছি।" এরপরে তার সঙ্গে ভাসুরপোর অবৈধ সম্পর্কের কথা চাউর করা হয়। খাজেমা বলেন, "দেড় বছর ভাসুরপো আমাদের উঠোনে পা দেয় নি। তবু মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমার উপর অত্যাচার চালানো হল।"

ব্যাভিচাররত অবস্থায় তাকে হাতে-নাতে ধরা হয়েছিল, মোড়লদের এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে খাজেমা বলেন, "জল নিয়ে ঘরে ফিরতেই মাটিতে ফেলে মারধর শুরু করা হয়। তারপরে ঘরে তালাবন্দি করা হয়। অভিযুক্ত যুবকের মা জাহানারা বিবি বলেন, "বিছানা থেকে ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ওই ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর মিথ্যা দোষ চাপানো হয়েছে।" পাশের গ্রামের চৌকি থেকে পুলিশ রাতেই এসেছিল।

মোড়ল রমজান আলি বলেন, "মহিলাকে রক্তাক্ত দেখে পুলিশ চিকিৎসার পরামর্শ দিয়ে চলে যায়। রাতেই হাতুড়ে চিকিৎসক মহিলার মাথায় চারটি সেলাই করেন। পরদিন সকালে হাটে বিচারসভা বসে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিচারসভায় দু'জনকে ১১ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। যুবকটি টাকা দেওয়ার ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করলেও খাজেমা বিবি জমি বিক্রি করে টাকা দেওয়ার সময় চেয়েছিলেন। মোড়লদের নামে জমি লিখে দিতেও চেয়েছিলেন। তাও শোনা হয় নি। গ্রামের হাই মাদ্রাসার শিক্ষক তথা সি পি এম নেতা নবিরুদ্দিন সেখ ছিলেন এই বিচার সভার সভাপতি। তিনি বলেন, "স্কুলে যাওয়ার পথে গ্রামের লোকজন ধরে আমাকে বিচারসভায় বসিয়ে দেয়। তবে আমি সভাপতিত্ব করিনি।"

দৃশ্য - ৯

নানুর থানার সাঁতরা গ্রামে এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করা হয়েছে। গভীর রাতে কয়েকজন দুষ্কৃতী ওই মহিলাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। রাতে তার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। শুক্রবার ভোরে বাড়ির পাশে এক মাঠ থেকে ওই মহিলাকে তার স্বামী উদ্ধার করেন। তাকে নানুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। নানুর থানায় অভিযোগ দায়েব করা হয়েছে। পুলিশ এখন কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলাব স্বামী স্থানীয় একটি মেলায় দোকান দিয়েছেন। সেই কারণে তিনি রাতে ফেরেননি। সেই সুযোগে দুষ্কৃতীরা এই কাজ করে।

এই ব্যাপারে স্থানীয় তৃণমূল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, দুষ্কৃতীরা সি পি এমের সমর্থক। সেই কারণেই পুলিশ তাদের গ্রেফতার করছে না। সি পি এমের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে তাদের দলের কেউ জড়িত নয়।

দৃশ্য - ১০

ঝকঝকে সূর্যের আলোয় ম্যালের উপর জমা বরফ গলে গিয়েছে দ্রুত। কিন্তু ভোট নিয়ে এখানে রাজনীতিকদের মনে যে বরফ জমেছে, তা দ্রুত গলার কোন সম্ভাবনা নেই।

কারণ, এর মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে মান-ইজ্জত, চরিত্র, সব কিছুই। বি জে পি-র বক্তব্য, এসব শুরু করেছেন ক্যাপ্টেন। মানে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দার সিংহ। আর কংগ্রেসের বক্তব্য, কোথায় ক্যাপ্টেন? যত নষ্টের মূল তো নরেন্দ্র মোদী। মোদী শুনেই মনে হতে পারে, এ বুঝি হিন্দুত্বের নতুন কোন কাহিনী। কিন্তু না, এ নেহাতই সেক্স এন্ড স্লিজ।

গোড়া থেকে শুরু করা যাক। হিমাচলে হিন্দুত্ব অচল বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তাকুমারের মন্তব্যের পর বি জে পি ঠিক করেছিল, উন্নয়ন এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রেমকুমার ধুমলের কাজই হবে তাদের হাতিয়ার। উতরেও যাচ্ছিল ভালই। এমন সময় ক্যাপ্টেন ছুড়লেন গোলা ঃ এতই যদি হিমাচল-প্রেম তবে ধুমল কেন কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি করেছেন পাঞ্জাবে? কেন হিমাচলে নয়?

এ তো হাটেও নয়, একেবারে ভোটের মধ্যে হাঁড়ি ভাঙ্গা। বেচারা ধুমল। মান বাঁচাতে তিনি ঘোষণা করেছেন, সব মিথ্যা। কোটি কোটি টাকা তার নেই-ই। হ্যাঁ, পাঞ্জাবে কিছু আছে। তবে এক কোটি টাকা দিলেই তিনি সে সব দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু অমরিন্দার ছাড়ার পাত্র নন। এই রাজ্যের মাণ্ডিতে প্রচারের সময় তিনি বলেছেন, তাহলে ধুমল এক কোটিতেই বিক্রি করুন।

পারবেন? "ধুমল ও তার আত্মীয়দের পাঞ্জাবের সম্পত্তির দাম ৪১ কোটি টাকা। এখনও পুরোটা জানি না, খোঁজ নিচ্ছি" — বলেছেন অমরিন্দার।

"এ শুধু হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রীর পাঞ্জাবে সম্পত্তি করার কাহিনী নয়" বললেন, কুকরির কংগ্রেস নেতা শিবরাজ দোহাল। "রাজনীতিতে আসার আগে ধুমল ছিলেন এল আই সি-র একজন সাধারণ এজেন্ট। তার এত সম্পত্তি হল কী করে?" এই প্রশ্নটি এখন পথসভা থেকে ফিসফিসের প্রচার, সর্বত্রই ঘুরপাক খাচ্ছে।

সিমলার বিজেপি অফিসের এক কর্মীও স্বীকার করলেন, বিষয়টা গোলমেলে। প্রথমে দল বিষয়টাকে গুরুত্ব না দিয়ে শ্লোগান তুলেছিল, 'চোর মাচায় শোর' বা মেরে অঙ্গনা মে তুমহারা কেয়া কাম হ্যায়।' কিন্তু তাতে চিঁড়ে ভেজেনি। তাই শেষ পর্যন্ত ত্রাতার ভূমিকা নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, পাঞ্জাবের দুই মন্ত্রী তার রাজ্য গুজরাটে নারীঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িত। এ-নিয়ে মামলাও দায়ের করেছেন তিনি।

এই পর্যন্ত বলার পরেই একটা বিবৃতির প্রতিলিপি হাতে ধরিয়ে দিনেল বি জে পি-র ওই কর্মী। পড়ে বুঝলাম, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিদ্যা স্টোকস বলেছিলেন, পাঞ্জাবের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা। তার জবাব দিয়েছেন রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি জয়কিষেণ শর্মা ঃ "স্টোকস কী করে জানলেন যে, এই দুই মন্ত্রী ওসব কিছুই করেননি? তিনি বুঝি সেখানে হাজির ছিলেন?" জবাবটা যুৎসই হয়েছে বলেই এখানকার বিজেপি কর্মীদের ধারণা।

কিন্তু সাধারণ মানুষ এ সব কিছুকেই বাঁকা চোখে দেখছেন। স্থানীয় টেকনিক্যাল কলেজের এক অধ্যাপকের বক্তব্য ঃ "নারীঘটিত কেলেঙ্কারি, তা-ও পাঞ্জাবের মন্ত্রীদের, তার সঙ্গে হিমাচল ভোটের কী সম্পর্ক? গুজরাটের মানুষ এ সব পছন্দ করেন বলে তো মনে হয় না। তা হলে নরেন্দ্র মোদী এসব বলছেন কেন? উন্নয়নের প্রসঙ্গটাই জরুরী। এখানকাব গ্রামীন মানুষ শিক্ষা চান, কাজ চান। তা নিয়েই কথা হোক।"

কিন্তু বিজেপি বড়ই চতুর। তাদের নেতারা চেয়েছিলেন পাহাড়িদের সঙ্গে পাঞ্জাবীদের ঝগড়াটা উস্কে দিতে। হয়েছেও তাই। সিমলার দোকান-মালিক পুষ্পকুমারের কথায় ছিল তার স্পষ্ট প্রতিফলন ঃ "উনি (অমরিন্দার) পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সম্পত্তিতে তল্লাশি চালাচ্ছেন কেন। তল্লাশি চালানো হয় বেআইনি সম্পত্তির ক্ষেত্রে। ধুমলের ক্ষেত্রে উনি কোনও বেআইনি কাজের হদিশ পেয়েছেন কি? এ তো নেহাৎই পাহাড়িদের ছোট করার চেষ্টা। আমরা ভোটের বাক্সেই এর জবাব দেব।"

আসলে পাহাড়ি-ব্রাহ্মণ-রাজপুতদের সঙ্গে পাঞ্জাবীদের ঝগড়াটা পুরনো। স্বাধীনতার পর যখন রাজ্য পুনর্গঠন হয়, তখন পাহাড়কে পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত করার কথা উঠেছিল। তাতে বেঁকে বসেছিলেন পাহাড়ের মানুষ। তার ফলেই তৈরী হয় নতুন পাহাড়ী রাজ্য হিমাচলপ্রদেশ। পুরনো সেই বিবাদটা ফের উস্কে উঠেছে। ফলে বিজেপি নেতা-কর্মীদের ধারণা, অমরিন্দারের খেলাটা বুমেরাং হয়ে ফিরছে।

অবস্থা দেখে প্রধানমন্ত্রী কাল এখানে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, ১৯৫২ থেকে ভোটে লড়লেও এত নিচু মানের প্রচার তিনি কখনও দেখেনি। জানিয়েছেন, তিনি ব্যাথিত। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা জানিয়ে দিয়েছেন, প্রচারের মান নামিয়েছে বিজেপি। কংগ্রেস যা করছে, তা হল দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই। আর সনিয়া গান্ধী নিজেই কাল কুলুতে বলেছেন, "হিমাচলে বিজেপি সরকার

টাকা নিয়ে চাকরি দিয়েছে। টাকা করেছে সব কিছু থেকে।”

দৃশ্য - ১১

রাজগঞ্জের চেকরমারি গ্রামের দুই গৃহবধূকে সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ থেকে শিলিগুড়ি উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে শিলিগুড়ি পুলিশ। কাজ দেওয়ার নাম করে শ্যামলী দাস ও মায়া সরকার নামে ওই দুই গৃহবধূকে উত্তরপ্রদেশে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল বলে পুলিশি সূত্রে জানানো হয়েছে।

উদ্ধার পাওয়া ওই দুই গৃহবধূ শ্যামলী ও মায়া জানায়, পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে প্রতিবেশী যুবক পরেশ দাস ও অমূল্য দাসকে কাজ খুঁজে দিতে বলে। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে জলপাইগুড়ি জেলার জেলার ফাটাপুকুর থেকে পরেশ শ্যামলী ও মায়াকে কাজ দেওয়ার নাম করে নিউ জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে নিয়ে আসে। সেখান থেকে নিয়ে যায় উত্তরপ্রদেশে। উত্তরপ্রদেশের সালিমপুরে এক ইটভাটায় শ্যামলীকে ৩ হাজার টাকায় ও মায়াকে এক দর্জির কাছে ৪ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেয় ওই দুই যুবক।

জানা গেছে, এর পর পরেশ ও অমূল্য গ্রামে ফিরে এলে গ্রামবাসীদের সন্দেহ হয়। তারা পুলিশে খবর দেয়। রাজগঞ্জ পুলিশ উত্তরপ্রদেশ থেকে ওই দুই গৃহবধূকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। মেয়ে পাচারকারী সন্দেহে পুলিশ, পরেশ অমূল্য সহ আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে।

দৃশ্য - ১২

আমাদের অতি কাছেই শ্রীরামপুরের ঘটনা ঃ

শ্রীরামপুর থানার অন্তর্গত চাতরা ঘোষপাড়ায় সোমবার রাতে গৃহবধূ কল্যাণী চ্যাটার্জীর (২৫) আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় কিছু যুবক ওই গৃহবধূর নামে রাতেব অন্ধকারে অশ্লীল কিছু পোস্টার লাগালে ক্ষোভে-লজ্জায় কল্যাণী আত্মহত্যা করে। এ-ব্যাপারে স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করা হলে জানানো হয়, তদন্তকারী অফিসারই বিষটি জানেন। আপাতত তিনি থানায় উপস্থিত নেই।

গৃহবধূ কল্যাণী চ্যাটার্জীর আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে সি পি এম শ্রীরামপুর ২নং আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ও স্থানীয় বাসিন্দা অসীম ব্যানার্জী জানান, কল্যাণীর স্বামী দেবাশীষ চ্যাটার্জীর জনৈক বন্ধু দেবাশীষের বাড়ি দীর্ঘদিন ধরে যাওয়া-আসা করতো। সম্প্রতি ওই পাড়ার কিছু যুবক দেবাশীষ-এর বন্ধুর কাছে মোটা অঙ্কের পুজোর চাঁদা বাবদ দাবি জানায়। কিন্তু দেবাশীষ-এর বন্ধু সেই টাকা দিতে অস্বীকার করলে ওই যুবককে হুমকি দিয়ে বলেন, ‘এর পরিণাম ভাল হবে না’। এরপর রবিবার রাতে কে বা কারা দেবাশীষের বন্ধু ও কল্যাণীকে জড়িয়ে অশ্লীল কিছু পোষ্টার বিভিন্ন দেওয়ালে লাগানো অবস্থায় দেখা গেলে ক্ষোভে-লজ্জায় কল্যাণী আত্মহত্যা করেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, মঙ্গলবার সকালে চাতরা অঞ্চলে কল্যাণীর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়লে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। ওইদিন দুপুরে শ্রীরামপুর মর্গে কল্যাণীর মৃতদেহ নিতে এসে দেবাশীষবাবু কান্নায় ভেঙে পড়েন। তার কাছে মৃত্যুর কারণ জানতে চাইলে তিনি জানান ওই পোস্টারই মৃত্যুর কারণ। তিনি দোষীদের অবিলম্বে শাস্তির দাবী জানান।

অপরদিকে এ-ব্যাপারে স্থানীয় থানার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। মঙ্গলবার রাতে

বারবার যোগাযোগ করা হলে ওই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার বি এল কর বলেন, ঘটনাটির তদন্তকারী অফিসার থানায় ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুই বলা যাবে না।

দৃশ্য - ১৩

গৃহবধূকে খুনের অভিযোগের জেরে ক্ষিপ্ত জনতা তার শ্বশুরবাড়িতে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়। মারধর করা হয় শ্বশুরবাড়ির লোককে। পুলিশ তাদের উদ্ধারের পরে গ্রেফতার করে। মৃতার নাম মমিনা বেগম (১৯)। ঘটনাটি ঘটেছে জাঙ্গিপাড়া থানার বাহানা গ্রামে সোমবার সকালে।

পুলিশ জানায়, ওই গৃহবধূ রবিবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। সোমবার তার মৃতদেহ গ্রামেরই পুকুরে ভাসতে দেখা যায়। মৃতদেহ পাওয়ার পরে গ্রাম জুড়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। গ্রামের মানুষ তার শ্বশুরবাড়িতে চড়াও হয়। পরিস্থিতি বুঝে স্বামী কাজি আফগান হোসেন পালিয়ে যান। হাতের কাছে শ্বশুর ও শাশুড়িকে পেয়ে গিয়ে গ্রামবাসীরা মারধর করে।

দৃশ্য - ১৪

খড়্গপুর শহরে এক গৃহবধূ খুন হয়েছেন। জেলার পুলিশ সুপার কৈলাশচন্দ্র মিনা জানান, তারাবাঈ (৪০) নামের ওই গৃহবধূকে তার পালিত পুত্র ২১ বছরের সূর্যপ্রকাশ গুলি করে হত্যা করেছে। চাহিদা মতো টাকা না পেয়ে রাগের বশে সে খুন করে। সেই সময় তারাবাঈয়ের স্বামী সি এইচ রামু কর্মস্থলে ছিলেন। পালিতা কন্যা সুস্মিতা ছিল স্কুলে। সূর্যপ্রকাশ ধরা পড়েছে।

পুলিশ জানায়, রামু এক বেসরকারী সংস্থায় চাকরি করেন। থাকেন সংস্থারই আবাসনে। বছর কুড়ি আগে তারাবাঈকে বিয়ে করেন তিনি। তাদের চার ছেলে ও তিন মেয়ে হয়। কিন্তু সব ক'টি সন্তানই খুব ছোট বয়সে মারা যায়। তখন তারা এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ছেলে সূর্যপ্রকাশকে দত্তক নেন। বছর সাতেক আগে খড়্গপুর হাসপাতালে একটি মেয়েকে তারা কুড়িয়ে পান। তাকে বাড়ি নিয়েও আসেন। সেই মেয়েই সুস্মিতা। মেয়ে একটু বড় হওয়ার পরে রামু এবং তারাবাঈ সূর্যপ্রকাশকে নিমপুরায় নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে বলেন। তাই নিয়েই বিরোধ শুরু হয়।

নিমপুরায় চলে গেলেও সূর্যপ্রকাশ মায়ের কাছে টাকা, জামা-কাপড় নিতে মাঝে মধ্যে আসত। এদিন আসন্ন পোঙ্গল উৎসবের টাকা নিতে সূর্যশেখর মায়ের কাছে এসেছিল। তাই নিয়েই বচসা বাঁধে। তখন সে তারাবাঈয়ের ঘাড়ে গুলি করে।

দৃশ্য - ১৫

ভদ্রেশ্বর থানার মাঝের গোয়ালা পাড়ার এক গৃহবধূ মালতী গুপ্তাকে (২২) আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগে পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে মালতী গুপ্তার স্বামী ওঙ্কার নাথ গুপ্তা, শাশুড়ি কলাবতী গুপ্তা, দুই দেওর সুনীল গুপ্তা ও অনিল গুপ্তা রয়েছেন।

গত ১১ ফেব্রুয়ারী ঘটনার দিন মালতীদেবী চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে পুলিশের কাছে বলেন, স্টোভ ফেটে এঘটনা ঘটেছে। কিন্তু অগ্নিদগ্ধ ওই বধূ বুধবার কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এন্টালি থানার পুলিশের কাছে বলেন তাকে বেঁধে স্বামীর

সামনে শাশুড়ি ও দেওর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে এন্টালি থানায় একটি কেস হয়।

পুলিশ অবশ্য বধূ নির্যাতনের অভিযোগে ১১ ফেব্রুয়ারী রাতেই অভিযুক্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করে। ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ জানিয়েছে, শিশু সন্তানের জীবন বাঁচানোর জন্যই মালতী প্রথমে দুর্ঘটনার কথা বলেন। পরে যখন তিনি জানতে পারেন, তার সন্তান বাপের বাড়িতে নিরাপদে আছে তখনই তিনি সত্য ঘটনা ফাঁস করেন। এ ঘটনায় উত্তেদিত জনতা ওঙ্কারনাথ গুপ্তার বাড়িতে ভাঙচুরের জন্য চড়াও হলেও পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেয়। মালতীর অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক।

দৃশ্য - ১৬

উত্তর কলকাতায় বড়তলার এক গৃহবধূ সুধা জয়সওয়াল অসুস্থ হয়ে কয়েকদিন ধরে হাসাপাতালে ভর্তি ছিলেন। শুক্রবার গভীর রাতে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। সুধার বাবার অভিযোগ, শ্বশুরবাড়ির দৈহিক ও মানসিক অত্যাচারেই তার মেয়ে মারা গিয়েছেন। পুলিশ সুধার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি ও ভাসুরকে গ্রেফতার করেছে। মৃতার এক বছর পাঁচ মাসের একটি শিশুকন্যা রয়েছে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ১৫৩এ, এ পি সি রোডের যমুনাপ্রসাদ জওসওয়ালের মেজ ছেলে রাজেশের স্ত্রী সুধা ৩১ মার্চ পেটে ব্যাথার জন্য একটি বেসরকারী নার্সিংহোমে ভর্তি হন। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে সল্টলেকের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই গত কাল রাত একটা নাগাদ মারা যান সুধা। সকালে বাড়িতে দেহ আনার পর থেকেই পাড়ার লোকজন ও সুধার বাপের বাড়ির লোকেরা যমুনাপ্রসাদের বাড়িতে জড়ো হন। তাদের অভিযোগ, সুধাকে দিনের পর দিন খেতে দেওয়া হত না। অসুস্থ হলে চিকিৎসা করানোও হত না। সুধার দেহ আটকে রেখে যমুনাপ্রসাদদের গ্রেফতারের দাবি জানান পাড়ার লোকজন। পরে যমুনাপ্রসাদ, তাঁর স্ত্রী চন্দ্রকলা, বড় ছেলে গিরিশ ও মেজ ছেলে রাজেশকে পুলিশ আটক করে। বড়তলা থানার অফিসার সুমিতকুমার চক্রবর্ত্তী জানান, "মেয়ের বাড়ির অবস্থা ভাল না, ছেলের বাড়ি অবস্থাপন্ন। মেয়েটিকে খুব খাটাত, খেতে দিত না বলে খবর পাচ্ছি।"

সুধার বাবা জানালেন, '৯৯ সালে সুধার বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে অশান্তি চলছিল। সুধার ছোট জা পল্লবীও বলেন, "টাকা দিতে পারত না বলে বেচারির উপর কী অত্যাচারই না করেছে।"

দৃশ্য - ১৭

গৃহবধূকে বিষ খাইয়ে খুন করার অভিযোগ তুলে এক দল লোকের প্রহারে গুরুতর জখম হয়েছেন মৃতার স্বামী ও শ্বশুর। ক্ষিপ্ত জনতা তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করে একটি স্কুটারে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনাটি ঘটেছে কোতয়ালি থানার আশু রায় রোডে।

পুলিশ জানায়, মৃত গৃহবধূর নাম শিউলি সাহা (১৮)। মাত্র ন'মাস আগে আশু রায় রোডের বাসিন্দা আশিস রায়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। শিউলী দেবীর বাপের বাড়ীর লোকজনের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে যৌতুকের দাবিতে তাঁর উপরে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হচ্ছিল।

দৃশ্য - ১৮

বারাসত থানার মধ্যে বালুরিয়াতে খুন হয়েছেন এক গৃহবধূ। নাম দুলালী মিস্ত্রি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চারবছর আগে দুলালীর বিয়ে হয়েছিল মিন্টুর সঙ্গে। আর্থিক টানাটানির জন্য দু'জনের মধ্যে প্রায়ই ঝামেলা হত। বুধবার রাতে গোলমাল চরমে ওঠে। আচমকা মিন্টু তার স্ত্রীর গলা টিপে ধরে। ঘটনাস্থলে মারা যায় ওই গৃহবধূ।

বাঁকুড়ার একটি ঘটনা, শুনেছিলাম কুমারশঙ্কর নারায়ণ দেও-এর কাছ থেকে ঃ

'দাদু আপনি তাড়াতাড়ি আসুন, মাকে মারছে, মা উঠতে পারছে না।' ৯ বছরের এই শিশুটির করুণ আর্তি পৌঁছেছিল তার দাদুর কাছে ঠিকই। কিন্তু বড় দেরীতে। তার অনেক আগেই শিশুটির মা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে চিরবিদায় নিয়েছে। ছোট্ট ছেলের কাঁচা হাতে লেখা চিঠি তার মায়ের প্রাণ বাঁচাতে ব্যর্থ হয়েছে।

বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানার পারুলিয়া গ্রামের গৃহবধূ ছায়ারাণী দাস শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার, গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর এই আত্মহত্যার প্ররোচনা যুগিয়েছে স্বামী, শাশুড়ি এবং বড়জা। হুগলি জেলার গোঘাট থানার কয়াপাট গ্রামের মেয়ে ছায়ার বিয়ে হয় চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে। বিয়েতে যৌতুক হিসাবে নগদ চার হাজার টাকা, চার ভরি সোনার গহনা, অন্যান্য দানসামগ্রী সঙ্গে সাইকেল দিয়েছিলেন মৃতার বাবা রবিলোচন পাল। সব বাবা-মায়ের মতো তাদের মেয়েও বিবাহিত জীবনে সুখী হবে এটাই ছিল তাদের আশা। কিন্তু, বিবাহিত জীবনেই সুখী হননি ছায়া। শাশুড়ি, বড়জা আর স্বামীর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন ছায়া। ১৯৯৩ সালের ২৭ নভেম্বর ছায়ার ৯ বছরের ছেলে চন্দন তার দাদুকে মায়ের ওপর অত্যাচারের কাহিনী জানিয়ে চিঠি লিখেছিল। ছোট ছেলের কাঁচা হাতের চিঠিতে লেখা রয়েছে — 'মাকে সবাই মারছে, কাস্তেয় করে চটিয়েছে, বাবাও তারপর মেরেছে। মায়ের খুব যন্ত্রণা। কিছু ব্যবস্থা থাকে তো করুন।'

এই চিঠি পাওয়ার পর রবিবাবু মেয়েকে বাড়ি নিয়ে আসেন। কিছুদিন বাপের বাড়িতে রেখে তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে আবার মাঘ মাসের ৫ তারিখে শ্বশুরবাড়িতে দিয়ে আসেন। এর পরেই ঘটে সেই মর্মান্তিক ঘটনা। দুই সন্তানের জননী ছায়ারাণী বিষ খেয়ে তার জীবন শেষ করে দেন।

বিষ্ণুপুর মহকুমা হাসপাতালে থেকে দেওয়া ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, বিষপানে মৃত্যু বলা হলেও স্বামী, শাশুড়ি ও বড়জার অত্যাচারই ছায়ার এই পরিণতি বলে অভিযোগ করেন ছায়ার বাবা রবিলোচনবাবু। রবিবাবু বলেন, মেয়ের মৃত্যু সংবাদ শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে জানানো হয় নি। তার ছোট জামাই সীতাপ্রসাদ কর-ই এই সংবাদ তাকে দেন। ঘটনার পরদিন গিয়ে দেখেন তার মেয়ের মৃতদেহ সৎকার করা হয়ে গেছে।

রবিবাবু জানান, স্থানীয় পাত্রসায়ের থানায় মেয়ের শ্বশুরবাড়ির নামে কেস দায়ের করলেও এখনও পর্যন্ত কোনও তদন্ত শুরু হয় নি।

রবিবাবু আরও বলেন, একদিকে পুলিসি প্রশাসনের বর্তমান অবস্থায় তিনি যেমন বিস্মিত হয়েছেন, ততখানি অভাববোধ করলেন নাতিদের নিরাপত্তার ব্যাপারে। তার ধারণা মায়ের ওপর নির্যাতন হয়তো বড় নাতি চন্দনের ওপরও আঘাত আসতে পারে। তাই সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বাঁকুড়া জেলার পুলিশ সুপারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যাতে তাঁর নাতিদের সঠিকভাবে

দেখভালের ব্যবস্থা করা হয় এবং অপরাধীরা উপযুক্ত শাস্তি পায়।

দৃশ্য - ১৯

স্বামীকে গাছের সঙ্গে বেঁধে তার সামনেই গর্ভবতী স্ত্রীকে দু'বার ধর্ষণ করেছে দুষ্কৃতীরা। ধর্ষণের আগে ওই মহিলার দু'বছরের ছেলেকে কোল থেকে ছিনিয়ে দুষ্কৃতিরা মাঠে ছুড়ে ফেলে দেয়। চাঁচল থানার বারোমাসা নদীর কাছে এই ঘটনাটি ঘটেছে। ধর্ষিতার বয়স ২০। মালদহ সদর হাসপাতালে তিনি এখন চিকিৎসাধীন ছিলেন। ওই ঘটনা চাউর হতেই গোটা চাঁচল উত্তাল হয়ে উঠেছে। ধর্ষণকারী বলে অভিযুক্ত দুই ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়খন্ডের সাহেবগঞ্জের এক বাসিন্দা তার সাত মাসের গর্ভবতী স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে নিয়ে চাঁচলের মালিকান গ্রামে শ্বশুরবাড়ি আসছিলেন। কাটিহার-মালদহ প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ভালুকা স্টেশনে নেমে তারা গ্রামের উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করেন।

সপুত্র ওই দম্পতি যখন বারোমাসা নদীর কাছে পৌছেছেন, সেই সময় তিন জন দুষ্কৃতী তাদের ঘিরে ফেলে।

পাশবিক অত্যাচারের কথা শোনাতে গিয়ে প্রথমে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন তরুণী বধূটি। বলেন, "দ্বিতীয় সন্তান হবে বলে বাপের বাড়ি যাচ্ছিলাম। ভালুকা স্টেশনে নেমে মশালদহ বাজার পেরিয়ে কিছু দূর এগোতেই তিন জন আমাদের সামনে দাঁড়ায়। কিছু বোঝার আগেই এক জন কোল থেকে দু'বছরের ছেলেকে কেড়ে নেয়। দু'জন স্বামীকে চাদর দিয়ে গাছের সঙ্গে বাঁধে। আমি ভয় পেয়ে চিৎকার শুরু করলে ওরা আমার ছেলেকে মাঠে ছুড়ে ফেলে দেয়। তার পরে মুখে কাপড় গুঁজে চ্যাংদোলা করে আমাকে রাস্তার ধারে মাঠে নিয়ে যায়। তার পরে তিন জন দু'বার করে ধর্ষণ করে।"

ধর্ষিতা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "ওদের হাতেপায়ে ধরেছিলাম, আমি সাত মাসের গর্ভবতী, আমাকে ছেড়ে দিন। কিন্তু ওরা রেহাই দেয় নি। উল্টে বেধড়ক মারধর করেছে। ওদের দু'জনকে চিনতে পেরেছি। একজনকে চিনতে পারিনি।"

মাঠে পড়ে থাকা ওই মহিলার গোঙানির শব্দ শুনে হেবুল মন্ডল নামে এক প্রতিবেশী শিশুপুত্র সহ তিন জনকে উদ্ধার করে ওই তরুণীর বাপের বাড়িতে নিয়ে যান। ধর্ষিতার স্বামী বলেন, "চোখের সামনে দুষ্কৃতিরা স্ত্রীকে ধর্ষণ করল। কিছু করতে পারলাম না।" ধর্ষিতার বাবার কথায়, "আমার বাড়িতে না-এলে মেয়ের এত বড় অঘটন ঘটত না। কেন আমি মেয়েকে বাড়ি আসতে বলেছিলাম? মেয়ের এই পরিণতির জন্য আমিই দায়ী। এখন ঈশ্বরের কাছে একটাই প্রার্থনা, পেটের বাচ্চাটা যেন বাঁচে।"

গর্ভবতী বধূকে ধর্ষণের ঘটনার খবরে ডুমরু, কাপাসিয়া, কৃষ্ণনগর, খুনপাড়া, আলাদিপুর, মালিকান, সতী সহ গোটা চাঁচল থানার তিন জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। ধর্ষণ নিয়ে মানুষের ক্ষোভ অন্যদিকে মোড় নিতে পারে, এই আশঙ্কায় চাঁচল থানার পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার পর ১২ ঘন্টার মধ্যে ইদ্রিস শেখ ওরফে হোদা ও আবদুল হাকিম নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। তারা দুজনেই মালিকান গ্রামের পার্শ্ববর্তী বোয়ালমারি গ্রামের বাসিন্দা। তৃতীয় অভিযুক্ত গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পলাতক মোহনপুর গ্রামের। মালদহের

পুলিশ সুপার পঙ্কজ দত্ত বলেন, "ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। দু'জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।"

ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যার ঘটনাই ওই এলাকায় প্রথম নয়। তিন-চার বছরে বারোমাসা নদীর তীর থেকে ডুমরু কালীতলার মধ্যে দুই কিলোমিটার ফাঁকা জায়গায় অন্তত ১২-১৩টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। লুঠতরাজও ওই এলাকার নিয়মিত ঘটনা। মশালদহ বাজার, ভালুকা এলাকার মানুষের বক্তব্য, পুলিশ-প্রশাসনের কাছে একাধিক বার স্মারকলিপি দিয়েও ধর্ষণ, লুঠতরাজ বন্ধ করা যায় নি।

পশ্চিমবঙ্গে বধূ হত্যা, বধূ নির্যাতন এত বাড়ছে কেন?

বধূ নির্যাতন পশ্চিমবাংলায় যে কিভাবে বেড়ে চলেছে তার একটা পরিসংখ্যান দিলে বোঝা সহজ হবে। ১৯৯৬-২০০০ সাল — এই পাঁচ বছরে বধূ নির্যাতন সংক্রান্ত মোট অভিযোগ যা থানায় ডায়েরি হয়েছে তার সংখ্যা ছিল ১৭,৮৬৪টি। এরমধ্যে ১৯৯৬ সনে বধূনির্যাতনের ঘটনা ঘটে ৩২৮৮টি। সবচেয়ে বেশি উত্তর ২৪ পরগণায় ৫৪৪টি, তারপর দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ৪৮০টি এবং মেদিনীপুরে ৪৫৭টি।

১৯৯৭ সালে গৃহবধূ নির্যাতনের ঘটনা থানায় ডায়েরিতে পাওয়া যায় ৩৫৯৪টি। এর মধ্যে উত্তর ২৪ পরগণায়ই সবচেয়ে বেশি ৫৭৫টি। তারপর দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ৫৬০টি এবং মেদিনীপুর তৃতীয় স্থানেই রয়েছে ৪৭৫টিচ ১৯৯৮ সালে মোট বধূনির্যাতনের ঘটনা ঘটে ৩৫৩৫টি। এবারে মেদিনীপুরে কিছু কমে হয় ৩৮৭টি। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ ২৪পরগণাতে বেড়ে গিয়ে যথাক্রমে হয় ৬২২ এবং ৬৪৮টি। ১৯৯৯ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় মেদিনীপুর ও উত্তর ২৪ পরগণায় আগের বছরের চেয়ে কম হলেও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় তা বেড়ে গিয়ে হয়েছে ৬১৩টি। সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বেড়ে গিয়েছে। এই ব্যাপারে মোট অভিযোগের সংখ্যা ৩৬১৮টি।

২০০০ সালে বধূনির্যাতনে সব থেকে এগিয়ে রয়েছে পুরুলিয়া জেলা — ৫৮২টি। যা আগের বছর ছিল মাত্র ৭৩টি। মেদিনীপুরে ১৯৯৯ সালে কমে হয়েছিল ৪৪০টি। কিন্তু ওই বছর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০৬টিতে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা ৬১৩ থেকে কমে হয় ৪৯৯ এবং উত্তর ২৪ পরগণায় ৪৯২ থেকে ১২১টি। হুগলিতে ৩৫৯ থেকে বেড়ে হয় ৩৬১টি।

রাজ্য পুলিশের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৬ সালের জানুয়ারী থেকে ২০০১ সালের মার্চ পর্যন্ত কলকাতা বাদে বিভিন্ন জেলার থানাগুলিতে নথিভুক্ত ঘটনা হল, বাঁকুড়া — ৩৮৪, বীরভূম — ৭৯৯, বর্ধমান — ১৪৫৪, হুগলি — ১৯২৪, মেদিনীপুর — ২৩৯৯, হাওড়া — ৬০২, দক্ষিণ ২৪ পরগণা — ২৯০৮, উত্তর ২৪ পরগণা ২৩৮১, নদীয়া — ১৩৮৭, মুর্শিদাবাদ — ৯১০, পুরুলিয়া — ১০৫৪, কোচবিহাক — ৭১৮, জলপাইগুড়ি — ৫৮০ দার্জিলিং — ২৩৭, দক্ষিণ দিনাজপুর — ৩৪৬, উত্তর দিনাজপুর — ৫০৬ এবং মালদহ — ২১২টি। মোট ১৮৮০১টি।

এ সব তথ্য হল যে সমস্ত বধূ নির্যাতিতা হওয়ার পর থানায় অভিযোগ করেছেন তাদের সংখ্যা। কিন্তু এর বাইরে অনেক ঘটনা হয়েছে যেগুলি থানায় ডায়েরিই হয় নি।

এখন যে প্রশ্ন আসে তা হল, এভাবে বছরের পর বছর যেভাবে বধূরা নির্যাতিতা হচ্ছেন, তাদের অনেকেরই জীবন যাচ্ছে — এর কারণ কি? বা দিনের পর দিন এই বিপুল সংখ্যক বধূনির্যাতনের ঘটনা কী কী কারণে হচ্ছে?

এই প্রশ্নের সমাধানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের দ্বারস্থ হলে তারা বলেন, বধূনির্যাতন দিন, মাস বা বছরের ঘটনা নয়। এটি দিনের পর দিন যেমন চলছে তেমনই, শুধুমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই যে এ ঘটনা সীমাবদ্ধ, তাও নয়। পরন্তু অহিন্দুদের মধ্যেও আছে।

আর এতগুলি ঘটনা যে একটি কারণেই হচ্ছে তাও নয়। এর পেছনে অনেকগুলি কারণ আছে। তার মধ্যে যে সমস্ত কারণে এসব ঘটনা ঘটছে বলে তাদের মত তার মধ্যে আছে ঃ

১) পণের জন্য;

২) পণের নির্ধারিত টাকা পাওয়ার পর বধূর বাপের বাড়ির কাছ থেকে আরও টাকা আদায়ের কারণে;

৩) ছেলের বিবাহ পূর্ববর্তী (বান্ধবী জাতীয়) সম্পর্কের কারণে;

৪) বধূর বিবাহ পূর্ববর্তী কোনও (বন্ধুর সঙ্গে) সম্পর্কের কারণে বা বিবাহ পরবর্তী অবাঞ্ছিত সম্পর্কের জের;

৫) ছেলের বিবাহ পরবর্তী অবাঞ্ছিত সম্পর্কের প্রতিবাদ করায়;

৬) বধূর সৌন্দর্যের অপছন্দের কারণে;

৭) সন্তানের জন্ম দিতে না পারার জন্য;

৮) অসহিষ্ণু মনোভাবের জন্য নবাগতাকে সহজ ভাবে মেনে নিতে না পারার জন্য;

৯) ওই বধূ নিজ বাবা-মার মতো শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতিদের সমান মর্যাদা দিতে না পারার কারণে এবং

১০) বধূর শশুর-শাশুড়ী বধূকে নিজের মেয়ের মর্যাদা দিতে না পারা ইত্যাদি অনেক কারণ পাওয়া যায়। যার কোনও কোনওটির কিছু যুক্তি আছে। আবার কোনও কোনওটি অযৌক্তিক।

১১) এর সঙ্গে আমি আরও একটি কারণ যোগ করতে পারি। এক বধূ বিষ খেয়েছিল মরবেন বলে। কেন মরতে যাচ্ছিলেন। কারণ, শাশুড়ীর গঞ্জনা আর অত্যাচার। নির্যাতন বা অত্যাচারের হেতু? ঈর্ষা। নিজের স্বামীর বা শ্বশুরের পুত্রবধূর প্রতি অত্যধিক মমতা বা ভালবাসা। বেশ কিছু ক্ষেত্রে ছেলে নিজের বৌকে বেশি ভালবাসুক তাও সহ্য করতে পারেন না শাশুড়ী।

তবে কারণগুলির যৌক্তিকতা না থাকলেও এই নির্যাতন যেমন হয় শারীরিক, তেমনই মানসিকও হয়। এবং যার পরিণতিতে নির্যাতন ও মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর নির্যাতনে যাদের মুখ্য ভূমিকা থাকে, গোয়েন্দাদের মতে তারা হল শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দেওর এবং স্বয়ং স্বামীও।

গোয়েন্দাদের মতে, ওই সমস্ত নানা কারণে বধূ নির্যাতন ও বধূহত্যার কারণ হলেও তার মধ্যে যে কারণটিকে তারা প্রধানরূপে মনে করছেন সেটি হল পণের জন্য।

এই পণের টাকার জন্য এবং বধূর বাবা-মার কাছ থেকে বাড়তি আদায়ের জন্য ১৯৯৫-২০০১ সালের মে মাস পর্যন্ত ঘটনার যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা দেখলেই সে ধারণা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়, যদিও এই পরিসংখ্যান শহর কলকাতা ব্যতীত সারা পশ্চিমবঙ্গের। তাতে বলা হয়েছে, ১৯৯৫-তে ৬৯ জন মারা গেছেন, যার মধ্যে ১৩ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে।

১৯৯৭-তে দেখা যাচ্ছে ২৪১ জন বধূর মধ্যে পুড়িয়ে মারা হয়েছে ৭৪ জনকে। ১৯৯৮ সালে ৬৪ জনকে পুড়িয়ে মারা হয়। আর অন্যান্যভাবে মারা যায় ১৭৫ জন। ১৯৯৯-এর রিপোর্টে

দেখা যায় মোট মৃত্যু ২৫২ জনের। যার মধ্যে ৬৫ জন বধূকে মারা হয়েছে পুড়িয়েই। আর ২০০০-এর রিপোর্ট অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ২৬৯। এর মধ্যে ৫৯ জনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ২০০১ সালের মে মাস পর্যন্ত পাওয়া রিপোর্টে পণ সংক্রান্ত কারণে মোট মৃত্যু ১০০ জনের। যার মধ্যে ৭৭ জনের অন্যান্য কারণে মৃত্যু হলেও ২৩ জনকে পুড়িয়েই মারা হয়েছে।

পণের জন্য এইভাবে বধূ নির্যাতন হচ্ছে, বধূ হত্যা হচ্ছে, তাদের পুড়িয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে সেই পণ নেওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে? এ-বিষয়ে আমরা আমাদের স্মৃতিকারকদের রচিত শাস্ত্রগুলি এবং রাষ্ট্র-পরিচালকদের তৈরী করা সংবিধানে খুঁজে দেখতে চাই তারা পণ নেওয়া সম্পর্কে কি বলেছেন।

আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে বরপণের কোনও উল্লেখ নেই। তবে মনু, পরাশর, কাশ্যপের সময় থেকে স্মার্ত রঘুনন্দনের যুগ পর্যন্ত কন্যাপণের রেওয়াজ যে বর্তমান ছিল তা অনুমান করা যায়।

ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও বঙ্গদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে কোনও কোনও সমাজে কন্যাপণের রেওয়াজ যে বর্তমান ছিল তা অনুমান করা যায়।

ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও বঙ্গদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে কোনও কোনও সমাজে কন্যাপণের অস্তিত্বের কথা শোনা যায়। উপজাতীয় সমাজে এখনও তা বিদ্যমান। সুখের বিষয় এই যে, মনু, পরাশর, কাশ্যপ থেকে আরম্ভ করে রঘুনন্দন পর্যন্ত সকলেই কন্যাপণ বা কন্যাশুল্কের দোষ বর্ণনাপূর্বক তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন।

প্রাচীন যুগের উদারতা

মনু বলেন ঃ "কন্যার পিতা ধন গ্রহণেব দোষ জেনে কন্যাদানের জন্য অল্পমাত্র শুল্কও গ্রহণ করবেন না। লোভের বশবর্তী হয়ে ধন গ্রহণ করলে বলতে হবে পিতা তার কন্যাকে বিক্রয় করেছেন" (৩/৫১)। শূদ্র ও অন্ত্যজ সমাজে কন্যা শুল্কের প্রচলন দেখেই বোধহয় মনু অপর এক শ্লোকে ওই প্রথাও বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। যার অর্থ;"অতি নীচ শূদ্র জাতিও নিজের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে শুল্ক গ্রহণ করবে না (ব্রাহ্মণের তো কথাই নেই)। শুল্ক গ্রহণ করলে গোপনে কন্যা বিক্রয় করা হয়" (শ্লোক ৯/৯৮)।

এ-বিষয়ে কাশ্যপের নির্দেশ আরও কঠোর — "যারা লোভ বশত শুল্কগ্রহণ পূর্বক নিজ কন্যা বরকে প্রদান করে সেই আত্মবিক্রয়ী পাপী এবং মহাপাতকের অনুষ্ঠাতৃগণ নরকে পতিত হয় এবং বংশের সপ্তপুরুষ পর্যন্ত নষ্ট করে।" এই কথা উল্লেখ করে রঘুনন্দনও তার উদ্বাহতত্ত্বে কন্যাশুল্কের নিষেধ করেছেন। তবে নববধূকে অলঙ্কারাদি দিয়ে যদি সাজিয়ে দেয় তবে তা দোষের নয়। কেন না সেগুলি তো স্ত্রীধন বা কন্যার ভবিষ্যৎ জীবনের রক্ষাকবচ। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে, কন্যাপক্ষের উপর দাবির কোনও রকম চাপ নেই।

শুল্ক কী? এ বিষয়ে মনুসংহিতার টীকাকার মেধাতিথি বলছেন, "আভাষণপূর্বং বরাদ্ গৃহীতম্"। অর্থাৎ পরস্পর বাক্যবিনিময়ের দ্বারা দরদস্তুর বা চুক্তি করে বরপক্ষ থেকে যা নেওয়া হয় তা শুল্কপদবাচ্য। এটা অন্যায় ও পাপ। এটা মেয়ে বিক্রয়ের ব্যবসা।

বৃহৎ পরাশর স্মৃতির (৬/৮) মতে, "এই পরিমাণ দ্রব্য আমাকে দান কর" প্রথমে এই রূপ কথা বলে যেখানে বরকে কন্যা দান করা হয়, সেই বিবাহ দৈত্য-বিবাহবিধি নামে কথিত।

আজকাল কন্যাপণ নেই বললেই চলে। কিন্তু বরপণের ব্যবসা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। এ ব্যবসার চক্রও গড়ে উঠেছে। এই পাপচক্রগুলিকে রোধ করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। বরপণের নামে ঘরে ঘরে ছেলে বিক্রির হিড়িক পড়ে গেছে। অথবা স্মৃতিকার পরাশরের কথা ঘুরিয়ে ধরে বলা যায়, বরশুল্ক গ্রহণ অমানুষের কাজ। দৈত্যের দুরাচার। সে হিসাবে আজকাল দৈত্য বিবাহই হচ্ছে। অথচ এই নোংরা কাজের বিরুদ্ধে কেউ এগিয়ে আসছে না। ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করছে না। প্রতিবাদও করছে না। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। বরং বেকার যুবকেরা কোথাও কর্মের সংস্থান করতে না পেরে এই পণ নেওয়ায় লোভী হচ্ছে। তাদের ধারণা, ওই পণকে মূলধন করে ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্যভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

কিন্তু আজ পর্যন্ত ওই ভাবে ক'জন প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে? নাকি ওইভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়? পরন্তু শ্বশুরবাড়ি টাকার গাছ, তাকে নাড়া দিলেই হুড়হুড় করে টাকা পড়বে, এই চিন্তা করে চাপ দেওয়ার জন্য স্ত্রীকে কাজে লাগাতে হয়। তাতে কাজ না হলে তার উপর নানাভাবে নির্যাতন করা হয়। সে কৌশলও ব্যর্থ হলে বধূকেই মেরে ফেলা হয় বা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয় যাতে সেই বধূ আত্মহত্যা করতে পারে। এভাবেই দিনের পর দিন বধূ নির্যাতন ও বধূ হত্যা বেড়েই চলেছে।

এই পণ নেওযার কাজটি আইনেব দিক থেকেও দণ্ডনীয় অপবাধ। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকাবেব The Dowry Prohibition Act (1961) যথেষ্ট কঠোর। সেখানে বলা হয়েছে পণ নেওয়া নিষিদ্ধ। যৌতুক নেওয়া যেতে পারে, তবে তাও নগদে, অলঙ্কারে ও বস্ত্রাদিতে তার মূল্য যেন দু'হাজার টাকার বেশি না হয়। দু'হাজারের বেশি হলেই অপরাধ। বিয়ের সময়, বিয়ের আগে বা পরে ওই সীমা লঙ্ঘন আইনত নিষিদ্ধ। বিবাহ ব্যাপার উপলক্ষে ওই অর্থসীমার ঊর্ধ্বে পারস্পরিক কোনও চুক্তি সম্পাদন, লেন-দেন প্রতিশ্রুতি বা স্বীকৃতি, কোনও প্রকার অতিরিক্ত ধনাদি দানেব বিবেচনা, সিকিউরিটি বা জামিনস্বরূপ অর্থাদি দান বা বউভাতের খরচ এগুলিও আইনত অপরাধ। পরন্তু পূর্বে যদি কোনও প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি থাকেও এবং বিশেষ কোনও পক্ষ সেই অনুসারে আইনেব সীমার অতিরিক্ত দাবী করে, তবে উক্ত দাবী আদালতে অগ্রাহ্য এবং এইরূপ দাবির জন্য আসামী দণ্ডনীয়। বরের পক্ষে যদি কেউ পণ নেয় তবে আইনত তারও শাস্তি হবে।

আইনে একইভাবে কন্যাপণকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোনও প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচার হবে। যদি অপরাধ প্রমাণিত হয় তবে আসামীর ছয় মাস পর্যন্ত কারাবাস, পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা কারাবাস ও অর্থদণ্ড উভয়ই হতে পারে।

এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও কঠিন। তাদের The Dowry Prohibition West Bengal (Amendment) Act. 1975 অনুসারে আসামীর তিন মাসের উর্দ্ধে তিন বৎসর পর্যন্ত কারাবাস হতে পারে এবং অর্থদণ্ড দুই হাজারের কম নয় এবং দশ হাজার পর্যন্ত। এই অপরাধ দমনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৮টি সমাজকল্যাণ সংস্থাকে অনুমোদন করেছে, যারা দোষীর বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য ওই অনুমোদিত সমাজকল্যাণ সংস্থাকে কর্তৃপক্ষের নিকট কোনও রকম অনুমতি নিতে হবে না। সরকার ঘোষিত এ এক নতুন স্মৃতি।

দুঃখের বিষয়, পণ নেওয়া-দেওয়া রোধ করতে সরকারি এত কঠোরতা এবং শাস্ত্রীয় এত

নিষেধ সত্ত্বেও বরপণ নেওয়ার কমতি নেই। বরং ওই সমস্ত চক্রের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। খোলাখুলি দর কষাকষিও হচ্ছে। অসহায় কন্যাদায়গ্রস্তেরা নিরুপায় হয়ে তা মেনে নিতেও বাধ্য হচ্ছেন। তাদের মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আদালত বা সমাজকল্যাণ সংস্থায় যাওয়ার সাহসই হচ্ছে না। কারণ তাতে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক অকারণে আশঙ্কার সম্ভাবনা আছে। আর শাস্ত্রের কথা? শাস্ত্রের কথা শাস্ত্রেই আছে। ও কথার খোঁজ ক'জন রাখে আর ক'জনেই বা জানে?

এই বধূহত্যা ও বধূনির্যাতনের মতো মস্ত বড় সামাজিক ব্যাধিকে দূর করার জন্য সরকার ও সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলিকে আরও সক্রিয় হতে হবে। পণ নেওয়া যেমন অপরাধ পণ দেওয়াও তেমনই অপরাধ। এই বিবেক মানুষের মধ্যে বিশেষত যুব সমাজের মধ্যে জাগিয়ে দিতে হবে। এ কাজে সমাজকল্যাণ সংস্থা এমন কি মঠ, মিশন, আশ্রম, গুরু-গোঁসাই ও সাধু মহারাজদেরও বিশেষ ভূমিকা নেওয়ার প্রয়োজন আছে। কেন না আজও এদেশের প্রায় প্রতিটি মানুষের কোনও না কোন ধর্মীয় নেতা, ধর্মীয় গুরুর নিকট প্রাণের তারটি বাঁধা আছে। বহু প্রয়োজনেই তারা তাদের শরণাপন্ন হন। সুতরাং তারাও যদি সমাজ থেকে এ পাপস্খলনে উদ্যোগী হন তবে অনেক সফলতা পাওয়া যাবে। তবে সরকারের ভূমিকা এখানে সব থেকে বেশি। কারণ তাদের হাতে আইন, শাসন, অর্থ সবই রয়েছে। সুতরাং যে কোনও ভয়াবহ রোগের মতো এই সামাজিক ব্যাধিকে দূর করতে সরকারি প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। আর সেই প্রচেষ্টাই অধিক কাম্য।

এ-প্রসঙ্গে স্বামী যুক্তানন্দ প্রাচীন শাস্ত্র এবং আধুনিক সংবিধান-এর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। উভয়েই পণ দেওয়া নেওয়ার প্রবল বিরোধী। কিন্তু আমরা এ-যুগের বুলিসর্বস্ব প্রগলভ সস্তা রাজনীতির আড়ালে, প্রগতিশীলতার ছদ্মবেশে বিভিন্ন পন্থায় নারীমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান চালাচ্ছি। এর চেয়ে মধ্যযুগই ভাল ছিল।

ইভটিজিং

গল্প হলেও সত্যি

পুলিশ সার্জেন্ট শুনেও শুধু ঘুষি মেরে ক্ষান্ত হননি সহকর্মীরা। সার্জেন্ট বাপি সেন রাস্তায় পড়ে যাওয়ার পরে তার মাথায় জুতোশুদ্ধু পায়ে আঘাত করেছিলেন রিজার্ভ ফোর্সের ওই পাঁচ কনস্টেবল। তাই বাপির মাথায় প্রায় আধ ইঞ্চি ক্ষত। চিকিৎসকদের মতে, সেটাই ভয়ের কারণ। ডান গালের উপরে মারধরের দাগ, ঘাড়ের পিছনটা ফুলে গিয়েছে। শ্বাসপ্রশ্বাস চালানো হচ্ছে কৃত্রিম ভাবে। চিকিৎসকেরা জানিয়ে দিয়েছেন, বাপির অবস্থা ভাল নয়। সময়ের অপেক্ষা। মঙ্গলবার, বছর শেষের রাতে ওই পাঁচ কনস্টেবলের ইভ-টিজিং রুখতে গিয়ে তাদের হাতে প্রহৃত হন কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট বাপি।

ওই ঘটনায় অভিযুক্ত পীযুষ গোস্বামী ও মধুসুদন চক্রবর্তীকে বুধবারেই গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি তিন জন — শেখরভূষণ মিত্র, শ্রীদাম বাউরি ও মজিবর রহমান বৃহস্পতিবার আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন। বিচারক তাদের ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কেন তাদের পুলিশি হাজতে পাঠানো হল না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন বাপির সহকর্মীরা। দু'পক্ষই কলকাতা পুলিশের কর্মী হওয়ায় পুলিশ-কর্তৃপক্ষ বিপাকে পড়েছেন। কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুজয় চক্রবর্তী বলেন, "অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে ৩০৭ ধারায় খুনের চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে। এর থেকে বেশি আর কী-ই বা করতে পারি আমরা!"

কিন্তু যে-যুবতীকে রক্ষা করতে গিয়ে বাপি মৃত্যুমুখে পড়লেন, তার খোঁজ বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত পাননি পুলিশকর্তারা। অজ্ঞাতপরিচয় ওই যুবক-যুবতীর উদ্দেশ্যে পুলিশের আবেদন ঃ এগিয়ে এসে বলুন, সে রাতে কী ঘটেছিল। বাপির আত্মীয়, পড়শিদের এদিন হাসপাতালে দেখা গেলেও সেই রাতের সঙ্গীদের দেখা মেলেনি। পাড়ার ছেলেরা জানালেন, ওরা সবাই মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত। ওরা বাপির ছোটবেলার বন্ধু!

বাপি যেখানে ভর্তি আছেন, এ দিন ডায়মন্ডহারবার রোডের সেই বেসরকারী হাসপাতালের আটতলায় আই সি সি ইউ-এ গিয়ে দেখা যায়, লম্বা ছিপছিপে চেহারার বাপি বেঁহুশ হয়ে পড়ে আছেন। চাদরে গা ঢাকা, নাকে নল। যন্ত্র দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস মনিটরিং হচ্ছে। হৃৎস্পন্দন ৫০ থেকে ৬৫-এর মধ্যে ওঠানামা করছে। পুলিশের সহকর্মী এবং পরিচিতেরা আসছেন একের পর এক। হাসপাতালের নীচে ভীড় করে আছেন পাড়ার ছেলে আর আত্মীয়বন্ধুরা। পুলিশের সার্জেন্টরা এসে ঘনঘন টহল দিচ্ছেন, তদারক করছেন। পুলিশকর্মীদেরই হাতে বাপির এই হাল, তাই তারা লজ্জিত, মর্মাহত। হাসপাতালে দাঁড়িয়ে এক পুলিশ অফিসার বললেন, "বাপির ঘটনা থেকে পুলিশ বাহিনীকে শিক্ষা নিতে হবে। পুলিশের শৃঙ্খলা যে তলানিতে এসে ঠেকেছে, সেটা তো এতেই পরিষ্কার। প্রতি ব্যারাকে পুলিশকর্মীরা রাতে থাকছেন কিনা, বাইরে গেলে অনুমতি নিচ্ছেন

কি না, ব্যারাকে রাতে বাইরের লোকজন থাকছে কি না — সব খতিয়ে দেখা উচিত।

বেহালার পর্ণশ্রীর সরকারী আবাসনের বাসিন্দা সেন পরিবারের তিন ভাইয়ের মধ্যে বাপিই ছোট। স্ত্রী আর দুই ছেলেকে নিয়ে সংসার। বড় ছেলের বয়স সাত, ছোটটির এক। বাবা অসুস্থ। হাসপাতালে দেখা মেজদা অনুপ সেনের সঙ্গে, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে গাড়িতে বসে অঝোরে কাঁদছেন। ব্যাঙ্ক-কর্মী অনুপবাবু বললেন, "কী ভাবে বাপিকে মারা হয়েছিল, কেন মারা হয়েছিল, সে-সব আমরা জানতে চাই। ও একাই মার খেল, এটা কি ভাবে সম্ভব? বাপি বেশিরভাগ সময় বাড়ির বাইরে থাকত। ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২টায় আমার ছেলেকে বললাম, কাকাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আয়। ছেলে গিয়ে দেখে, কাকা বেরিয়ে গিয়েছে বন্ধুদের সঙ্গে।" এর পর অস্ফুট স্বরে বললেন, "আমার সঙ্গে বাপির দেখাও হল না। মা বলছেন, কী হবে রে! আমি বলেছি, ভগবানকে ডাকো।"

রাজ্যের প্রধান বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ঘটনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেন। বৃহস্পতিবার মমতা বলেন, "পুলিশ ইভ-টিজিং করছে, তার পরে পুলিশই পুলিশকে মারছে। আইনশৃঙ্খলার অবস্থা কোথায় গিয়েছে! পুরো বাহিনীটাকেই উচ্ছৃঙ্খল করে দেওয়া হয়েছে। লজ্জা থাকলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইস্তফা দিন।" এদিন তৃণমূলের কয়েকজন বিধায়ত ওই সার্জেন্টের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁরা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ দাবি করেছেন।

অবশেষে মৃত্যুতে লড়াই শেষ বাপির

মৃত্যুর বিরুদ্ধে পাঁচ দিন ধরে সার্জেন্ট বাপি সেনের লড়াই থেমে গেল সোমবার (০২.০১.০৩) সকালে। বর্ষবরণের রাতে সহকর্মীদের ঘুষি, বুটের লাথি, এবং নানা ধরণের আঘাতে জ্ঞান হারিয়েছিলেন ৩৪ বছরের এই প্রতিবাদী যুবক। আর তার জ্ঞান ফেরেনি। ফিরবেও না কোনওদিন। সকালে হাসপাতাল থেকে তার মৃত্যুর খবর জানানো হয়। তার পর থেকে হাসপাতাল, মর্গ এবং বেহালায় তার বাড়ি ও ক্লাবের বন্ধু, আত্মীয়, সহকর্মী এবং অচেনা মানুষের ভীড় জনস্রোতের চেহারা নিয়েছে।

হাসপাতালের সহকারী সুপার মালা চট্টোপাধ্যায় বলেন, "মস্তিষ্ক কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল অনেক আগে। একে একে অন্য সব অঙ্গও কাজ বন্ধ করে দেয়। এ দিন (০৭.০১.০৩) সকাল সাড়ে ৬টায় হৃৎপিন্ডও থেমে যায়।" তার পর খুলে ফেলা হয় কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর যন্ত্র। মঙ্গলবার বছরের শেষ রাতে চার বন্ধু — গৌতম মজুমদার, অশোক সেনগুপ্ত, নাজিম মোল্লা ও কানাই কুণ্ডুর সঙ্গে বর্ষবরণের আনন্দে মেতে ওঠার জন্য বেরিয়েছিলেন বাপিবাবু। রাস্তায় চোখের সামনে এক মহিলাকে উত্ত্যক্ত করার দৃশ্য দেখে সহ্য হয় নি তাঁর। প্রতিবাদ করেন গাড়ি থেকে নেমে।

লালবাজারে এসে প্রতিবাদী এই সার্জেন্টের মৃতদেহ ফুলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত। মালা দেওয়ার পরে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা বাপিবাবুর দুই দাদাকে খুঁজে নেন মুখ্যমন্ত্রী। দাদা অনুপ সেনের হাত জড়িয়ে ধরে সমবেদনা জানান। পরে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা তার পরিবারের জন্য কিছু কাজ করছি। সেটা করে তার পরে বলব।" বুদ্ধবাবু চলে যাওয়ার পর অনুপবাবু বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, যা প্রয়োজন, তার সবই করব। তার বেশিও করব। স্ত্রীর চাকরির কথা মাথায় আছে।

এমনকি বাচ্চাদের পড়াশোনার খরচ নিয়েও চিন্তা করছি।

সার্জেন্ট বাপি সেনের মৃত্যুর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ছুটে আসেন তার অসংখ্য সহকর্মী। আসেন কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সন্ধি মুখোপাধ্যায় এবং ডি সি মৃত্যুঞ্জয় সিংহ, ডি সি (বন্দর) হরমনপ্রীত সিং, ডিসি (সেন্ট্রাল) জুলফিকার হাসান। মর্গে এসে সমস্ত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুজয় চক্রবর্ত্তী। হাসপাতালের সমস্ত কাজ শেষ করে মৃতদেহ নিয়ে কনভয় বেরোয় বেলা ১১টা নাগা। সেখান থেকে কনভয় যায় কাঁটাপুকুর পুলিশ মর্গে। সেখানে ময়না-তদন্তের কাজ শেষ হয় ৩টে নাগাদ, ৩টের পরে কনভয় বন্দরেব ভিতর দিয়ে লালবাজারে হাজির হয। কনভয়েব শুরুতে মোটরসাইকেল নিয়ে তারই সহকর্মীরা। পিছনে হুটার নিয়ে টালিগঞ্জ ট্রাফিক গার্ডের ও সি অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পিছনে শববাহী কাচের গাড়ীতে সার্জেন্ট বাপি সেন।

কাঁটাপুকুর মর্গে চিকিৎসক যখন বাপির স্পন্দনহীন দেহ নিয়ে কাঁটাছেড়ায় ব্যস্ত, বাইরে পুলিশের জিপে বসেও তখন কাঁটাছেড়া করছিলেন লালবাজারের দুই পুলিশকর্তা। ডি সি (ট্রাফিক) গাড়ীতে বসে ডি সি (বন্দর)-কে বলেন, ১১ বছরের চাকরিতে, প্রশিক্ষণেব সময় কখনও সামান্য শাস্তিও দেওয়া যায় নি বাপি সেনকে। বরং তিন-তিন বার সাহসের জন্য পেয়েছেন পুরস্কার। শুধু তার উর্ধ্বতন কর্তারা নন, দুপুবে মর্গে পৌছে কান্নায় ভেঙে পড়েন সহকর্মী সার্জেন্ট (গোয়েন্দা বিভাগের) অনির্বাণ বিশ্বাস সহ অনেকে। কে কাকে সান্ত্বনা দেবেন, তাই বোঝা যায়নি এক সময়। কাঁটাপুকুরে আসার আগে ডি সি (ট্রাফিক) বলেন, "আমাদের পুলিশকর্মীদের জীবনই হল ফুল অব হ্যাজার্ডস। এই ঘটনার পবেও অন্য পুলিশকর্মীরা এই ভাবেই আবাব প্রতিবাদ করবেন হয়তো।"

এবার খুনের অভিযোগ পাঁচ পুলিশের বিরুদ্ধেই

প্রহৃত সার্জেন্ট বাপি সেনেরে মৃত্যু হওয়ায় তাকে আক্রমণের অভিযোগে ধৃত পাঁচ পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে এখন সরাসরি হত্যার অভিযোগ আনছে পুলিশ। এর আগে আদালতে ধৃতদের বিরুদ্ধে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ (৩০৭) জানানো হয়েছিল। এখন ওই ধারা সংশোধন করে হত্যার অভিযোগ (৩০২) আনা হচ্ছে।

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের সমাবেশে রাজ্যের প্রধান বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফানাণ্ডেজের কাছে বাপির মৃত্যু এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার সি বি আই তদন্ত দাবি করেছেন। ব্রিগেডের সমাবেশের পরে মমতা দলের বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে মৃত সার্জেন্টের বাড়িতে পাঠান। মমতা নিজে যান শ্মশানে, বাপির শেষকৃত্যে যোগ দিতে। ব্রিগেডে মমতা বলেন, "সার্জেন্ট বাপি আমার পরিচিত ছিলেন। এক তরুণীর সম্মান বাঁচাতে গিয়ে তাকে নিজের জীবন দিতে হল। আমি জর্জজির কাছে এই ঘটনার সি বি আই তদন্ত চাইছি।" সহকর্মীদের প্রহারে বাপির মৃত্যু নিয়ে সামগ্রিক ভাবেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

পি ডি এসের সাধারণ সম্পাদক সমীর পুততুন্ডও এ দিন ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে দোষীদের কঠোরতম শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এই ধরণের ঘটনা আর না-ঘটে, তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

এ দিকে, সোমবার ধৃত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে আদালতে ধারা সংশোধনের আবেদন

জানানো না হলেও সরকারী আইনজীবী সত্য পাঠক জানিয়েছেন, যত শীঘ্র সম্ভব তারা আবেদন জানাবেন। ধৃতদের গ্রেফতার করার সময়েও বাপি জীবিত ছিলেন। তাই পুলিশ হত্যার চেষ্টার অভিযোগ এনেছিল। এখন বাপির মৃত্যুর হওয়ায় ধৃতদের বিরুদ্ধে তাঁকে হত্যা করার অভিযোগ আনা হবে। আইনজীবীদের বক্তব্য, আক্রান্ত ব্যক্তি বেঁচে থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই মামলা কিছুটা লঘু হত। তা ছাড়া বাপির সাক্ষ্যও অনেক নির্ভরযোগ্য হত। কিন্তু এখন বিষয়টির গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল। কারণ, হত্যার মামলা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া যাদের কাজ মানুষকে বিপদ বা আক্রমণ থেকে উদ্ধার করা, সেই পুলিশ তা না করে এক দম্পতির উপরে অত্যাচার চালাচ্ছে এবং বাধাদানকারীকে হত্যা করছে। অন্য হত্যার সঙ্গে এই হত্যার মোটিভেরও অনেক পার্থক্য। এটি পরোক্ষ হত্যা নয়।

সেই তরুণীর বাইকে ধাক্কা দিয়েছিল পাঁচ পুলিশের ট্যাক্সি

যে-মহিলার সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে সহকর্মীদের প্রহারে সার্জেন্ট বাপি সেনকে মরতে হল, তার চে-দিনের আচরণ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পুলিশ জানতে পেরেছে। ধৃতদের জেরা করে তদন্তকারী গোয়েন্দা অফিসারেরা এটাও জেনেছেন বাপিবাবুর সঙ্গে রিজার্ভ ফোর্সের ওই কনস্টেবলদের বচসা শুরু হওয়ার আগে তাদের ট্যাক্সির সঙ্গে ওই মহিলার মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগে। মোটরসাইকেলের পিছনে ট্যাক্সিটি ধাক্কা মারা মাত্রই মোটরসাইকেল থামিয়ে ওই তরুণী এবং তার সঙ্গী যুবকটি ট্যাক্সিচালককে থামিয়ে চিৎকার করে বকাবকি শুরু করেন। ট্যাক্সি চালকের সঙ্গে বকাবকি হচ্ছে দেখে ওই পাঁচ কনস্টেবল তরুণীকে টানাটানি করতে শুরু করেন। তখনই সার্জেন্ট বাপি সেন বন্ধুদের নিয়ে মারুতি গাড়ি করে ওখানে আসেন। গভীর রাতে এক তরুণীকে টানাটানি করতে দেখেই বাপি গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। বাপি নেমেই তরুণীকে উদ্ধার কবেন। তার পরেই বাপির সঙ্গে কনস্টেবলের হাতাহাতি শুরু হয়। এই সুযোগে মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায় ওই তরুণ-তরুণী।

মোটরসাইকেলের পিছনে বসে রাস্তা দিয়ে যাওয়া জনতাকে লক্ষ্য করে ওই তরুণীর 'উড়ো চুমু'-ই পাঁচ কনস্টেবলকে আকৃষ্ট করেছিল বলেও গোয়েন্দারা তদন্তে জানতে পেরেছেন। তারা মহিলার যে বর্ণনা পেয়েছেন, তাতে তার বয়স ২০ থেকে ২২-এর মধ্যে। খুব লম্বা নন। চেহারা ছিপছিপে। ফর্সা গায়ের রং। 'হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার' বলে চিৎকার করছিলেন এবং হাত নাড়াতে নাড়াতে যাচ্ছিলেন ওই তরুণী। তবে বাপি সেন সার্জেন্ট পরিচয় দেওয়ার পরেও কেন তারা ওকে মারলেন সেই বিষয়ে চুপ কনস্টেবলরা। মোটরসাইকেলের নম্বর কী তা-ও তাদের কাছ থেকে তদন্তকারীরা জানতে পারেনি। গোয়েন্দারা ওই মোটর সাইকেলের বিষয়ে খোঁজ খবর শুরু করেছেন।

এক বছরও হয়নি এখনও। সেই একই ছবি যেন। একই সচকিত বিস্ময়। লজ্জাহত নৈঃশব্দ। বাপি সেন ঃ ৬ জানুয়ারী ২০০৩। সঞ্জিত দাস ঃ ১৪ এপ্রিল ২০০২। একটি ঘটনা কলকাতায়। অন্যটি প্রতিবেশী উত্তর ২৪ পরগণায়। দু'টি মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিলেন দু'জন পুরুষ।

কিন্তু সবটুকু একই নয়। পুলিশের দক্ষতা আর উদ্যোগের তারতম্যটুকু তো নয়ই। বর্ষশেষে মধ্যরাত্রে ট্রাফির সার্জেন্ট বাপি সেন প্রচন্ড ভাবে প্রহৃত হলেন পাঁচ জন কনস্টেবলের হাতে। অভিযুক্ত পাঁচ জনের প্রথম দু'জন পরদিন ব্যারাক থেকে গ্রেফতার হয়। বাকি তিন জন তার

পরদিন আদালতে আত্মসমর্পণ করল। ১৬ জানুয়ারী পর্যন্ত জেল হাজত। পুলিশি উদ্যোগে নজিরবিহীন ভাবে আবার জেল হাজত থেকে পুলিশ হাজত। হেনস্থার শিকার মেয়েটির জন্য তোলপাড় পুলিশ মহল। পাওয়া যাচ্ছে না তাঁকে। পুলিশ বলল, তাতে কী, বাকি সাক্ষীরা তো আছে।

ইতিমধ্যে সকলের সব শুভকামনার গন্ডি ছড়িয়ে চলে গেলেন বাপি সেন। ফলে পাঁচ কনস্টেবলকে শ্লীলতাহানির সঙ্গে সঙ্গে হত্যার অভিযোগেও অভিযুক্ত করা হল। সাময়িক বরখাস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল বিচারবিভাগীয় তদন্ত। বাপির মৃত্যুর তিন দিন পরেই অভিযুক্তদের আদালতে তোলা হল। আশা করা যায়, চার্জ গঠন এরকম দ্রুততার সঙ্গেই ঘটবে। এখানেই এ-ঘটনা অন্য ঘটনাগুলির থেকে আলাদ।

আলাদা সঞ্জিত দাসের ঘটনা থেকেও। সে ক্ষেত্রেও বাসে মদ্যপরা যে মেয়েটির শ্লীলতাহানি করছিল। কেউ এগিয়ে আসেনি। অথচ সঞ্জিত বাধা দিতে গিয়ে নিহত হন। অন্যদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে চার জনকে ধরে চার্জও গঠন করা হয়েছিল। কাকতালীয় ভাবে মূল অভিযুক্ত রাজু দাস ধরা পড়েছে, বাপি সেরে ঘটনা নিয়ে তোলপাড় শুরু হওয়ার পর। এহ বাহ্য, ঘটনাটি অন্তত ধামাচাপা পড়ে যায় নি। কিন্তু ধামাচাপা পড়েছে ১৯৯২ সালের ১২ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ পরিবহণের বাসে জনৈক যাত্রী শ্লীলতাহানি রুখতে গিয়ে নিহত যুবরাজ ভৌমিকের ঘটনা। আমরা ভুলে গেছি, খোদ কোলকাতার বুকে ঘটা বিজন বসু বা সমরেশ সান্যালের নাম। আমরা খবর রাখিনি, তাদের ঘটনায় আদৌ পুলিশি তদন্তের শেষে বিচার হয়ে কেউ শাস্তি পেয়েছিল কিনা।

বাপি সেনের ঘটনায় পুলিশি তৎপরতা আমাদের অভিভূত করেছে। এই তৎপরতা, এই দক্ষতা, আন্তরিকতা কেন আমরা সমস্ত ঘটনা দেখতে পাই না? এই দক্ষতা-তৎপরতা-আন্তরিকতা কি শুধু বাপি-সহকর্মী বলেই দেখা গেল? সেই সঙ্গে কাজ করেছে কনস্টেবল বনাম সার্জেন্ট, অধস্তন-উর্দ্ধতন পদমর্যাদার বোধ? ওই পাঁচ জন যে সংগঠনের সদস্য, সেই কলকাতা পুলিশ এ্যাসোসিয়েশনের নেতা প্রদ্যোতকুমার মন্ডলের এক সাক্ষাৎকারে যেন সেই শ্রেণী-বৈষম্যেরই প্রকাশ। তাঁর মতে, এ ঘটনা পুলিশবাহিনীর বিশৃঙ্খলার প্রকাশ নয়, তলার স্তরকে চাপে রাখতে বড়কর্তাদের প্রচার। বিশৃঙ্খলার প্রশ্নে তিনি অবশ্য এ-ও বলেছেন, ঘটনার সময় বাপি সেন বা অভিযুক্ত কনস্টেবলরা কেউই কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন না। সুতরাং শৃঙ্খলাভঙ্গের প্রশ্নটা আসছে কোথা থেকে? দু-তরফই তো প্রাক্-নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপনে যোগ দিয়েছিল। মেয়েদের উত্যক্ত করে হুল্লোড় আর তা আটকানোর চেষ্টা তবে একই ধরণের উৎসব উদ্‌যাপন!

এ-বার পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব নিয়ে মেয়েটিকে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসার জন্য গণমাধ্যমে ৭ জানুয়ারি একটি প্রকাশ্য আবেদন জানান। মেয়েটির পরিচয় গোপন রাখা হবে বলে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও কোনও কাজ হয়নি। এর মধ্যে মেয়েটিকে পাওয়া গেছে বলে সংবাদ বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। অনেকের আশঙ্কা, মেয়েটি প্রকাশ্যে এলে পুলিশের একাংশের অসুবিধা হতে পারে বলেই নাকি সে আসছে না। পুলিশ কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, তদন্ত চলাকালে মেয়েটির পরিচয় গোপন রাখা সম্ভব হলেও 'টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড'-এর সময় অভিযুক্তদের সামনে গিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। পরিচয় গোপন থাকবে কি বিচার চলাকালেও? গোপনীয়তার দেওয়াল থাক বা না থাক, সে আড়াল নিশ্ছিদ্র না সছিদ্র, এ সমস্ত প্রশ্নে গিয়ে সেই মেয়েটির বা যুগলটির বা দম্পতিটির এগিয়ে না আসাটাকে কোনও ভাবে লঘু

করছি না। না এসে সে অবশ্যই অন্যায় করেছে। তার দায়িত্ব, সামাজিকতা, কৃতজ্ঞতার বোধ নিয়ে প্রশ্ন শুরু হয়েছে।

কিন্তু গত সপ্তাহ দুয়েক নানা সাক্ষ্যে মেয়েটির ছবিটা যেন বদলাতে শুরু করেছে। প্রথমে যখন ঘটনাটা সংবাদে প্রকাশ পেল, জানা গিয়েছিল যে সে মোটরবাইকের পিছনে বসে যাচ্ছিল। ট্রাফিক সিগনালে থামলে তার হাত ধরে টানে কনস্টেবলরা। তার পর জানা গেল, তার খোলা চুল ধরে টানায় সে বেসামাল হয়ে পড়ে, ফলে তার সঙ্গী বাইক থামাতে বাধ্য হয়। তারপর দিন আবার জানা গেল তার পোশাকের বিবরণ ঃ 'টাইট জিনস্ আর ফুলফুল ছাপা টাইট টপ। তারপর আবার জানা গেল যে, সে হাত নাড়ছিল। সে নাকি পুলিশেব উদ্দেশ্যে মোটেই নির্দোষ ভাবে হাত নাড়ছিল না, 'উড়ন্ত চুমু' ছুঁড়ছিল। অর্থাৎ তার আচরণের বিবরণটা এমনভাবে বদলাচ্ছে যাতে কোথাও যেন একটা সম্মতির বাতাবরণ তৈরী হচ্ছে। যেন বোঝানো হচ্ছে, মধ্যরাত্রে পুরুষসঙ্গীর পিছনে টাইট জিনস্ টাইট টপ পরা বাইকে চড়া অচেনা পুরুষের উদ্দেশ্যে উড়ন্ত চুমু ছোড়া মেয়েদের আচরণের শ্লীলতার আবার আছেটা কি, যাতে তার হানি হবে? এটাই যদি ছবি তবে বাপিকে কেন মারা যেতে হল? নাকি অভিযুক্ত পুলিশদের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগের গুরুত্ব এতে হালকা হয়ে যাচ্ছে? লঘু হয়ে যাচ্ছে বাপির বন্ধুদের আপাত নিষ্ক্রিয়তার দায়? নাকি বাপি বা মেয়েটি কেউ সাক্ষ্য দিতে আসবে না ধরে নিয়েই এই সচেতন পরিবর্তনের প্রয়াস? আর অভিযুক্ত কনস্টেবলদের প্রতি সহকর্মীদের সহানুভূতির সাক্ষ্য তো দেখা গেছে বউবাজার থানায় এদের রাখার সময় বা এদের আদালতে হাজির করার সময়। এমকি তাদের নেতা বলেছেন যে, অভিযোগ প্রমাণিত না হলে এদের সংগঠনের সদস্যপদ বাতিল হবে না।

বাপি সেনের সাহসিকতাকে মানুষ নানা ভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর আরোগ্যর প্রার্থনায় সি এম আর আই-এর সামনে মোমবাতি হাতে প্রার্থনা করেছেন নানান বয়সের মানুষ, যাঁদের সঙ্গে ছিল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও। সেখানে গান করেছেন 'ক্রসউইন্ডস'। বাপির স্ত্রী সোমার পাশে দাঁড়িয়েছেন আর এক নিহত যুবরাজ ভৌমিকের স্ত্রী চন্দ্রলেখা। তার স্মরণে সভা করেছেন যোগমায়াদেবী কলেজের ছাত্রী ও শিক্ষিকারা। সাংগঠনিক ভাবে সভা করেছে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। তাত্ত্বিক স্তরে পুলিশি ব্যবস্থা হল রাষ্ট্রের সেই হাতিয়ার যা প্রচলিত অসাম্যগুলিকে টিকিয়ে রাখে — এ কথা মনে করে বহু নারী সংগঠন। আবার নারীর বহু সমস্যার সমাধানে আমরা চাই পেশাগত স্তরে দক্ষ, দ্রুত কার্যক্ষম, একই সঙ্গে সংবেদনশীল আর মানবিক পুলিশি হস্তক্ষেপ। একক মানুষ, বিশেষত পুলিশের সাহসী প্রয়াসকে ঠিক কি ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, সেই দ্বিধা হয়তো অনেকের আছে। সে দোটানার দায় থেকে নিজেকেও সরিয়ে রাখছি না। এই লেখা হোক ট্রাফিক সার্জেন্ট বাপি সেনের মানবিক ও পেশাদারি সংবেদনশীলতার প্রতি আমাদের মতো দ্বিধান্বিত মানুষের নম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।

সার্জেন্ট বাপি সেন ইভটিজিং রুখতে গিয়ে যেভাবে পুলিশের হাতে মার খেলেন এবং মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে ৬ জানুয়ারী মারা গেলেন তাতে পুলিশ বাহিনীর নগ্নরূপটি আরও একবার জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ল। স্বর্গত বাপি সেন যদি নিজে পুলিশ না হতেন তাহলে হয়তো এই পাঁচ বেপরোয়া পুলিশ কর্মীকে ধরাই যেত না অথবা পুলিশই ঘটনাটিকে অন্যরকম ভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করত। বিগত দিনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জেলায় জেলায় এমন অনেক পুলিশের অত্যাচার দেখেছে যেখানে দোষী পুলিশের কোন সাজাই হয় নি। প্রশাসন এবং সি পি এম দল

অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে পুলিশকে নিজেদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করে আসছে বেশ কিছুদিন ধরে।

বাপি সেন হত্যাকাণ্ডের কেন্দ্রে থাকা মোটরবাইকের সেই অজ্ঞাত পরিচয় মহিলাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন শহরের পুলিশ কমিশনার। শহরের বিদগ্ধ মানুষেরাও মতামত দিয়েছেন, অবিলম্বে তার আত্মপ্রকাশ করে দোষীদের সনাক্ত করা উচিত। কিন্তু এই শহরের পুলিশ কি সত্যিই তাকে যথাযথ নিরাপত্তা দিতে পারে সে প্রমাণ ভবানীপুরের জয়ন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় পাননি। দিন-দুপুরে তাকে নিগ্রহ করার পর পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে তার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত। কৃষ্ণকুমার দাসের কাছে এ-রকম একটি চিত্র পেলাম।

ইভটিজিং-এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে সার্জেন্ট বাপি সেনের মৃত্যুর ঘটনায় গোটা রাজ্য যখন তোলপাড় তখনই কলকাতার ভবানীপুরে দিন-দুপুরে ফের নারী নিগ্রহের ঘটনা ঘটল। নিগৃহীতা নারীর স্বামী প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিন ইভ-টিজারদের হাতে প্রহৃত হয়ে যখম হয়েছেন। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশে অভিযোগ জানালেও চারদিন পরেও ইভ-টিজারদের গ্রেফতারে থানা রীতিমতো উদাসীন আছে। উপরন্তু পুলিশ কর্তারা দোষীদের 'সনাক্তকরণে বিপদ হতে পারে' বলে সতর্ক করেছেন পুলিশে অভিযোগ জানানো দম্পতিকে। পুলিশি অবহেলায় হতাশ দম্পতি জানিয়েছেন "ইভ-টিজিং-এর প্রতিবাদ করে মার খেলাম। পুলিশকে জানিয়ে অপরাধীদের দেওয়া দূরের কথা, উপরন্তু আমাদেরই ভয় দেখাচ্ছে। এ কোন রাজত্বে বাস করছি।" স্বয়ং ভবানীপুর থানার ওসি অপূর্ব সোম চৌধুরী জানিয়েছেন, "ইভ-টিজার যুবকদের সন্ধানে পুলিশ বার কয়েক তল্লাশি চালিয়েছে। এমনকি অভিযোগকারীদের সঙ্গে নিয়েও কিন্তু অভিযুক্তদের সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি।" অবশ্য পুলিশি অনীহা দেখে স্থানীয় পুরমাতা তথা হাইকোর্টের আইনজীবী অপর্ণা নিয়োগীর দ্বারস্থ হয়েছেন এই দম্পতি। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মোটরবাইক চেপে বনধের দিন বিকেলে দক্ষিণ কলকাতার নর্দার্ন পার্কের পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তার নাম জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোড। স্বামী চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্ত্রী জয়ন্তী। চঞ্চলের বাড়ি রাসবিহারী মোড় লাগোয়া নেপাল ভট্টাচার্য রোডে। আর জয়ন্তী মিস্ ইন্ডিয়া রেশমি ঘোষের পাশের বাড়ির মেয়ে। মোহিনী মোহন রোড, এক কথায় অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের পাড়ার মেয়ে। মাস কয়েক আগে পেটে বড় ধরণের অস্ত্রোপচার হয়েছে। দুজনে মোটর বাইকে চেপে শুক্রবার বিকেল সোয়া চারটে নাগাদ নর্দার্ন পার্কের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। জয়ন্তীর নিজের কথায়, "একটু আগে দোকান থেকে কয়েকটা হজমোলা কিনেছিলাম। চঞ্চল একটা হজমোলা খেতে চাইল। আর সে জন্যই মোটরবাইক থামাল। গাড়িতে বসেই আমি যখন হজমোলা দিচ্ছিলাম, তখনই তিনটে ছেলে এসে আমার কাছে ঘেঁষে দাড়ায়। একজন আমার গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঝটকা মেরে সরিয়ে দিই। এরপরই ওই তিনটে ছেলে আমাকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল ইঙ্গিত করে কথা বলতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রতিবাদ করি। আমার স্বামী এগিয়ে যায়। পাল্টা তেড়ে আসে ওই ছেলেগুলো। সঙ্গে আরও চার-পাঁচটা ছেলে। একসময় পাথর ছুরে মারে আমার স্বামীকে লক্ষ্য করে। স্বামীর বাঁদিকের চোখের কোণায় লেগে কেটে রক্ত পড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে থানায় যাওয়ার কথা বলতেই উল্টে ছেলেগুলো হুমকি দেয়, 'থানায় গিয়ে বলবি, তোদের বাবা এই সব করেছে। পুলিশের কি করার ক্ষমতা আছে করে নেবে।' পার্কে খেলাধূলা করা ও ঘুরতে আসা কিছু লোক এসে আমাদের ঘিরে নেয়। তখনও এই যুবকগুলো আমার স্বামী ও আমাকে সরিয়ে দেয়। এলাকা

ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য রীতিমতো চাপাচাপি শুরু করে কিছু লোক। যাওয়ার আগে জেনে যাই হামলাকারীরা স্থানীয় ওড়িয়া পাড়ার ছেলে। কেউ কেউ নাকি 'ভয়ানক বিপজ্জনক'।

এর পরের ঘটনা বলেন নিগৃহীতার স্বামী চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়। চঞ্চলবাবুর কথায়, "স্ত্রী ও আমি দু'জন মার খেয়ে সরাসরি চলে আসি ভবানীপুর থানায়। থানার কর্তব্যরত অফিসার পি ভট্টাচার্য অভিযোগ (জি ডি নম্বর-১০৮০) লিখে নেন। পরে একটা মামলাও (কেস নম্বর-৮ তারিখ-১০) শুরু করেছেন ভারতীয় দন্ডবিধির ৫০৯/৩২৩/১১৪ ধারায়। কিন্তু 'গাড়ি নেই' এই অজুহাতে প্রায় আধঘন্টা পরে ঘটনাস্থলে যায়। ততক্ষণে সবাই এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছে। দু'দিন পুলিশের সঙ্গে ঘুরেছি। কিন্তু তাদের দেখতে পাচ্ছি না।" এর পরই রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করে চঞ্চলবাবু বলেন, পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে প্রথমেই থানার অফিসার আমাদের ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন। পুলিশ বলেছিল, 'এই জন্য সরাসরি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অভিযুক্তদের সনাক্ত করতে হবে।' কিন্তু আমাদের দু'জনেরই বক্তব্য, সবাই পিছিয়ে গেলে কী হবে? যে কোনও মূল্যে শাস্তি হোক দুষ্কৃতীদের। এজন্য যে কোনও পরীক্ষা বা সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে রাজি আছি।"

ঘটনার চারদিন পর ইভ-টিজাররা গ্রেফতার না হওয়ায় ক্ষুব্ধ জয়ন্তী বলেন, "মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। কিন্তু শহরের এই ইভটিজারদের বিরুদ্ধে একবার যখন জেহাদ ঘোষণা করেছি তখন শেষ দেখতে চাই। জানতে চাই, মহিলারা এগিয়ে এলে পুলিশ কমিশনার বা পুলিশ মন্ত্রী কি ভূমিকা নেন।"

গোটা বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় পুরমাতা অপর্ণা নিয়োগীর কাছে গিয়েছিলেন দম্পতি। তবে, ভবানীপুর থানার পুলিশ অফিসাররা জানিয়েছেন, একাধিকবার এলাকায় অভিযান চালালেও অভিযুক্তদের সন্ধান পাওয়া যায় নি। অবশ্য পুরমাতা অর্পণা নিয়োগী নিজে পুলিশি ভূমিকায় ভীষণ ক্ষুব্ধ। তিনি বলেন, "ইভ-টিজিং ও নারী নিগ্রহের ঘটনায় প্রতিবাদ জানাতে একজন এগিয়ে এসেছেন। তাকে সাহায্য করতে কোথায় পুলিশ দ্রুত কাজ করবে, না পুলিশই উদাসীন।

কিশোরীর সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে যুবক খুন বরাহনগরে, ধৃত দুই দুষ্কৃতী

সার্জেন্ট বাপি সেনের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই একই রকম ঘটনার শিকার হলেন আর এক যুবক। এক বালিকার শালীনতা রক্ষা করতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে মৃত্যু হল তার। হামলায় মারাত্মক জখম হয়েছেন তার তিন সঙ্গী। স্থানীয় মানুষ অবশ্য দুই দুষ্কৃতীকেই ধরে ফেলেন। তাদেরকে বাজারে বেঁধে রেখে পেটানো হয়, দু'জনকেই হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বরাহনগর রেল লাইন এলাকায়।

পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার রাতে ওখানকার এক বাড়িতে ১২ বছরের একটি বালিকার মুখ চেপে ধরে তার উপরে অত্যাচার চালাচ্ছিল দু'জন। তাদের নাম নন্দকুমার সাহানি ও নন্দকুমার সাউ বলে পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনাস্থলের কাছেই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত একটি মার্কেট, তার নিরাপত্তা রক্ষী রাজু গুপ্ত (২০) তিন বন্ধুর সঙ্গে তখন বাজারে বসেছিলেন। ধস্তাধস্তিতে একসময়ে বালিকাটির মুখের বাঁধন সরে যেতেই সে চেঁচিয়ে ওঠে। চিৎকার শুনে সঙ্গীদের নিয়ে রাজু ছুটে যান। বালিকানিগ্রহকারীরা ছুরি নিয়ে তাদের উপর চড়াও হয়। ছুরির আঘাতে রাজুর ফুসফুস ফুটো হয়ে যায়। হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। তার তিন সঙ্গীও গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনাটির

সঙ্গে পুলিশ সার্জেন্ট বাপি সেনের মৃত্যুর ঘটনার মিল রয়েছে।

বরাহনগরের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী জানান, "রেল লাইনের ধারের একটা ঠেকে প্রতি রাতের মতো ওই রাতেও মদের আসর বসেছিল। রাত ১০টা নাগাদ পাড়ারই এক বাচ্চা মেয়ে বাড়ির সামনে ডেকচির জল ফেলে ফিরছিল। ওই সময়ে ঠেকের এক জন ওর হাত টেনে ধরে। আর এক জন চেপে রাখে মুখ। ধস্তাধস্তির মধ্যে মেয়েটা কোনও রকমে মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে চিৎকার করে ওঠে। ওর মা ও চেঁচাতে থাকে। বাজারে বসে ছিল রাজু আর তার বন্ধুরা। চেঁচামেচি শুনে ওরা ছুটে যায়। তার পরেই আর্তনাদ। গিয়ে দেখা গেল, রাজু বুকে হাত দিয়ে পড়ে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে।"

পুলিশ জানায়, বালিকাটি স্থানীয় একটি স্কুলে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়েছিল। পরে স্কুল ছেড়ে দেয়। তার বাবা ভ্যান-রিক্সা চালান। মেয়েটি নিজে থানায় পুরো ঘটনা জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করে। রাতে তার মেডিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা ও শ্লীলতাহানির মামলা শুরু করেছে। রাজুর মৃত্যুর ফলে তার সঙ্গে জুড়বে খুনের অভিযোগও। দুই নন্দকুমারই থাকে ডানলপের বাজারের ঝুপড়িতে। দু'জনেরই বয়স মধ্য-চল্লিশের কোঠায়। নন্দকুমার সাইনি সুদের কারবার করে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বুধবার গিয়ে দেখা গেল এলাকা থমথমে। রাজুর পিসিমা ঘরে বসে কাঁদছিলেন, "রাতে ভাত খেয়ে বাইরের বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল রাজু। হঠাৎ চিৎকার শুনে বলল, কি হচ্ছে দেখে আসি পিসি।" রাজুর সঙ্গে ছুঠেছিলেন রঞ্জিত সাউ। তার কোমরে আর বুকে ছুরির কোপ। তিনি বললেন, "মেয়ের গলার চিৎকার শুনে আমরা ছুটে গেলাম। আমাদের দেখে ওরা ছুরি চালাল।" ঝুপড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ওই বালিকার মা বললেন, "রাতে ওর বাবা ঘরে রাখা জল বাইরে ফেলে দিতে বলেছিল। ও সামনেই জল ফেলতে গেল। তার পরেই 'মাগো' বলে চিৎকার। আমরা ভাবলাম, চোর এসেছে। তাই আমরাও চোর চোর বলে চিৎকার করে উঠি।"

ভাইয়ের স্ত্রীর লাঞ্ছনা রুখে দিয়ে যুবা খুন

ভাইয়ের বৌকে উত্ত্যক্ত করার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোয় এক যুবকের প্রাণ গেল। তাঁর নাম গোরা বাউড়ি (৩৫), পেশায় খেতমজুর। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বুদবুদ থানা এলাকার ভরতপুর গ্রামে। পুলিশ ওই রাতেই খুনের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। তার নাম সনাতন বাউড়ি। সে-ও এই গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ সুপার বি এন রশেম বৃহস্পতিবার বলেন, "জেরায় সনাতন নিজের দোষ কবুল করেছে।"

বাঁকুড়া-বর্ধমান সীমানা ভরতপুর গ্রামের বাসিন্দা সনাতনের বিরুদ্ধে মহিলাদের উত্ত্যক্ত করার অভিযোগ অনেক দিনের। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ এক বাক্যে বলছেন সে কথা। তাদের অভিযোগ, পুরুষেরা কাজে বেরিয়ে গেলে বাড়িতে একা থাকা মহিলারা ছিলেন সনাতনের লক্ষ্য। ছাদের টালি খুলে কিংবা খালি ঘরে আচমকা হানা দিয়ে মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে পালিয়ে যেত সে। লজ্জায়, ভয়ে মহিলারা সে-কথা কাউকে বলতে পারতেন না। সেই সুযোগটাই কাজে লাগাত সনাতন। পুলিশও জানিয়েছে, মহিলাদের বিরক্ত করার পাশাপাশি চুরি-ডাকাতিরও অভিযোগ আছে সনাতনের বিরুদ্ধে।

পুলিশ জানায়, গোরার ভাই বীরু বাউড়ির স্ত্রীর প্রতি সনাতনের কু-নজর ছিল। মাস দুয়েক

আগে এক রাতে আচমকা সে হীরুবাবুর বাড়িতে হানা দেয়। হীরুবাবু বলেন, "সেই সময় আমি বাড়িতে ছিলাম না। কিন্তু দাদা সনাতনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। পরে ওকে মারতে মারতে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া হয়।" সনাতন তখন গোরাবাবুকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। তার পরে গ্রামের পথে ঘাটে সে কয়েকবার গোরাবাবুকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। তার পরে গ্রামের পথেঘাটে যে ক'বার গোরাবাবুর সঙ্গে সনাতনের দেখা হয়েছে, তত বারই সে ওই হুমকি দিয়েছে। হীরুবাবু জানান, বুধবার দুপুরেও গ্রামের হাটতলায় দাদার সঙ্গে সনাতনের কথা কাটাকাটি হয়।

ভরতপুরের মানুষ জানান, বুধবার রাতে ১০টা নাগাদ গ্রামের শরণপুকুরের পাড়ে গোরা বাউরির ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তার কানের পাশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল। এই ঘটনার পর গ্রামে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দলে দলে মানুষ শরণপুকুরের পাড়ে ভিড় জমান। কিন্তু দেখা মেলেনি সনাতনের। স্থানীয় বাসিন্দা দুলু বাউড়ি বলেন, "তখনই আমাদের মনে সন্দেহ দৃঢ় হয়। আমরা খোঁজখবর শুরু করি। বেশ কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, রক্তমাখা জামাকাপড় পরে অন্ধকার মাঠে বসে আছে সে।" গ্রামের মানুষ সনাতনকে ঘিরে রেখে থানায় খবর পাঠান। পুলিশ গিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

বুদবুদ থানার ও সি শেখ নজরুল বলেন, জেরায় সনাতন নিজের দোষ কবুল করেছে। পুলিশি সূত্রের খবর, সনাতন বলেছে, গোরার বাড়িতে হাতেনাতে ধরা পড়ার পর সেখানে গ্রামের অনেকের সামনে তাকে মারধর করা হয়। তারপর থেকে গ্রামের লোকজন তাকে দেখলেই নানা কথা বলত। তাতে সে এতটাই অপমানিত হয় যে, তখনই গোরাকে খুন করার ছক কষে। রাত ১০টা নাগাদ মাঠের কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে শরণপুকুরের পাড়ে সে গোরাকে ভোজালির কোপ মারে। কিন্তু গোরার রক্ত যে তার জামায় ছিটকে পড়েছে, অন্ধকারে তা বুঝতে পারেনি, আক্ষেপ সনাতনের।

ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় বৃদ্ধ খুন জামবনীতে

ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় জামবনী থানার চিয়াপাড়া গ্রামে এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। তার নাম তিমির ঘোষ (৬০)। সোমবার গভীর রাতে ঘটনা ঘটার পর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা রয়েছে।

গ্রামবাসীদের আশঙ্কা, যে কোনও সময় বড় ধরণের সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ জানিয়েছে, চিয়াপাড়ার পাশের গ্রাম কোঁকড়াতে সরস্বতী পুজো হয়। সোমবার কোঁকড়োর বাসিন্দারা শোভাযাত্রা করে সরস্বতী পুজোর ভাসানে বেরিয়েছিলেন। শোভাযাত্রায় গ্রামের নারী পুরুষ সকলেই অংশ নিয়েছিলেন।

শোভাযাত্রা যখন চিয়াপাড়ার স্কুল মাঠের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় চিয়াপাড়ার কয়েকজন যুবক স্কুল মাঠে চড়ুইভাতি করছিল। শোভাযাত্রার মহিলাদের দেখে তারা অশ্লীল মন্তব্য করে বলে অভিযোগ। এমনকি টম্যাটো আলু প্রভৃতি ছুরে মারে। এই সময় তারা কিছু না বলে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে গ্রামে ফিরে যান। তারপর গ্রামের সকলের সঙ্গে আলোচনা করে রাতেই কোঁকড়োর কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি চিয়াপাড়ার বয়স্কদের এ কথা জানানোর জন্য আসেন।

তারা গ্রামে ঢোকার পরেই লাঠিসোটা নিয়ে কয়েকজন যুবক তাদের ঘিরে ফেলে। তারপর মারতে থাকে। অন্যরা পালিয়ে গেলেও তিমিরবাবু পালাতে পারেননি। লাঠির আঘাতে সেখানেই তার মৃত্যু হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

গ্রামবাসীরা এই ঘটনার কথা পুলিশকে জানালে মঙ্গলবার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে। এই ঘটনায় পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

দু'টি গ্রামেই এখনও চরম উত্তেজনা রয়েছে। যে কোনও সময় সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে বলে গ্রামবাসীদের আশঙ্কা। যাতে এ ধরণের ঘটনা না ঘটে সে জন্য এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

ইভ টিজারদের ছুরিতে জখম ২

দিনদুপুরে বর্ধমান শহরের বুকে ইভটিজারদের ছুরিতে আহত হলেন এক কিশোরীর দুই আত্মীয়। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার বর্ধমানের তেলিপুকুরে। পুলিশ জানায়, ওই এলাকারই বাসিন্দা এক কিশোরীকে দীর্ঘদিন ধরেই বিরক্ত করছিল শেখ ইসলাম ও শেখ উজ্জ্বল। এই নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে এ দিন দুপুরে ওই কিশোরীর দাদা সুরজ পাসোয়ান ও মামা নরেশ দুই যুবকের কাছে যায়। সেখানেই তাদের ছুরি মারা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সুরজকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। নরেশকে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। এলাকার মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযুক্ত দুই যুবককে বেদম প্রহার করে।

স্কুলের পথে ছাত্রী অপহৃত বিষ্ণুপুরে

স্কুলে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময়ে অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রী অপহৃতা হয়েছে। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বিষ্ণুপুরের ভালুকখুলা গ্রামে। পুলিশ জানায়, ছাত্রীটির নাম মাধবী লোহার। রাত পর্যন্ত অপহরণকারীদের খোঁজ মেলেনি।

বিষ্ণুপুরের কুসুমবনি যমুনাদাস খেমকা হাইস্কুলের ছাত্রী মাধবী। অন্য দিনের মতো এ-দিনও সকালে সে তার বোন মামণিকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছিল। মামণি ওই স্কুলেরই ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। পুলিশ জানায়, সকাল ৭টা নাগাদ স্কুল থেকে পাঁচশো গজ দূরে দুই দুষ্কৃতী মাধবীকে জোর করে সাইকেল রিক্সায় তুলে নেয়। ঘটনার আকস্মিকতায় মামণি হতভম্ব হয়ে যায়। সেই সুযোগে দুষ্কৃতীরা মাধবীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের অনুমান, ওই রিকশাচালক দুষ্কৃতিদলে রয়েছে। তবে শুক্রবার রাত পর্যন্ত পুলিশ অপহরণের কিনারা করতে পারেনি।

দিদিকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মামণির সম্বিত ফিরে আসে। সে রাস্তার ধারের একটি বুথ থেকে বাড়িতে টেলিফোন করলে হইচই শুরু হয়ে যায়। বাড়ির লোক ও প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। ইতিমধ্যে খবর পৌঁছয় কুসুমবনি যমুনাদাস খেমকা হাইস্কুলে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সেখানে চলে আসেন। সাতসকালে অপহরণের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ওই হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তপন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "মামণি প্রথমে স্কুলে টেলিফোন করে জানালে ভাল হত। তা হলে আমরা ছাত্র-শিক্ষকেরা ধাওয়া করে দুষ্কৃতীদের ধরে ফেলতে পারতাম।" মাধবীর বাবা পরমেশ্বর লোহার বলেন, "আমার দুই মেয়ে শান্ত ও লাজুক প্রকৃতির। কারও সঙ্গে মেলামেশা করতে বা কথা বলতে চাইত না। তবে, দু'জনেই

পড়াশোনায় খুব ভাল।"

এ দিন দুপুরে মাধবীদের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, তার মা ও দিদা কাঁদছেন। স্কুলের পোশাক তখনও ছাড়েনি মামণি। সে বলে, "ওরা সংখ্যায় দু'জন ছিল। দিদির মুখে কাপড় বেঁধে ওরা রিকশায় তুলে নিয়ে পালিয়েছে।" অপহৃতার মা বিলাসী লোহারের অভিযোগ, "স্কুলে যাওয়া-আসার পথে রাস্তার ধারের রাইস মিলের কয়েকজন শ্রমিক ওদের বিরক্ত করত।" দিনের আলোয় রাস্তা থেকে স্কুলের পোষাক পরা একটি মেয়েকে অপহরণ করার মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ অভিযোগ নিতে চায়নি। এই নিয়ে ওই এলাকার মানুষ দুপুর পর্যন্ত থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান। পরমেশ্বর বাবুর অভিযোগ, "পুলিশ অপহরণের মামলা না করে 'মিসিং ডায়েরি' করার পরামর্শ দিয়েছে।" স্থানীয় বাসিন্দা যোগেন দাসের প্রশ্ন, "রাস্তা থেকে মুখ বেঁধে একটি মেয়েকে জোর করে তুলে নিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা। আমরা এ ক্ষেত্রে ওই মেয়ে নিয়ে নিখোঁজ বলব কেন?"

অন্য দিকে, ঘটনার ন'ঘন্টা পর, দুপুর ৩টে পর্যন্ত অপহরণের কথা জানতেন না জেলার পুলিশ সুপার নীরজকুমার সিংহ। বিকেল ৪টে নাগাদ তিনি বলেন, "এস ডি পি ও অফিসের কাজে সোনামুখীতে গিয়েছেন। আমি খোঁজ নিচ্ছি।" সন্ধ্যার পরে পুলিশ সুপার জানান, ওই ঘটনায় অপহরণের মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

সি পি এমের রিগিং বাহিনী

ভোটের রিগিং-এর কাজে ব্যবহার থেকে শুরু করে নিজদলের নানা অসাধু উদ্দেশ্য চারিতার্থ করার জন্য পুলিশকে ব্যবহার সেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আমল থেকেই চলে আসছে। তাই পুলিশ আজ এতখানি উচ্ছৃঙ্খল ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আসলে বিগত ১৫-২০ বছর ধরে পুলিশের নীচু মহলে যাদের চাকরি দেওয়া হয়েছে তাদের বেশিরভাগই সি পি এমের সক্রিয় সমর্থক অথবা ক্যাডার। গ্রাম গঞ্জ থেকে আসা এইসব ছেলেরা পুলিশের চাকরি নিয়ে শহরে এসে কী ভীষণ বেপরোয়া ও অসংযমী হয়ে উঠেছে তার খবর পুলিশের বড় কর্তারা রাখেন না এবং রাখার চেষ্টাও করেন না। মাননীয় সৎ, সংবেদনশীল উন্নয়নকামী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যকে পুলিশের বড় কর্তারা যা রিপোর্ট দেয় তিনি তাই বিশ্বাস করেন। আমি বিগত *দুর্গাপূজার সপ্তমীর সন্ধ্যাবেলায় মধ্য কলকাতার একটি নামীদামি পূজো প্যান্ডেলের কাছে দুজন* অল্পবয়সী আর্মড পুলিশকে দেখেছি একজোড়া প্রেমিক প্রেমিকাকে বিশ্রী ভাষায় মন্তব্য ছুড়ে দিতে। তাদের দোষ ছেলেটি তার প্রেমিকার কাঁধের ওপর আলতো করে হাত রেখে রাস্তা দিয়ে প্যান্ডেলের দিকে যাচ্ছিল। যেহেতু পুলিশ বিশ্রী মন্তব্যটি করেছে তাই ছেলেটি অত লোকের মাঝেও প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। সেই দিন কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসে অভিজিৎ ব্যানার্জীর সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। কথা প্রসঙ্গে বললেন :

আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার পুলিশকে আবেদন করেছেন জনগণের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য। অতীতে এর জন্য ফুটবলে লাথি মেরে খেলারও উদ্বোধন করেছেন। সে ছবি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খবরের কাগছে দেখেছেন। কিন্তু পুলিশ বেপরোয়া এবং উচ্ছৃঙ্খলই রয়ে গেছে। অবস্থার উন্নতি যে এতটুকুও হয় নি তা সাম্প্রতিক ঘটনাই বলে দিচ্ছে। অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে সরকারের প্রধান মাননীয় বুদ্ধদেববাবুকে এ-প্রসঙ্গে সমাজের একজন সাধারণ হ্যাভনট মানুষ

হিসাবে জানাচ্ছি যে, প্রত্যেকদিন ইস্কুলের বাচ্চা, অফিসফেরত সাধারণ মানুষ ও মহিলারা পুলিশের কী রূপ মধ্য কলকাতায় দেখে থাকেন।

দৃশ্য এক : সকাল সাতটা থেকে আটটা। স্থান বউবাজার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার মোড়। দু'জন পুলিশ কনস্টেবল।

কোলে মার্কেটের দিক থেকে আসা ভিন রাজ্য থেকে মাছ নিয়ে বড় লরিগুলি মাছ খালি করে রাজা রামমোহন সরণিতে ঢোকার মুখেই পুলিশ কনস্টেবলদের হাতে পাঁচ টাকার কয়েন দিচ্ছে আর মানিকতলার দিকে চলে যাচ্ছে। কোনও লরির খালাসি দু'পয়সা কম দিলেই পুলিশ কনস্টেবল দু'জন নানা রকম গালাগাল দিচ্ছে।

দৃশ্য দুই : সকাল ন'টা থেকে দশটা কোলে মার্কেটের সামনে যেসব সবজি আনাজের ম্যাটাডোর ভ্যানগুলো আছে একজন লাঠি হাতে পুলিশ প্রায় শিয়ালদহ ষ্টেশনের ভিখারীর মতন হাত পেতে বিভিন্ন টেম্পো ভ্যান ইত্যাদির থেকে পয়সা নিচ্ছে (রাতের হিসেব আলাদা)। আমাদের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অবশ্য অনেক আগেই পুলিশে এই লরি থেকে পয়সা আদায়কে বৈধতা দিয়ে গেছেন। তার মন্তব্য ছিল পুলিশ ঘুষ নেবে এতে অবাক হবার কী আছে, আব সেই ছবি খবরের কাগছে ছাপিয়েই বা কী লাভ।

দৃশ্য তিন : সন্ধ্যা সবে লেগেছে, স্থান বৈঠকখানা বাজার এবং বউবাজারের বিভিন্ন চোলাই এবং বাংলা মদের লুকনো ঠেক। লালবাজারের সাদা পোশাকের সিভিল ড্রেসে দুজন পুলিশ মোটাসোটা মালিকের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য বুঝে নিচ্ছে, টাকা কিছু কম হলেই পুলিশের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে বিভিন্ন ধরণের সংবেদনশীল সংলাপ।

দৃশ্য চার : সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে আটটা। বউবাজারের রাস্তা ধরে একটি পুলিশ ভ্যান গিয়ে একটি বিশেষ গলির সামনে দাঁড়াল, ভ্যান থেকে জনা চার পাঁচেক সিভিল ড্রেসের পুলিশ বেশ গুন্ডা গুন্ডা চেহারা, তাদের দু'এক জনের মুখে একটু আধটু মদের গন্ধ। পায়ে হেঁটে তারা প্রবেশ করল কলকাতার অন্যতম নিষিদ্ধপল্লীর ভিতরে।

এরও মিনিট দশের পরে ড্রাইভার একা পুলিশের ভ্যানটিকে নিয়ে প্রবেশ কবল ওই একই জায়গার ভিতরে। তারপর হাবাগোবা গোছের কিছু লোক এবং কিছু যুবককে কলার ধরে চড় মারতে মারতে ওই পুলিশের দল প্রায় জনা পঁচিশ তিরিশ জনকে ভ্যানে তুলে নিয়ে গিয়ে থানায় গেল। সই করতে জানা সত্ত্বেও টিপ ছাপ দিয়ে পেটি কেস বাবদ কিছু টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করবার বন্দোবস্ত হল। আর বাকি টাকা এক রকম কেড়ে নিয়ে ধমকে রাস্তায় বার করে দেওয়া হল। সংবেদনশীলভাবে।

এইসব কাহিনী প্রত্যেকদিন এখানে বসবাস করা মানুষেরা দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন এবং চোখ সয়ে গেছে। এলাকার বিভিন্ন রঙের রাজনৈতিক ছোড়দা, বড়দা, মেজদারা যে জানেন না তা নয়। কিন্তু ভদ্রলোকের চুক্তি আছে, যে তোমরা তোমাদের মতো পয়সা খাও, আমরা আমাদের মত খাই। তাই এসব নিয়ে আন্দোলন ইত্যাদি নৈব নৈব চ। তাই শিয়ালদহ ফ্লাইওভারের তলায় প্রত্যেক সন্ধ্যাতেই যৌন কর্মীরা খদ্দেরদের হাত ধরে টানাটানি করে।

গুণ্ডাগোছের কিছু বেআইনি হকার শহরে আসা বোকা গ্রাম্য মানুষকে পেলেই গায়ের জোরে বাজে মাল দিয়ে বেশি টাকা জোর করে কেড়ে নেয়। এই সবই চলে পুলিশের চোখের

সামনে। পুলিশ দেখেও দেখে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে যেখানে বাস করেন তারই কিছুটা দূরে পাকিস্তান বাজার, লোহাপুল, তিলজলা রোড। সেখান দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর নিম্নবিত্ত মেয়ে নান কাজে যাতায়াত করে পার্কসার্কাস ষ্টেশন থেকে নেমে পায়ে হেঁটে। কিছু লোক এদের দিকে রোজ নানা রকম কুৎসিৎ মন্তব্য ছুঁড়ে দেয় অথবা শরীরে আঘাত করে। শহরতলি থেকে আমাদের ঘরে আসা চাঁপা, চম্পা, শ্যামলীরা প্রতিদিন এই রাস্তায় ইভটিজিং-এর শিকার হয়। আর চার নম্বর পুলের ওপর দিয়ে ভি.আই.পি.-রা হুটার বাজিয়ে রাইটার্স, সল্টলেকে যাতায়াত করেন কিন্তু ব্রিজের নীচের অংশ দিয়ে যাতায়াত করা মেয়েদের নির্যাতনের এই কাহিনী তাদের কাছে অজানা থেকে যায়। এসব জানতে গেলে কাউকে ফেলুদা বা ব্যোমকেশ হতে হয় না, সাধারণভাবে মাটিতে পা রেখে যাতায়াত করলেই এইসব দেখা যায়।

বাপি সেন মারা গেছেন, তাই অনেকেই এখন বলছেন দষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে কিন্তু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিটা যে কি সেটা কেউই জানেন না। ধরা যাক মহামান্য বিচারপতি এদের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিলেন, কিন্তু পুলিশের লোক জেলখানায় গিয়ে কতটা জামাই আদবে থাকে সেটা অনেকেরই জানা নেই। কেননা সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিরা কেমনভাবে দিন কাটাচ্ছে সে কথা কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশ হয় না বা কোনও টিভি চ্যানেল এসব দেখায় না। হয়তো দেখা যাবে সাজা পাওয়ার এক বছরের মধ্যেই জেলকর্মীদের প্রত্যক্ষ মদতে ও হিন্দ সিনেমাতে এসে সিনেমা দেখছে। জেলখানার কর্মী আর পুলিশ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে এরা হল চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

তারই মাঝে মধ্যে বাপি সেন বনাম পুলিশ জাতীয় কিছু মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলে একটু চেঁচামেচি হবে, তারপর কলকাতা ফিরে যাবে কলকাতাতেই। আর খবরের কাগজে সত্য কথা প্রকাশ হলেই এ-রাজ্যের প্রশাসন 'মেহের আলি'-রা চিৎকার করে উঠবেন 'সব ঝুট হ্যায়' বলে। আর সব কিছু চুপচাপ হয়ে গেলে একটু মুচকি হেসে পুলিশ বলবে, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।'

অভিজিৎ ব্যানার্জীর সঙ্গে গলা মেলালেন নাকতলা লেনের বিমান ঘটক।

পুলিশ পুলিশকে ধরে পিটিয়েছে এমন কথা শুনলে ভুল করেও কিন্তু কেউ বলবেন না গল্প কথা। বিশ্বে কিংবা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এরকম ঘটনা গল্প হলেও আমাদের শান্তির বাংলায় কিন্তু তা গল্প হলেও সত্যি। একবার নয় এরকম ঘটনা রাজনৈতিক সচেতন রাজ্যে ঘটেছে একাধিকবার।

একবার এক পুলিশ সার্জেন্টের গাড়ি থামানোর দায়ে মার খেতে হয়েছিল এক ট্রাফিক পুলিশকে। আর সম্প্রতি পাঁচ অমানুষ পুলিশ কনস্টেবলের ইভটিজিং-এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে মারাত্মক গুরুতরভাবে জখম হয়ে হাসপাতালে মারা গেলেন এক বিবেকবান পুলিশ সার্জেন্ট বাপী সেন।

আসলে সমাজের বুকে যখন অবক্ষয় নামে, তার রূপরেখা এইভাবেই তৈরি হয়। রক্ষকেরা যখন ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখনই শোনা যায় দুঃশাসনের অট্টহাসি। কেন না এখন আর এই রাজ্যে পুলিশের উদ্দেশ্যে বলা যায় না যে — পুলিশ তুমি যতই মারো মাইনে তোমার একশো বারো। নানা পথে ফুলে ফেঁপে তারা আজ জয়ঢাক হয়ে গেছেন, নিজেদের সমাজের মাতব্বর ভাবছেন। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে, আর আছে বলেই এই ধরণের ঘটনা ঘটছে। কিছু

মানুষ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিবাদ করছেন, সমাজ টিকে রয়েছে তাতেই। তাঁরা তো নমস্য।

বর্তমানে এক দল পুলিশ কারণে অকারণে যখন তখন সাধারণ মানুষদের টিজিং করেন, আর তা আমাদের এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে। আবার এর উপর তারা শুরু করেছেন প্রকাশ্যে ইভটিজিং। কিন্তু এরপর বাংলার সচেতন মানুষ যদি আইনকে নিজের হাতে তুলে নিয়ে ওইসব পুলিশ কর্মীদের উপর আদম্ টিজিং শুরু করেন তা সামাল দিতে পারবেন তো আমাদের রাজ্যের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী?

পুলিশ এক সময় মারত দোষীদের, এরপর সাধারণ মানুষকে আর এখন কর্তব্যনিষ্ঠ পুলিশদের। এরকম উল্টাপ্রবাণের কথা কি কখন শুনেছেন কেউ? আর এইভাবে অকুতোভয় ফুলে ফেঁপে ওঠা ওইসব দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশের দল যদি হঠাৎই হাত তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রীদের গায়ে তখন কী হবে?

হয়তো আমাদের দূরদর্শী মুখ্যমন্ত্রী এই সহজ কথাটি চিন্তা করেই তড়িঘড়ি সাম্প্রতিক এই পুলিশ নিধনে অভিযুক্ত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেছেন।

তবে এই 'দৃষ্টান্তমূলক' কথাটিতে আমার আপত্তি রয়েছে। কেন না ইতিপূর্বে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যতবারই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা বলেছেন ততবারই দেখা গেছে দোষীরা বহাল তবিয়েত জামিন পেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

আসলে জঘন্য অপরাধ করলে অপরাধীর কঠিন শাস্তি হবে সেটাই তো স্বাভাবিক। তাই এক্ষেত্রে 'দৃষ্টান্তমূলক' বলতে কি তিনি তবে অন্য কিছু বুঝিয়েছেন? তাই স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওই দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশের বিশাল দলকে নিজের আনুগত্যে রাখার জন্য 'দৃষ্টান্তমূলক' বলতে যে ঠিক কি ধরণের শাস্তি বোঝাতে চেয়েছেন তার সহজসরল ব্যাখ্যা যদি তিনি দেন তবে বাধিত হব।

পাপ ও পারা কেউই হজম করে ফেলতে পারে না, সি পি এম নেতারাও পারবেন না

কথায় আছে, পাপ এবং পারা কেউই হজম করে ফেলতে পারে না। আমাদের মহাশক্তিমান ও মহাকৌশলী সি পি এম নেতারাও নানা কৌশল করে এবং পুলিশ প্রশাসনকে সর্বশক্তি সহ আসরে নামিয়েও সব পাপ কিছুতেই হজম করে ফেলতে পারছেন না।

তারা বহু বিরোধী নেতাকে পকেটে পুরে ফেলেছেন। কিছু বিশিষ্ট বিরোধী নেতা-নেত্রীর নির্বুদ্ধিতার সুযোগও সর্বতোভাবে নিচ্ছেন। তাদের বিপথে চালিত করার জন্য আশপাশে প্রচুর ফেউ লাগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু, তবু সব দিক কিছুতেই সামলাতে পারছেন না। মাঝে মধ্যে এক একটা ঘটনায় হঠাৎ হঠাৎ করে তাঁদের মহাপাপের ছবি মারাত্মকভাবে ফুটে উঠেছে।

যেমন, এবার নদীয়ার ডাকাতির ঘটনায় সি পি এম-এর মহাপাপ ধরা পড়ে গেল। পুলিশের লোকেরাই এখন বলতে বাধ্য হচ্ছে এটা নিছক ডাকাতির ঘটনা নয়। এর সঙ্গে পার্টির মারামারি, কামড়াকামড়ি, রেষারেষিও অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। একজন ক্ষমতাচ্যুত আঞ্চলিক সি পি এম নেতা তারই এলাকার আর এক সি পি এম নেতার নববিবাহিত কন্যা ও জামাতাকে খতম করার জন্য এই ডাকাতির প্ল্যান করেছিলেন। তিনিই ডাকাতদলকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে ঘাপটি মেরেছিলেন। তবে তার দুর্ভাগ্য সি পি এম নেতার নববিবাহিত কন্যা ও জামাতা পূর্ব কর্মসূচী মতো

ওই পথে আর আসেননি। তারা হঠাৎ যাত্রা বাতিল করে দেন। তবে, তার জন্য যে প্রতিহিংসাপরায়ণ সি পি এম নেতা শুধু হাতে ফিরে গেছেন তেমন নয়। ওই রাস্তা দিয়ে আসা সব গাড়ির ওপর তিনি ও তার ডাকাতদল ওই রাতে চড়াও হয়েছে। এমনকি, প্রতিদ্বন্দ্বী সি পি এম নেতার বিয়েবাড়িতে যে বরযাত্রীরা এসেছিলেন তারাও রেহাই পাননি। তাদের বাস থামিয়েও লুটপাট করা হয়েছে। ওই বাসের মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়েও পাশের মাদ্রাসায় ধর্ষণ করা হয়েছে। গাড়ির ড্রাইভার হামলাবাজ ও ডাকাতদের চিনে ফেলার জন্য তারও প্রাণ নিয়েছে ওরা।

ওই বাস নিয়ে বেরোবার আগে ড্রাইভারকে সবাই বলেছিলেন, ওই রাতে ওই পথ দিয়ে না যাওয়াই ভাল, কারণ নানা বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু, ওই বাস ড্রাইভারও একজন সি পি এম কর্মী। তিনি নাকি অভয় দিয়ে বলেছিলেন, আমি এলাকার সবাইকে চিনি। আমার বাসে কেউ ডাকাতি করতে আসবে না। সত্যিই তো, যে রাস্তায় প্রধানত সি পি এম-এর লোকেরাই ডাকাতি করে, আর এক জন আঞ্চলিক সুপরিচিত সি পি এম কর্মী কেন সেই রাস্তাকে ভয় পাবেন। তিনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন, পার্টি আশ্রিত ডাকাতরা তার বাস আটকাবে না। তাকে দেখে সরে যাবে। কিন্তু, ওই ডাকাতরা যে সেদিন সি পি এমেরই একজন নেতাব নববিবাহিত কন্যা ও জামাতাকে খতম করার জন্য ওত পেতে ছিল, সম্ভবত বাস ড্রাইভার সি পি এম কর্মী তা জানতেনই না। ডাকাতরা সবাই মুখে কালো কাপড় বেঁধে ছিল। তা সত্ত্বেও সেই ড্রাইভার তাদের একজনকে চিনে ফেলেছিলেন। এবং, হঠাৎ নাকি তাদের একজনকে দেখে বলেছিলেন, "কি রে তোরা? এ কী করছিস?" সেই চিনে ফেলার খেসারত তাকে প্রাণ দিয়ে দিতে হলো।

এই ড্রাইভারের বক্তব্য শুনলে কারোরই বুঝতে অসুবিধা হওয়া উচিৎ নয়, আঞ্চলিক সি পি এম কর্মীরা সবাই জানেন, কারা ওই এলাকায় ডাকাতি করে। এই পরিস্থিতি যে শুধু নদীয়ায় তা নয়। গোটা রাজ্যেরই হাল আজ এই রকম। বিভিন্ন জেলায় যারা ডাকাতি করে আজ তারা অধিকাংশই সি পি এম-এর লোক। এবং তারা সি পি এম-এর মদতপুষ্ট বলেই নির্ভয়ে ডাকাতি করে। পুলিশও তাদের কিছু বলতে সাহস পায় না। গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আজ এত ডাকাতি কারা করে, এই ঘটনার মধ্যে দিয়েই কি তা পরিষ্কার নয়? পাপ এবং পারা কখনও চাপা দেওয়া যায় না! সি পি এম-এর মহা-শক্তিমান এবং মহা-কৌশলী নেতারাও তাদের পার আর চাপা দিতে পারছেন না!

এই ঘটনায় আরও বোঝা গেল, সি পি এমের ভেতরের অবস্থা আজ কত সঙ্গীন, কত ভয়াবহ। এক গোষ্ঠী আর গোষ্ঠীর নেতার নববিবাহিত কন্যা ও জামাতাকে খুন করার জন্য ডাকাত নিয়ে রাস্তায় নামে। এই বিশেষ ডাকাতির ব্যাপারটা নিয়ে যদি এত হল্লা না হত তাহলে হয়তো রাজ্যের মানুষ জানতেই পারত না, সি পি এম-এর ভেতরে গোষ্ঠী লড়াই আজ কোন পর্যায়ে পৌঁছছে!

বিভিন্ন জেলায় আজ যে সি পি এম নেতা এবং কর্মীরা খুন হচ্ছেন তার অধিকাংশই দলের ভিতরের ঝগড়াঝাঁটির জন্য। এর বহু ক্ষেত্রেই অবশ্য পার্টির কর্তারা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ওপর দোষ চাপাচ্ছেন। কিন্তু, পুলিশের অফিসাররা একান্ত আলোচনায় অনেকেই আজ স্বীকার করেন, রাজ্যে এখন যত সি পি এম কর্মী এবং নেতা খুন হচ্ছেন তার অধিকাংশই পার্টির ভেতরে ঝগড়াঝাঁটির জন্য।

এখন কোন জেলায় সি পি এম-এর ঝগড়াঝাঁটি নেই? প্রত্যেকটা এলাকার মানুষ আজ

জানে, লুটের ভাগ নিয়ে, টাকাপয়সা নিয়ে, কামাই নিয়ে প্রায় সর্বত্র সি পি এম-এর ভিতরে চূড়ান্ত মারামারি, খুনোখুনি চলছে। উত্তর ২৪ পরগণার ভেড়ি এলাকাগুলিতে এবং সীমান্ত এলাকার স্মাগলিং নিয়ে যে খুনোখুনি চলছে তাও যেমন সি পি এম-এরই ঝগড়াঝাঁটির প্রতিফলন, তেমন দক্ষিণ ২৪ পরগণায় গত কয়েক বছর ধরে বেশ কিছু সি পি এম নেতা ও কর্মী খুন হয়েছেন তাও ভেড়ি, স্মাগলিং এবং নানা জমিবাড়ির ব্যবসার কামাইয়ের বিরোধে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বেশ কিছু নেতা ও কর্মী গত দেড়-দু'বছরে পার্টি থেকে বেরিয়ে যেতেই বাধ্য হয়েছেন। তাদের মূল অভিযোগ ছিল, পুলিশ সব সময় তাদের প্রতিপক্ষকেই মদত দিচ্ছে। তাদের প্রতিপক্ষের খুনি, মস্তানরা তাদের গোষ্ঠীর লোকদের খুন করলেও পুলিশ এবং প্রশাসন কিছুই বলছে না। ক্যানিংয়ে বেশ কিছু দিন আগে একজন নামজাদা সি পি এম নেতার ছেলে খুন হয়েছিলেন। পুলিশই পরে বলেছে, তাকে খুন করেছিল পার্টিরই পাল্টা পক্ষের লোকজন।

এই সব খুনোখুনির পিছনেই রয়েছে বখরার ঝগড়া। কোথাও স্মাগলিংয়ের বখরা, কোথাও ভেড়ি লুটের বখরা, কোথাও বা স্রেফ জমি-বাড়ি কেনাবেচার টাকাপয়সা নিয়ে বিরোধ। বেহালা-ঠাকুরপুকুর এলাকায় যে খুনোখুনি চলছে তাও মূলত সি পি এম-এর গোষ্ঠীদ্বন্দের কারণে। প্রত্যেক জেলা, প্রত্যেক মহকুমা, প্রত্যেক থানায় সি পি এম ভাগ হয়ে গিয়েছে। এক একটা গোষ্ঠীর এক একজন নেতা। এরা প্রত্যেকেই কামাচ্ছে, বানাচ্ছে। এদের প্রত্যেকেরই শক্তির উৎস বামফ্রন্ট সরকার এবং পার্টি। আর, কে কত কামাল, কে কত সরকারি সমর্থন পেল তা-ই নিয়েই খুনোখুনি, মারামারি।

নানা অসৎ পথে সি পি এম-এর নীচের স্তরের নেতারাও বামফ্রন্ট রাজত্বে কী ধরণের টাকা বানিয়েছেন তা বরানগর-সিঁথি মামলাতেই পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে। এলাকার অন্যান্য গোষ্ঠীর নেতারা সবাই মিলে ওখানে এক দাপুটে আঞ্চলিক নেতাকে জেলে ঢোকাবার ব্যবস্থা করেছেন। তার বিরুদ্ধে এখন মামলাও চলছে। সে তেমন কোন বড় দরের নেতা নয়! তবু, দেখা গিয়েছে তার নামে এলাকার একটা ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট রয়েছে দু'কোটি টাকা! আর, তারই পরিচালিত একটা ক্লাবের অ্যাকাউন্টে ওই এলাকারই একটা ব্যাঙ্কে রয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা!

সিঁথি-বরানগর এলাকায় একটা বড় কাগজ কল ছিল। প্রাক্তন এক কংগ্রেস নেতা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী একদা সেই কাগজ কলের মালিক ছিলেন। দীর্ঘ দিন সেই কাগজ কল বন্ধ ছিল। জমির মালিকরা পরে সেই জমিটা বেচে দিয়েছেন। ওই জমিতে এখন বিশাল হাউসিং এস্টেট তৈরী হচ্ছে। এলাকার সবাই জানে, বরানগর-সিঁথি এলাকার ওই প্রজেক্টের সর্বময় কর্তা একজন সি পি এম নেতা। জমি কেনাবেচার সময় তিনি মোটা টাকা নিয়েছেন প্রমোটার এবং মালিক দুয়ের কাছ থেকেই। ওখানে এখন যাঁরা ঠিকাদারি করছেন তাঁদের কাছ থেকেও তিনি টাকা নিচ্ছেন। ওখানে যারা ইট, চুন, বালি সাপ্লাই করছে তাদেরও সবাইকে বাছাই করে দিচ্ছেন ওই সি পি এম নেতা!

এই হল আজকের সি পি এম! প্রত্যেক জেলায় দুলাল, লক্ষ্মণ, পচু, অমিতাভতে পার্টি বোঝাই। এরা সর্বত্র বিরাজমান। এরাই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কোথাও এরা লক্ষ্মণ, কোথাও এরা দুলাল, কোথাও এরা পিন্টু, আবার কোথাও এরা সুশান্ত নামে পরিচিত। কিন্তু, নামে 'সুশান্ত' হলেও কাজে এরা কেউই শান্ত প্রকৃতির মানুষ নয়। এদের গায়ে পার্টির ছাপ আছে ঠিকই। কারণ, সেইটাই শক্তির উৎস। আসলে কিন্তু এরা সবাই তোলাবাজ এবং ডাকাতবাহিনীর নেতা। জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, থানায় থানায় এরা অনেকেই বড় বড় ডাকাতদল, মস্তানবাহিনী

চালায়। তাদের জন্য পুলিশ প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করে দেয়। আর তাদের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা নেয় এবং এদের জোরেই সি পি এম গত ২৫ বছর ধরে প্রত্যেকটি নির্বাচনে 'বিপুল ভোটে' জিতছে। এরাই সি পি এম-এর ছাপ্পা ভোটের অভিযানের মেরুদন্ড।

পার্টির সব নেতাই ডাকাত পোষেণ, এমন কথা অবশ্য আমি বলছি না। পার্টির সব নেতা প্রতক্ষ্যভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে ডাকাতদের, মাফিয়াদের, তোলাবাজদের প্রশ্রয় দেন, তাও আমি বলছি না। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে এও সত্য যে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, অনিল বিশ্বাস থেকে আরম্ভ করে পার্টির রাজ্য কমিটির সাধারণতম সদস্যও জানেন, কাদের জোরে পার্টি আজ পর পর সব নির্বাচনে 'বিপুল ভোটে' জিতছে। সে জন্যই এরা সবাই চুপ করে থাকেন। এই ডাকাত পোষা নেতাদের, তোলাবাজির কর্তাদের কিছু বলেন না। কারণ, নির্বাচনের সময় এরাই বাহিনী নিয়ে রিগিং অভিযান পরিচালনা করেন।

গতবারের ভোটের বেশ কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব নিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জেলায় জেলায় গিয়ে অফিসারদের বলে এসেছিলেন ঃ "কাউকে ভয় পাবেন না। নির্ভয়ে কাজ করুন। কার কে রাজনৈতিক মুরুব্বি তা দেখবেন না। অপরাধীর কোন রাজনৈতিক রং নেই। অপরাধীদের ধরতেই হবে।" নির্বাচন যত এগিয়ে এল ততই দেখা গেল, সেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঢোঁড়া সাপে পরিণত হয়েছেন। তিনিই আর অফিসারদের নির্ভীকভাবে অপরাধী ধরার কথা বলছেন না!

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলির বিস্তৃত অঞ্চলে ভোটে জেতার জন্য বুদ্ধদেববাবুর রাজত্বেই নদীয়ার ঘটনার মতো বহু ঘটনা ঘটেছে। শুধু বাস থামিয়ে নয়, পার্টির মদতপুষ্ট ডাকাতরা দলবদ্ধভাবে শত শত বাড়িতে গিয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত লুণ্ঠন, জুলুম এবং পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। অসংখ্য মহিলার সম্ভ্রম হরণ করেছে। পার্টির মদতপুষ্ট বিশাল বিশাল ডাকাতবাহিনী পুলিশ ক্যাম্পের পাশে তাদের ক্যাম্প বানিয়েছে। শত শত মোটরসাইকেল, রাইফেল, দোনলা বন্দুক জোগাড় করে গ্রামের পর গ্রাম হানা দিয়েছে। সি পি এম বিরোধী প্রত্যেক পুরুষকে, মহিলাকে চরম শাস্তি দিয়েছে। আর প্রশাসন চুপচাপ সব কিছু দেখে গিয়েছে। রাইটার্স বিল্ডিং থেকেই নির্দেশ ছিল ঃ কেউ এই ডাকাত এবং দাঙ্গাবাজদের গায়ে হাত দেবে না। কেউ এদের বাধা দেবে না।

ভোটের সময় যে ডাকাতরা, যে আঞ্চলিক নেতারা পার্টিকে নানাভাবে মদত দিয়েছে, ভোট হয়ে গেলেই তারা কণ্ঠির মালা জপবে, তা তো হতে পারে না। বাধ্য হয়েই পার্টিকে সেই সব ডাকাত ও মস্তানকে করেকম্মে খাওয়ার সুযোগ করে দিতে হচ্ছে। তারা যতই ডাকাতি করুক, পুলিশ তাদের গায়ে আজ হাত দিতে পারে না। তারা যতই সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার চালাক, প্রশাসন তাদের কিছু বলতে পারে না। কারণ, পার্টিকে এরাই ভোটে জেতায়। পার্টি এদের লাঠির জোরে, গায়ের জোরে, মস্তানির জোরেই প্রতিবার 'বিপুল ভোটে' জিতে আসে!

আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের মার্কসবাদী এবং সংস্কৃতিমান কর্তারা সবাই প্রত্যক্ষভাবে দুলাল-লক্ষ্মণ-সুশান্তদের ঘনিষ্ঠ না হলেও দুলাল-লক্ষ্মণ-ঘন্টে-কানা-ইলামরা সবাই এদেরই মদতে সর্বশক্তিমান।

নদীয়ার এই ডাকাতির ঘটনার পর পার্টির নেতারা এবং রাইটার্সের কর্তারা বারবার বলছেন ঃ কারও রাজনৈতিক রং দেখা হবে না। দোষীদের সাজা দেওয়া হবেই। হয়তো কোন বাগচি, কোনও এনায়েৎ, বা কোনও কর্মকার এই ঘটনার জন্য শাস্তি পাবে। কিন্তু, পার্টির কর্তারা প্রাণপণে চাপার চেষ্টা করবেনই যে, এই ডাকাতির সঙ্গে, এই বীভৎস পাশবিক হামলার সঙ্গে পার্টির

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব জড়িত।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কোনও খুনের মামলাতেই যেমন কখনও পার্টির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ফাঁস হতে দেওয়া হয় নি, বরানগর-সিঁথির দুলালকাণ্ডে যেমন পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির কামড়াকামড়ির ঘটনা চাপার প্রাণপণ চেষ্টা এখনও চলছে, তেমনি নদীয়ার এই ঘটনায় পার্টির ঘরোয়া-বিবাদের ব্যাপারটাও চাপা দেওয়ার জন্য সব কর্তা মিলে চেষ্টা করবেনই! এবং পুলিশের তথাকথিত বড় বড় অফিসাররাও তাদের আজ্ঞা মতো রাজ্যেব মানুষকে বোঝাতে চাইবেন, এটা নেহাতই ডাকাতির ঘটনা। এর সঙ্গে সি পি এমের অন্তর্দ্বন্দের কোনও সংস্রব নেই!

তবে ওরা যত শক্তিমানই হন, কৌশলী হন, এত পাপ কখনও বেশি দিন চেপে রাখতে পারবেন না। ভোটে জেতার জন্য, ব্যাপক রিগিং চালাবার জন্য, পার্টি যে আজ গোটা রাজ্যে এক বিশাল খুনে, ডাকাত মস্তান বাহিনী পুষছে, আগামী দিনের বহু ঘটনায় তা পরিষ্কার ধরা পড়বে। আর ধরা পড়বেই পার্টিব ভেতরের মারাত্মক বখরাব ঝগড়া। কোনও কৌশল, কোনও প্রশাসনিক শক্তি এই পাপ চিরকালের জন্য চাপা দিতে পারবে না।

বিরোধী নেতা-নেত্রীরা কেউ কেউ কেনা গোলাম। কেউ কেউ আবার শোচনীয়ভাবে বুদ্ধি হীন। সেই সুযোগে এরা ২৫ বছর চালিয়ে গেলেন। তবে, আর খুব বেশিদিন এভাবে চালানো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কারণ, পাপ এবং পারা কেউ কখনও হজম করে ফেলতে পারে না।

ধানতলা, গোয়ালতোড়ের কনেযাত্রীদের বাসে ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ কিছু কিছু বাঙালীর বিবেককে নাড়া দিয়েছিল। তাই তারা ক্ষোফ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন সংবাদমাধ্যমকে। আইনজীবী আনন্দ মুখোপাধ্যায় এদেরই একজন। (প্রতিদিন ১৭.০৩.০৩)

কখনও প্রশাসনিক তৎপরতায়, কখনও বা পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে মহিলাদের উপর একের পর এক হয়ে চলা অপরাধেব খবর শুনে নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় ভুগছেন এ রাজ্যের সাধারণ মানুষ। বানতলায় প্রকাশ্য দিবালোকে কর্তব্যরত সরকারি অফিসার অনিতা দেওয়ানের শ্লীলতাহানি করে খুন করার খবর শুনে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নিরুত্তাপে বলেছিলেন — "এমন তো কতই হয়।" সেই অভিজ্ঞ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কথার সত্যতা প্রমাণ করে প্রতিদিনই ঘটে চলেছে একের পর এক পৈশাচিক, মানবাধিকার লঙঘনকারী জঘন্যতম অপরাধ — কখনও হুগলির সিঙ্গুর, নদিয়ার ধানতলা, আবার কখনও ঘোকসাডাঙায়।

শুধু ধানতলা বা ঘোকসাডাঙা নয়, বীরভূম জেলায় বিকাশ বাগদি নামে এক সি পি এম সমর্থকের বিরুদ্ধে নিজের দলীয় সমর্থকেরই অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে সম্প্রতি। সুন্দরবনের বাসন্তী অঞ্চলে আর এস পি দলের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের জনৈক সদস্যের স্ত্রীকে গণধর্ষণ করেছে সি পি এমের পাঁচ যুবক, অভিযোগ আর এস পি-র। খড়দহের পাতুলিয়ার নতুনপট্টির বাসিন্দা এক আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত দুই ব্যক্তির মধ্যে অন্যতম মনোয়ার মণ্ডল প্রধান ক্ষমতাসীন দলেরই সক্রিয় সদস্য বলে অঞ্চলবাসীদের বক্তব্য।

আবার, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পানাপুকুর গ্রামের অঞ্চল সি পি এম শাখা কমিটির সভাপতি তালিবুল ইসলামসহ বাবলু মহম্মদ ও কয়েকজনের বিরুদ্ধেও ২৫ বছরের এক মহিলাকে অপহরণ, খুন ও ধর্ষণের অভিযোগ পুলিশকে চিন্তায় ফেলেছে। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, গত বছরের ডিসেম্বর থেকে এ বছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিন মাস সময়ে রাজ্যে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ,

শ্লীলতাহানি, পণের জন্য মৃত্যু প্রভৃতি গর্হিত অপরাধের লিপিবদ্ধ সংখ্যা হল ৯৮। উল্লেখ্য, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কর্মী-সদস্যদের লাগামহীন আইন ভাঙার পরিসংখ্যানের পাশাপাশি আমজনতা মারফত নারী নির্যাতনের সংখ্যাও এ রাজ্যে বেড়ে চলেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। সম্প্রতি লাউডন স্ট্রীটের এক বাড়িতে পরিচারিকাকে অত্যাচার করা, বরাহনগরে ১২ বছরের কিশোরীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা ও এই অপকর্মের বিরুদ্ধে সরব রাজু গুপ্তকে খুন করার অপরাধ এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

পুলিশি ব্যবস্থার অপদার্থতা ও এই পেশায় ব্যাপক আকারে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ রাজ্যে ঘটে চলা একের পর এক নারী অত্যাচারের ঘটনাকে প্রতিরোধ করতে অকৃতকার্য হচ্ছে। একটু পিছনে তাকালেই বোঝা যাবে, বাপি সেনের মতো সমাজসচেতন পুলিশ সার্জেন্টকে ব্যতিক্রম বলে ধরে নিলে এ রাজ্যের পুলিশবাহিনীর চরিত্র ও নিম্নলিখিত কাজকর্ম মোটেই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। যেমন —

- ১৯৯০ সালে উত্তর চব্বিশ পরগণার অশোকনগরে তিন মহিলাকে পুলিশকর্মীরা ধর্ষণ করে।
- জনৈক অভিজাত মহিলা কর্তব্যরত পুলিশকে পথনির্দেশ জিজ্ঞাসা করতে গেলে হুগলি জেলার সিঙ্গুর থানার এক সাব-ইন্সপেক্টর ও দুই কনস্টেবল মহিলাটিকে এক অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে।
- ১৯৯২ সালে ফুলবাগান থানার জনাকয়েক পুলিশকর্মী দ্বারা নিহার বানু ধর্ষণের ঘটনা প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান পেয়েছিল।
- হাওড়া স্টেশনের প্রতীক্ষালয়ে কলকাতা পুলিশের কর্মচারী মারফত জনৈক বাংলাদেশী মহিলাকে ধর্ষণের ঘটনা পুলিশের পেশাকে কালিমালিপ্ত করেছে।
- ১৯৯৭ সালে আমহার্স্ট স্ট্রীট থানার পুলিশ আবাসনে অবৈধ সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় জনৈক পুলিশ সার্জেন্ট নিজের স্ত্রীকে হত্যা করে পালিয়ে যায়।
- ১৯৯৭ সালে এয়ারপোর্ট অঞ্চলের বাইপাসে পুলিশকর্মীরা একটি ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে ভিতরে বসে থাকা মহিলাকে জোর করে বের করে তার সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করে।
- হাওড়া শিবপুর থানার পাশের এক ঝুপড়িতে ঢুকে চারজন কনস্টেবল জনৈক মহিলাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ উঠেছিল।
- ১৯৯৮ সালে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে সান্ধ্য ভ্রমণের সময় এক দম্পতির হার ছিনতাই করে দুই পুলিশকর্মী।
- ২০০২ সালে আলিপুর জেল থেকে আদালতে নিয়ে আসার সময় আসামী আনার গাড়ীর মধ্যেই এক বোবা মহিলাকে দুই পুলিশ কনস্টেবল ধর্ষণ করে, যেটি এখনও আদালতের বিচারাধীন।

আইনী সচেতনতা :

মোট কথা, ইদানিংকালে রাজ্য জুড়ে বেড়ে ওঠা খুন ও নারী নির্যাতনের ধারাকে সাধ্যমত প্রতিরোধ করতে সাধারণ মানুষকেই বেশ কিছুটা এগিয়ে আসতে হবে। সে কারণে, আমাদের, বিশেষত মহিলাদের নিম্নলিখিত আইনি অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া একান্ত প্রয়োজন :

- *কোন মহিলাকেই জিজ্ঞাসাবাদের অজুহাতে পুলিশ থানায় ডেকে আনতে পারবে না।*
- কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বাড়িতে কোন মহিলা থাকলে সূর্যাস্তের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়সীমায় পুলিশ তল্লাশি চালাতে বা কাউকে গ্রেফতারের অজুহাতে বাড়িতে ঢুকতে পারবে না।
- সম্পূর্ণ শালীনতা বজায় রেখেই কেবলমাত্র মহিলা পুলিশ কোনও মহিলাকে প্রয়োজনে তল্লাশি করতে পারবে।
- কোনও মহিলাকে গ্রেফতাব করা হলে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট পৃথক সেলে সেই মহিলাকে রাখতে হবে ও জেবার সময় সেই স্থানে কোনও মহিলা পুলিশকে হাজির থাকতে হবে।
- যে কোনও নাগরিক নিজের বা অন্যের ওপর অত্যাচার ঘটলে বিষটি জানিয়ে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।
- অত্যাচারিত মহিলারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে বহু ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট থানার কর্তব্যরত পুলিশ অফিসাব তাদের প্রতি অশ্লীল মন্তব্য, কটাক্ষ করেন। এমনকি ডায়েবি পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করতে অস্বীকার করা হয়ে থাকে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি।
- সংশ্লিষ্ট থানা ডায়েবি নিতে অস্বীকার করলে ডাকযোগে রেজিস্ট্রি করে অভিযোগটিকে নিকটবর্তী থানায় অথবা ডি সি বা জেলাস্তরে এস পি ব দফতরে পাঠিয়ে দিতে পারেন। অভিযোগ গ্রহণ না কবলেও ফিরে আসা বেডিস্টার্ড পোস্ট পরবর্তী সময়ে পুলিশি কর্তব্যহীনতার প্রমাণরূপে আদালতে পেশ করা যেতে পাবে।
- ধর্ষণজনিত অপরাধেব বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গেলে অনেক সময় ধর্ষিতার ডাক্তাবি পরীক্ষা করানোর ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে সময় নষ্ট করে পুলিশ। এর বিরুদ্ধে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বা মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হওয়া যেতেই পারে।

মোট কথা, রাজ্যে বেড়ে ওঠা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আখেরে রাজ্যসরকারকেই ভয়ঙ্কব সামাজিক চাপ ও অস্থিরতার মুখে পড়তে হতে পারে। অপরাধের মাত্রা বাড়তে থাকলে শেষ পর্যন্ত অপরাধীদের তাণ্ডব থেকে মন্ত্রীদের পবিবারের মহিলারাও নিষ্কৃতি পাবেন না, সাম্প্রতিককালে বাপি সেন হত্যাই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

তাই দুষ্কৃতী রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট হোক বা নাই হোক, ওদিকে নজর না দিয়ে সভ্য গণতান্ত্রিক সমাজ গড়তে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিক সরকার। মনে রাখতে হবে, সতী বা পতিতা — সমস্ত মহিলারই মানবাধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়ভার বহন করার জন্য আমাদের রাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ।

সেকালে নারী নির্যাতন

"প্রবীণতম রাজনীতিবিদ জ্যোতি বসু কংগ্রেস আমলে বিরোধীপক্ষে ছিলেন প্রায় কুড়ি বছর। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা এবং কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে হেন কোনও অভিযোগ নেই, যা বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে জনসভায় তিনি করেননি। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে তখন বিভিন্ন বিরোধী দল কিংবা দলের সদস্যদের অনেকেই গলা মিলিয়েছেন। কিন্তু, বিধানসভার কার্যবিবরণী ঘেঁটে কোথাও কোনও সদস্য ধর্ষণের অভিযোগ কবেছেন বলে একটি শব্দও পাইনি।

বিরোধী দলের নেতা হিসাবে জ্যোতিবাবুর নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে প্রধানত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লসেনের বিরুদ্ধে 'দুর্নীতি ও স্বজনপোষণেব' দিস্তে দিস্তে অভিযোগের নামে আক্রমণের সুবাদে। তখন থেকে পার্টির সদস্য-সমর্থকদেরও চোঙা ফুঁকে জ্যোতিবাবুর 'চিন্তাধারা' দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব বাড়তে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গকে ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকারের 'ঘোর কুশাসন' থেকে মুক্ত কবাব জন্য অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদ রাষ্ট্রপতির কাছে একটি বিশাল আকারের স্মাবকলিপি জমা দেয়। জ্যোতিবাবুই তখন রাজ্য সম্পাদক। ওই স্মাবকলিপিতে ডাঃ রায়ের মন্ত্রীসভাকে ববখাস্ত করার দাবি জানানো হয়। পরে স্মারকলিপিটি ১৮৫৯ সালের জুলাই মাসে জনগণের উদ্দেশ্যে (৮৫ পৃষ্ঠার) পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়।

স্মারকলিপিটিতে জ্যোতিবাবু 'ঘোর কুশাসনের' বহু অভিযোগ তুলে ধরেন। যেমন চুরি, দস্যুবৃত্তি এবং হত্যার পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। অবশ্য সমস্ত পরিসংখ্যান যে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে সংগ্রহ করেছেন, জ্যোতিবাবু তা উল্লেখ করেছিলেন। 'কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, আসানসোল, খড়্গপুর শিল্পাঞ্চলে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, নরহত্যা, জাল নোটের কারবার, খাদ্য ও ওষুধে ভেজাল মেশানোর কারবার, নারীদের লইয়া পাপ ব্যবসা, ওয়াগন ভাঙ্গিয়া রেলের সম্পত্তি চুরি, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার চুরি প্রভৃতি জঘন্যতম সমাজবিরোধী কার্যকলাপের সংবাদ দিনের পর দিন প্রকাশিত হইতেছে।' চুরি ডাকাতি থেকে টেলিফোন টেলিগ্রাফের তার চুরিও ছিল জ্যোতিবাবুদেব বিচারে জঘন্যতম সমাজবিরোধী কার্যকলাপ। কিন্তু ৮৫ পাতার ওই স্মারকলিপিতে কোথাও ধর্ষণ, নারী নির্যাতন বা নারী অপহরণের একটি ঘটনা ঘটেছে বলে তাঁরা নির্দিষ্ট কোন উল্লেখ করেননি। দলীয় দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতাও' এমন কোনও ঘটনার সংবাদ পায়নি।

সমাজবিরোধী কার্যকলাপের জন্য জ্যোতিবাবু সেদিন কংগ্রেসের মন্ত্রী এবং প্রভাবশালী নেতাদেরই ষোলো আনা দায়ী করেছিলেন। স্মারকলিপিতে অভিযোগ করেছিলেন, 'দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ অফিসারদের মাধ্যমেই কয়েকজন মন্ত্রী এবং প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা সমাজবিরোধী শক্তিগুলির সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলেন। সে জন্যই সমাজবিরোধী কার্যকলাপ

বন্ধ করার ব্যাপারে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণে রাজী নহেন।'

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল, 'দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ইত্যাদির উৎস হইল কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা।' জ্যোতিবাবু ডাঃ রায়কে 'পুঁজিপতিদের যোগ্য প্রতিনিধি বলে বার বার মন্তব্য করেছেন। কিন্তু শুধু এই স্মারকলিপিতে নয়, জ্যোতিবাবু ক্ষমতায় আসার পর তার রাজনৈতিক আত্মজীবনীমূলক 'জনগণের সঙ্গে' লিখেছেন দু'খন্ডে (৩৬৪ পাতা)।

'পুলিশ ও কংগ্রেসী গুন্ডাবাহিনীর আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস, গণতন্ত্র হত্যা' ইত্যাদি নিয়ে তাতে অসংখ্য অভিযোগ করেছেন।

দ্বিতীয় খন্ডের শেষদিকে, ১৯৭২-৭৭-এব 'কংগ্রেস আমলের জঘন্যতম অপরাধের' বহু ঘটনার কথা উল্লেখ আছে। জ্যোতিবাবু লিখেছেন, 'এই সময়ে পশ্চিমবাংলায নারীসমাজের মর্যাদাহানিকর এক কলঙ্কজনক অধ্যায় রচিত হয়েছিল। সম্ভবত ব্রিটিশ আমলেও এভাবে নারীর সম্মান ভুলুণ্ঠিত হয় নি। ১৯৭০ সালের শেষদিকে একের পর এক নারী-সম্ভ্রমহানিব ঘটনা ঘটতে থাকে। গুলি করে নারীহত্যা থেকে শুরু করে থানার লক আপে নারীদেব ওপর অমানুষিক পাশবিক অত্যাচার, মিথ্যা মামলায় সি পি আই (এম) ও গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যাদের অভিযুক্ত করা, গ্রেপ্তার করা ও দিনের পর দিন বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা, প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও কংগ্রেসী সমাজবিরোধীদের দ্বারা নারীর শ্লীলতাহানি — সবই ঘটেছে ঘটানো হয়েছে যা কিনা সভ্যতার কলঙ্কস্বরূপ এবং একটি ক্ষেত্রেও সবকার অপরাধীদেব বিরুদ্ধে মামলাটুকুও দায়ের করেননি, অন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ তো দূরের কথা' (দ্বিতীয় খন্ড 'জনগণের সঙ্গে', পৃষ্ঠা ২০২)

১৯৭২-এর নির্বাচন নিয়ে জ্যোতিবাবু 'পশ্চিমবঙ্গে সংসদীয় গণতন্ত্র ধ্বংস' নামে ৩৫ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকায় 'পুলিশ-কংগ্রেস-সি পি আই গুণ্ডাদের আধা ফ্যাসিস্ট কার্যকলাপের' বহু রংবেরং কাহিনী তুলে ধরেন। এমনকি, জ্যোতিবাবু এক জায়গায় (পৃষ্ঠা ২১-২২) লিখেছেন, 'খড়দহে দুপুরবেলা ১২টা নাগাদ সি পি আই (এম)-এর অফিসগুলি ও তার সমর্থকদের বাড়িগুলি গুণ্ডারা আক্রমণ করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়।' এরপরেই জ্যোতিবাবু লিখছেন, 'কিন্তু পুলিশ কেবল বিপন্ন নরনারীকে উদ্ধারেই মাত্র সাহায্য করে (বামফ্রন্ট জমানায় পুলিশের এই ভূমিকা কল্পনা করা যায়?)। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয় না।'

যাই হোক, জ্যোতিবাবু আজ পর্যন্ত কোথাও কংগ্রেস আমলে ধর্ষণের ঘটনার উল্লেখ করেননি বা করতে পারেননি। শুধু জ্যোতিবাবু নন, সি পি এম বা কংগ্রেস বিরোধী দলের অনেক নেতা কংগ্রেসকে আধা ফ্যাসিস্ট, গুণ্ডা-সমাজবিরোধী বলে আখ্যা দিয়ে নিজেদের দলের কর্মী-সদস্য-সমর্থকদের সাচ্চা মার্কসবাদী এবং সত্যনিষ্ঠ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তবু কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের ধর্ষণকারী বলে আখ্যা দিতে পারেননি।

বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট নেতা ডাঃ রণেন সেন 'বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ' বইতে ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার ভয়াবহ বিবরণ দিয়েছেন। পেশাদর গুণ্ডাদের বেপরোয়া তাণ্ডবের ঘটনাও তুলে ধরেছেন। কিন্তু হিংস্র, ধর্ম-উন্মাদনায় মত্ত গুণ্ডাদের কোথাও ধর্ষণকারী বলে উল্লেখ করেননি।

ধর্ষণের মারাত্মক প্রবণতার সূচনা যে কংগ্রেস জমানায় ঘটেনি সেটা পরিষ্কার। শুরু হয়েছে

জ্যোতিবাবু পুলিশমন্ত্রী হওয়ার পর। ১৯৯০ সালে বানতলার মতো নারকীয় ঘটনার পর তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশমন্ত্রী জ্যোতি বসু মন্তব্য করেছিলেন, 'এমন ঘটনা তো কত ঘটে। এর জন্য কি আমি কোথাও যেতে পারব না। আমি কি থানায় গিয়ে বসে থাকব?'

আসলে, পশ্চিমবঙ্গে এধরণের ন্যাক্কারজনক ঘটনার সূত্রপাত হয় ১৯৬৯ সালের ৬ এপ্রিল রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম থেকে। একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত। সেই ঘটনায় বহু মহিলা সমাজবিরোধীদের হাতে নিগৃহীত হন। শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটে। শেষ পর্যন্ত পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। ওই ঘটনায় একজনের মৃত্যুও ঘটে। কিন্তু, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনা বেমালুম অস্বীকার করেন। স্বভাবতই সমাজবিরোধীরা পরোক্ষভাবে মদত পায়।

ব্যাপক হারে এবং পার্টির ক্যাডারদের দ্বারা বা পার্টি আশ্রিত সমাজবিরোধীদের দ্বারা একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটতে থাকে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকে। বাম জমানায় ২৬ বছরে ধর্ষণের যত ঘটনা ঘটেছে, তার দশ শতাংশও পুলিশ রেকর্ড করেননি।

কোনও মহিলার প্রতি অবমাননা, নির্যাতন বা শ্লীলতাহানি প্রভৃতি ঘটনা নিয়ে কংগ্রেস আমলে কোনও মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী বা নেতা সাফাই গাননি। বিরোধী নেতা জ্যোতিবাবু তখন বরাবরাই বলতেন 'কংগ্রেসী পুলিশ' বা 'পুলিশ হল কংগ্রেসের গুণ্ডাবাহিনী'। সি পি এম ক্ষমতায় আসার পর সেই গুণ্ডাবাহিনী, সেই পুলিশ জ্যোতিবাবুর কাছে রাতারাতি হয়ে গেল 'নিরপেক্ষ' গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর জ্যোতিবাবু বলতেন 'আমার পুলিশ'! কোনওদিন ভুলেও পুলিশের নিন্দা করেননি।

বছর দশেক আগে, ১৯৯২ সালের ১ নভেম্বর ফুলবাগানে ফুটপাতবাসী নেহারবানুকে তুলে এনে একজন পুলিশ কনস্টেবল ধর্ষণ করে। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এইরকম ন্যাক্কারজনক ঘটনার নিন্দা করে বহু নাগরিক বিক্ষোভ দেখান। সেদিন জ্যোতিবাবু বিক্ষোভকারীদেরই নিন্দা করেন। ধর্ষণকারী পুলিশ কনস্টেবলের নিন্দা তিনি করেননি।

পরোক্ষভাবে পুলিশের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে বলেছিলেন, 'পুলিশ ভদ্র বলে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কিছু করেনি।'

বাম জমানায় ধর্ষণ, গণধর্ষণ, অবর্ণনীয় নারী নির্যাতনের শিকার ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে গরীব মানুষ। কোচবিহারে বর্ণালী দত্তকে ধর্ষণের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে নরপশুদের চিনিয়ে দেয়। এরপর বীরভূমের নানুর থানার পাটনীল গ্রামের ঘটনা সি পি এমের ক্যাডারদের মুখোশ খুলে দেয়। গৃহস্থ বধূ থেকে দশ বছরের বালিকা — কেউ ধর্ষণকারীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এছাড়া মারধোর, বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়াব ঘটনাও ঘটে সেখানে। এরকম নারকীয় ঘটনা ১৯৭০ সালের ১৬ মার্চ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর ঘটনা বর্ধমানের সাঁইবাড়ির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বীরভূম জেলায় পাটনীল গ্রামে নরপশুদের উন্মত্ততার খবর পেয়ে সদলবলে গিয়েছিলেন তদানীন্তন এস ডি পি ও নজরুল ইসলাম (পরবর্তীকালে কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের পদস্থ অফিসার এবং সুসাহিত্যিক)। নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাড়িয়েছিলেন। বিধানসভায় সি পি এমের একজন সদস্য পাটনীলের ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন এবং নজরুল ইসলামকে 'কংগ্রেসের লোক' বলে মন্তব্য করেন।

বানতলার ঘটনা আরও কলঙ্কজনক। ১৯৯০ সালের ৩০ মে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের একদল মহিলা অফিসার কর্মী আক্রান্ত হন। দিনের বেলায় বানতলার হাটে শত শত লোকের সামনে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে একজন মহিলা কর্মীকে গণধর্ষণ করা হয়। কুৎসিতভাবে সারা দেহে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে নরপশুরা ক্ষতবিক্ষত করে। এরপর সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে তিনজন মহিলাকে ধর্ষণ করার পর চলে নির্মম মারধর। গাড়ির চালক অবনী নাইয়া এবং গণধর্ষণের শিকার এক মহিলাকে পিটিয়ে খুন করা হয়। জ্যোতিবাবুর বংশবদ এক সি পি এম নেতা সমস্ত ঘটনার জন্য নির্লজ্জভাবে কংগ্রেসের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা করেন।

বানতলাব ঘটনা নিয়ে দু-একজন সরকারি আমলা এবং পুলিশ অফিসারের তৎপরতায় সাধারণ মানুষ বিস্মিত হয়েছে। রাজ্য পুলিশের তদানীন্তন ডি আই জি (সি আই ডি) রাতারাতি 'তদন্ত' করে নিজেই সাংবাদিকদের ডেকে বলে দিলেন — বানতলায় ছেলেধরা সন্দেহে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। ব্যাপারটা যেন সেই ঠাকুব ঘরে কে? না, আমি তো কলা খাইনি গোছের। তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রসচিব (পরে মুখ্যসচিব) মনীশ গুপ্ত কোনও প্রশ্ন ছাড়াই সাংবাদিকদের বলে দিলেন, বানতলার ঘটনার সঙ্গে সি পি এম জড়িত নয়।

বাম জমানায় চরম, দুর্নীতিগ্রস্ত থেকে শুরু করে খুনি, ডাকাত, নরপশু ধর্ষণকারীরা সি পি এমে জায়গা করে নিয়েছে। আগে গোষ্ঠীদ্বন্দ হলে লাঠালাঠি, মারামারি পর্যন্ত গড়াত। এখন পাল্টা গোষ্ঠীর সমর্থক খেতমজুরদের পিটিয়ে মারা থেকে মেয়ে বউয়ের ধর্ষণের ঘটনা আকছার ঘটছে। পুলিশ বোধহয় বুঝে উঠতে পারছে না — সি পি এমের লোক হলে সমাজবিরোধী শ্রেণীর মধ্যে পড়ে কিনা! বানতলা, পাটনীল, সুজপুর — একের পর এক নারকীয় ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, গোটা রাজ্যে মার্কামারা ক্রিমিন্যাল থেকে শুরু করে শ্রেণী সংগ্রামের কায়দায় পার্টির সঙ্গে যুক্ত ধর্ষণকারী সকলেই পুলিশের দৌড় বুঝে নিয়েছে।

প্রায় তিনবছর আগে, বীরভূমের সুজপুরে ১১ জন দিনদরিদ্র মানুষকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। আজ পর্যন্ত একজনেরও সাজা হয়নি। হবে কি করে? পুলিশ এখনও নাকি খুনিদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তারপর চার্জশিট, তারপর তো সাজার প্রশ্ন।

তাই ঘটে চলেছে একের পর এক ধানতলা, ছেড়ামারি, গোয়ালতোড় .....। আসলে, বুদ্ধদেববাবুর জমানাতেও জ্যোতিবাবুর জমানার ট্র্যাডিশান ঠিকঠাক বজায় আছে। শুধু, আগে নির্লজ্জ প্রতিক্রিয়া শোনা যেত জ্যোতিবাবুর মুখেই। আর এখন, মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তি রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন আলিমুদ্দিনের কর্তারা।

বিধানসভায় ১৯৮৫ সালের ১০মে প্রশ্ন ছিল (অনুমোদিত প্রশ্ন ১২৮২) : (ক) ১৯৭৭ সাল হইতে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সময়ে কাঁথি মহকুমার বিভিন্ন থানায় কতগুলি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর হয় নাই (সালওয়ারি হিসাব), এবং (খ) গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর না হওয়ার কারণ কি?

দুটি ক্ষেত্রেই জবাব দিয়েছিলেন জ্যোতিবাবু। বিধানসভার কার্যবিবরণীতে নিম্নলিখিতভাবে তা লিপিবদ্ধও আছে।

স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের মন্ত্রীমহাশয় ঃ

ক) (সালওয়ারি হিসাব)

১৯৭৭	৬৩
১৯৭৮	৭৪
১৯৭৯	১৬০
১৯৮০	১৩০
১৯৮১	১৫০
১৯৮২	১০৭
১৯৮৩	১৪৬
১৯৮৪	৪৬
মোট	**৮৭৬**

খ) আসামীবা পলাতক আছে।

অতিরিক্ত প্রশ্ন করলে মন্ত্রীমহাশয় অর্থাৎ জ্যোতিবাবু হয়তো জবাব দিতেন, আপনারা কি বাংলাও বোঝেন না। আসামীরা পলাতক হলে পুলিশ ধববে কি করে? ধর্ষণের ঘটনায় আমাদের পার্টির লোক জড়িত বলে আপনারা শুনছেন, আমিও শুনছি। তা আমি কি করব? এসব তো পুলিশের কাজ। যা কবার পুলিশ করবে। (সৌজন্যে ঃ নিশিথ দে, বর্তমান, ২৭/০২/১৪১০)

কংগ্রেস আমলে ধর্ষণের সংখ্যা –– শূণ্য

বামফ্রন্ট আমলে পশ্চিমবঙ্গের দশ বছরে (১৯৯২-২০০১) ধর্ষণের ঘটনা

সাল	ধর্ষণের ঘটনা
১৯৯২	৬১৫
১৯৯৩	৭১৩
১৯৯৪	৭৪৩
১৯৯৫	৭৮৭
১৯৯৬	৮৫৫
১৯৯৭	৭৯৬
১৯৯৮	৭৩০
১৯৯৯	৭৯৫
২০০০	৭৭৯
২০০১	৭০৭
মোট	**৭৫২০**

(পুলিশ রেকর্ড অনুযায়ী)

প্রধান রাজ্যগুলিতে ২০০১ সালে নারী নির্যাতনের ঘটনা

রাজ্য	ধর্ষণ	পণপ্রথার বলি	শ্লীলতাহানি	অপহরণ
উত্তরপ্রদেশ*	২১৯৭	১৮৯৩	২৮১৯	৩০৯০
মধ্যপ্রদেশ**	৫২৯	৭৩৯	২৭২৪	৭৩৭
মহাবাষ্ট্র	১২৩৯	৩৩৬	২৮২০	৮৬১
রাজস্থান	১০৪৯	৪৬০	২৮৭৬	২১৫৫
গুজবাট	২৩৯	৮৮	৭৬৪	৭১৮
অন্ধপ্রদেশ	৮৪৭	৫৩৫	৩৩৩৮	৭৪৭
কর্ণাটক	২৯৩	২৪৯	১৬৬৫	২৭৫
কেবল	৫৪২	২২	২০৪৩	১১৩
তামিলনাড়ু	৩৯৩	১৫৫	১৫৭১	৬৭৭
পাঞ্জাব	২৮২	১৬৯	৩২১	৪০৩
ওড়িশা	৭৪২	২৯৭	১৫৬২	৪০৪
হিমাচলপ্রদেশ	১৫৫	১৮	৩০৩	১১১
অসম	৭৭৫	২৮	৩৩৯	৭৮৫
বিহাব***	৬৮৭	৮৯৪	৩২৫	৪৮৮
পশ্চিমবঙ্গ	৭০৭	২৭৩	৯৩২	৬৮৫
দিল্লী	৩২০	১২২	৪৯৯	৯৬৯

*নতুন উত্তবাঞ্চল, **ছত্রিশগড় এবং ***ঝাড়খন্ড বাজ্য বাদে।

সূত্র ঃ ন্যাশানাল ক্রাইম রেকর্ড বুর্য়ো।

অবিভক্ত বঙ্গে নারী নিগ্রহ

বাংলাদেশে নারী নিগ্রহ সম্বন্ধে সঞ্জীবনী কাগজে কয়েক সপ্তাহ ধরে তথ্যাবলী হচ্ছিল। ১৩২৯ সাল হইতে ১৩৩৩ পর্যন্ত যত ঘটনা ঘটেছিল সেগুলোর একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল (সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৩৪, ২৭শ ভাগ, ১ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)। এই পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলার কোন জেলায় কটা নারী নিগ্রহ হয়েছিল তার হিসেব ঃ

জেলা	১৩২৯	১৩৩০	১৩৩১	১৩৩২	১৩৩৩	মোট
কলকাতা	১	৫	১২	৩১	৩৯	৮৮
২৪ পরগণা	—	—	১৯	২০	৩২	৭১
নদীয়া	—	—	৫	১১	২৪	৪০
মুর্শিদাবাদ	—	—	৩	৩	৫	৮
যশোর	—	১	৯	৮	৬	২৪
খুলনা	—	১	২	৩	১০	১৬
হাওড়া	—	১	৫	৫	৪	১৫

হুগলি	—	১	২	৩	৬	১২
বর্দ্ধমান	—	—	৫	৩	৪	১২
মেদিনীপুর	—	—	৪	২	৪	১০
বীরভূম	—	—	৪	—	১	৫
বাঁকুড়া	—	—	১	১	২	৪
রাজশাহী	—	—	৯	৪	১২	২৫
পাবনা	—	—	৬	৩	৭	১৬
বগুড়া	—	—	৬	৬	১১	২৩
রংপুর	—	৯	২০	১৭	১৬	৬২
দিনাজপুর	—	—	২	৬	৫	১৩
জলপাইগুড়ি	—	—	৩	—	—	৩
দার্জিলিং	—	—	১	২	১	৪
ময়মনসিংহ	—	১	২৫	২৪	২৮	৭৮
ঢাকা	—	২	১৬	—	১৫	৪৩
ফরিদপুর	—	—	৪	৬	১৬	২৬
বাখরগঞ্জ	—	—	২	৫	১৬	২৩
ত্রিপুরা	—	—	৪	৭	১	১২
নোয়াখালি	১	—	২	১	৩	৬
চট্টগ্রাম	—	—	৬	৫	৪	১৫
শ্রীহট্ট	—	১	৮	৮	১৫	৩২

এ-যুগের পাঠকরা অখন্ড বাংলায় কয়টা জেলা ছিল এবং সেগুলোর নাম কি ছিল তা জানেন না। জানবার কথাও নয়। উপরোক্ত তালিকা থেকে তাও জানা হয়ে গেল। পাঠকদের মধ্যে যারা যে জেলার অধিবাসী সেই জেলা সম্বন্ধে জানার বিশেষ আগ্রহও থাকবে।

যাই হোক, উপরোক্ত তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে কোন কোন জেলায় কোন কোন বছর একটিও নারী নির্যাতনের ঘটনার রিপোর্ট নেই। এক বছরে অবশিষ্ট জেলাগুলোতে নারী নিগ্রহের ঘটনা এযুগের তুলনায় হয়নি বললেই চলে। কোথাও বা এক, কোথাও বা দুই। সর্বাধিক কলকাতায় ৩৯, ১৯৩৩ সালে। তাও, 'প্রবাসী'-র সম্পাদক চিন্তিত —

"নারীর উপর অত্যাচার বাড়িতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বসাধারণের এবিষয়ে অধিকতর সজাগ ভাব ও কর্তব্যপরায়ণতাবশতঃ হয় তা আগেকার চেয়ে এখন বেশি ঘটনা আদালকের গোচর করা হয়। কিন্তু শুধু এই কারণ দ্বারা সমুদয় বৃদ্ধি ব্যাখ্যা করা যায় না। ইহাও বলিলে চলিবে না, যে বঙ্গের লোকেরা উত্তরোত্তর অধিকতর ভীরু হইয়া চালায় নারীদের উপর অত্যাচার করিতে দুর্বৃত্তদের সাহস বাড়িয়া চলিয়াছে; কেন না, দেশের লোকেদের ভীরুতার, উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রমাণ নাই।......... এইরূপ পৈশাচিক কাজ যে দুর্বৃত্তরা দলবদ্ধ ভাবে করিতেছে, তাহার প্রমাণ নিম্নে একটি তালিকায় পাওয়া যাইবে।

এই পাঁচ বৎসরে নিগৃহিতা কুমারীর সংখ্যা ৬৬। ৫৪ জনের বয়স ৫ হইতে ১৫ পর্যন্ত, ১২ জনের বয়স অজ্ঞাত। নিগৃহিতা সধবার সংখ্যা ৩০৮জন; তন্মধ্যে ২১৪ জনের বয়স অজ্ঞাত, বাকি ৯৪ জনের বয়স ১১ হইতে ৩৫ পর্যন্ত। নিগৃহীতা বিধবাদের সংখ্যা ৯৬ জন; ৬৩ জনের বয়স অজ্ঞাত, ৩৩ জনের বয়স ১৩ হইতে ৪৫ পর্যন্ত।

নিগৃহীতাদের ধর্ম

	হিন্দু	মুসলমান	খ্রীষ্টান	অজ্ঞাত	মোট
কুমারী	৪০	২১	২	৩	৬৬
সধবা	২১৩	৮২	০	৮	৩০৮
বিধবা	৮৭	৫	০	৪	৯৬
অজ্ঞাত	১৩৭	৩৮	১	৩০	২০৬

দলবদ্ধ নিগ্রহের তালিকা ঃ

অত্যাচারী হিন্দুর দল ৮০টা — ২-৪ জনেব দল ৫৪টা, ৫-এর অধিক দল ২৬ টা।

অত্যাচারী মুসলমানের দল ২২৭টা – ৮৮টা ২ হইতে ৪ জনেব দল, ১৩৯টা ৫ হইতে অধিক লোকের দল।

অত্যাচারী খ্রীষ্টানদের দল ১টা, সংখ্যা ২ হইতে ৪ জন।

হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত অত্যাচারীব দল ৩৯টা — ১৭টা হইতে ৪ জনেব দল, ২২টা ৫ হইতে অধিক লোকেব দল।

খ্রীষ্টান ও হিন্দু ৫ হইতে অধিক লোকের দল ১টা।

খ্রীষ্টান ও মুসলমান ৫ হইতে অধিক লোকের দল ১টা।

অজ্ঞাত ধর্মাবলম্বী অত্যাচারীব দল ৮৪টা — ১২টা ৪ জনেব দল, ৭২টা ৫ হইতে অধিক লোকের দল।

প্রত্যেক দল একটি করিয়া স্ত্রীলোকেব উপর অত্যাচার করিয়াছে। বাংলাদেশের এই পাপ যে কিরূপ পৈশাচিক তাহা এই দলবদ্ধ নারকীয় অত্যাচার তালিকা হইতে বুঝা যাইতেছে।

বাংলাদেশের নেতারা, বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট ইহা দমন কবিতে চেষ্টা করিবেন না? বাংলাদেশের নারীদিগকে রক্ষা করিবার কি কেহই নাই?

হিন্দু দ্বারা হিন্দু নারী নিগ্রহ	—	
হিন্দু দ্বারা মুসলমান নারীর নিগ্রহ	—	১৫২টা
হিন্দু দ্বারা খ্রীস্টান নারীর নিগ্রহ	—	৯টা
হিন্দু দ্বারা অজ্ঞাতধর্মী নারীর নিগ্রহ	—	১৫টা
মুসলমান দ্বারা হিন্দু নারীর নিগ্রহ	—	২২২টা
মুসলমান দ্বারা মুসলমান নারীর নিগ্রহ	—	১টা
মুসলমান দ্বারা অজ্ঞাতধর্মী নারীর নিগ্রহ	—	১৭টা
মুসলমান দ্বারা পার্সি নারীর নিগ্রহ	—	১টা

হিন্দু মুসলমান দ্বারা হিন্দু নারীর নিগ্রহ	—	৩৬টা
হিন্দু মুসলমান দ্বারা মুসলমান নারীর নিগ্রহ	—	২টা
অজ্ঞাতধর্মী দ্বারা হিন্দু নারীর নিগ্রহ	—	৬৭টা
অজ্ঞাতধর্মী দ্বারা মুসলমান নারীর নিগ্রহ	—	২৩টা
অজ্ঞাতধর্মী দ্বারা অজ্ঞাত নারীর নিগ্রহ	—	২২টা
অজ্ঞাতধর্মী দ্বারা খ্রীস্টান নারীর নিগ্রহ	—	১টা
খ্রীস্টান দ্বারা মুসলমান নারীর নিগ্রহ	—	১টা
অজ্ঞাত দ্বারা খ্রীস্টান নারীর নিগ্রহ	—	১টা
খ্রীস্টান দ্বারা খ্রীস্টান নারীর নিগ্রহ	—	১টা
খ্রীস্টান দ্বারা অজ্ঞাতধর্মী নারীর নিগ্রহ	—	১টা
খ্রীস্টান দ্বারা হিন্দু নারীর নিগ্রহ	—	১টা
সবমোট	—	**৬৯৪টা**

সকলের চেয়ে অধিক সংখ্যক অত্যাচার হইয়াছে কলিকাতা শহরে। তাহার কারণ নানাবিধ হইতে পারে। এখানে পারিবারিক ও সামাজিক শাসনের বাহিরে হাজার হাজার পুরুষ বাস করে গুণ্ডা আছে অগনিত; পাপ ব্যবসার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। সুতরাং এখানে নারীর উপর অত্যাচার বেশী হইবারই কথা।"

নারী নির্যাতন কেন?

২০০০-এর ময়দানে বইমেলা। আপনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ শুনলাম 'শুরু হচ্ছে নারী নির্যাতন নিয়ে বিতর্ক'। গেলাম সেদিকে। বসলাম। কিছু শুনব। প্রচুর আসন শূণ্য। ভাবলাম ফাঁকা মাঠে গোল হবে। কিন্তু হাততালি পড়বে না। কিছুক্ষণের জন্যই দেখি সব আসন দখল হয়ে গেছে। যথা সময়ে শুরু হল বিতর্ক। সেই বিতর্কের যা কিছু মনে আছে বলছি ঃ

রবীন্দ্রসদন মেট্রো স্টেশনের কাছে যে ঘটনাটা ঘটেছিল, সুচিত্রা ভট্টাচার্য যে ঘটনা থেকে লিখলেন তাঁর 'দহন' উপন্যাস, এবং ঋতুপর্ণ ঘোষ ছবিও করলেন সেই উপন্যাস থেকে, সেই ঘটনার প্রধান সাক্ষী ছিলাম আমি। আমি সাক্ষ্য দিতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলাম। দু'বার নিজের খরচে দিল্লী থেকে কলকাতায় এসেছি, আমায় সাক্ষী হিসাবে ডাকা হবে ভেবে। আজ থেকে ১১ বছর আগে ঘটনাটা ঘটেছিল। আমাকে কিন্তু আজও সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়নি এবং কেসটারও কোন মীমাংসা হয় নি। তার কারণ, যারা ওই মেয়েটির শ্লীলতাহানি করেছিল, তাদেব মধ্যে দু'জন প্রভাবশালী ব্যক্তির আত্মীয়। অথচ আপনি বলছেন, সাক্ষীর অভাবে আপনাবা মেয়েদের শ্লীলতাহানির কেসগুলো দাঁড় করাতে পাবেন না। দোষীরা সেই জন্যই শাস্তি পায় না!

পুলিশ কমিশনার সুজয় চক্রবর্তীর চোখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি কথাগুলি বললেন সন্দীপ্ত সাংবাদিক অনন্যা চট্টোপাধ্যায়। তির্যক অনন্যা আবও একটি শাণিত উচ্চারণে পুরে দিলেন তীব্র শ্লেষ, "আপনাবা অনেক সময়ই মেয়েদেব দোষ দেন। বলেন ওদের জামাকাপড়, ব্যবহার — এসব নাকি পুরুষকে অনেক সময় উস্কে দেয়। শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসবের কথাটা একবার ভাবুন। সেখানে তো কোনও মেয়ে স্প্যাগেটি টপ পরে ঘোরে না, শরীরও দেখায় না। অথচ সেখানে আজকাল কী ঘটছে, তা-ও আমরা জানি। কোথায় নেমে গিয়েছে এই পরিবেশ!"

৪ ফেব্রুয়ারী স্নিগ্ধ বিকালে 'দেশ' পত্রিকার মন্ডপে এই ভাবে একটি আলোচনাসভা উত্তীর্ণ হল, মার্গসঙ্গীতের ভাষায়, বিশুদ্ধ 'দীপক'-এ, উত্তেজনার আগুন ছড়িয়ে। আলোচনার বিষয় ঃ এই শহরে মহিলাদের নিরাপত্তা এখন কতটুকু। আলোচনা সভার আর এক যন্ত্রণা-বহ্নিত অগ্নিকন্যা নীলাঞ্জনা, অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তীর স্ত্রী। তিনি গভীর ক্ষোভ এবং রাগ থেকে বললেন, নিজে কীভাবে এক ভয়ঙ্কর রাত্রে কয়েকজন নোংরা পুরুষের পাল্লায় পড়েছিলেন। উনি মায়ের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন রিক্সায় চড়ে আর জেন গাড়িতে ওরা তার পিছু নিয়েছিল। রিকশার পথ আটকে ওকে নেমে এসে গাড়িতে ঢোকার প্রস্তাব দিয়েছিল। যে-হেতু নীলাঞ্জনা বাড়ির কাছে এসে যেতে পেরেছিলেন এবং স্বামীকে মোবাইলে ডেকে নিতেও পেরেছিলেন, তাই শেষ পর্যন্ত অর্জুনের হাতে মার খেয়ে ওরা চলে যায়। কিন্তু টেলিফোনে জ্বালাতে থাকে। পুলিশের কাছে এফ অই আর করতে গিয়ে খারাপ ব্যবহার পেয়েছিলেন নীলাঞ্জনা।

অধ্যাপিকা শাশ্বতী ঘোষ নারীর অধিকারের প্রবক্তা এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রবল

প্রতিবাদী কণ্ঠ। এই আলোচনা সভার তিনি আর এক অগ্নিকন্যা। বললেন, সুজয়বাবু আপনি বলুন, সন্ধিবাবু (সন্ধি মুখোপাধ্যায়, যুগ্ম পুলিশ কমিশনার) আপনিও বলুন, কেন এই সব ইভ-টিজারদের কাছে, যারা মেয়েদের অপমান করছে, মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধ করছে, তাদের কাছে এই খবরটুকু পৌঁছে দিতে পারছেন না যে, কোনও ভাবে আপনারা তাদের সহ্য করবেন না। আপনারা সহ্যের প্রান্তে এসে গিয়েছেন, এটা অন্তত বুঝিয়ে দিন। তীব্র আবেগে কথা বলেছেন শাশ্বতী। তাঁর বাচনবঙ্গী, তাঁর শরীর ভাষা, তাঁর মাঝে মধ্যে খেই হারানো বক্তব্যের রুদ্ধশ্বাস দ্রুতি বুঝিয়ে দিচ্ছিল, কত গভীর অপমানবোধ থেকে, যন্ত্রণা থেকে, হয়তো অসহায়তা বোধ থেকেও উঠে আসছিল তাঁর উচ্চারণ। তিনি পুলিশ অফিসারদের দিকে ছুড়লেন তাঁব অগ্নিবাণ ঃ আপনারা বলছেন! বিশ্বাস হচ্ছে না, এ কথা আপনারা বলছেন যে, শাস্তি দিয়ে হযতো শেষ পর্যন্ত কোনও লাভ নেই, কারণ শাস্তির ভয় অপরাধ বোধ কমায় না! তা হলে আমরা কার কাছে যাব? তা ছাড়া সত্যিই তো, পুলিশের কাছ মেয়েরা যেতে চায় না একটাই কারণে, মেয়েদের মধ্যে সেই আস্থাটাই তো আপনাপা গড়তে পারেননি। বেশির ভাগ সময়েই থানায় গিয়ে মেয়েরা যে-ব্যবহার পান পুলিশ অফিসারের কাছে, সে তো সম্মানজনক নয়। কেন প্রত্যেক বার ভাল ব্যবহার পেতে গেলে পুলিশের উপর মহলে যেতে হবে? কেন নীচের মহলের অফিসারদের আপনারা আরও সচেতন ও সংবেদনশীল তৈরী করতে পারেন না? আমরা সহানুভূতি চাই না, সহানুভূতির সঙ্গে করুণার ব্যাপারটা কেমন ভাবে জড়িয়ে আছে। আমরা চাই সেই পুলিশ অফিসার, যিনি মেয়েদের সম্মান করেন এবং বুঝবেন এবং প্রথম থেকেই যে-মেয়েটি কোনও নালিশ নিয়ে গিয়েছে, তাকেই সন্দেহের চোখে দেখবেন না। সে মেয়ে যদি যৌনকর্মী হয়? "এমনকি একটি যৌনকর্মীকেও তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে রাস্তার মাঝখানে হাত ধরে টানার অধিকার নেই কোনও পুরুষের," তীব্র ভাবে বললেন অনন্যা।

বিতর্কসভার পরিচালক সুচিত্রা ভট্টাচার্য বির্তকের শুরু করেছিলেন যেন বড্ড নিচু পর্দায় ঃ আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের জোর করে ভোগ করাব ব্যাপার সেই পুরাকাল থেকেই তো আছে। এক ঘর লোকের সামনে দ্রৌপদীর শ্লীলতাহানি হয়েছিল। এক সময় কলকাতায় মেয়েরা অনেক রাত্তিরে সহজে চলাফেরা করতে পারত। কিন্তু ভোগবাদ আমাদের শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছে। কিছু মানুষের হাতে অনেক টাকা চলে এসেছে। টাকার সুবাদে তারা যা খুশি করছে। বিজ্ঞাপনী সিনেমায় মেয়েদের শরীর দেখানো হচ্ছে। সাংবাদিকতার মধ্যেও চটুলতা এসে গিয়েছে। এই সব কারণেই বোধ হয় মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়ছে। আরও যদি একটু দহন পাওয়া যেত সুচিত্রার মধ্যে।

স্ত্রী নীলাঞ্জনা ও সুচিত্রা ভট্টাচার্যের বক্তব্যের প্রায় তির্যক বিরোধিতা করে বললেন অর্জুন চক্রবর্তী ঃ এই আলোচনা করে কোনও লাভ হবে না। প্রথম থেকেই আমি কিন্তু নিরাশার কথা বলছি। আমাদের মধ্যে অনেক রকম যৌন অবদমন কাজ করে। অনেক অসন্তোষ আছে, আকাঙ্খা আছে, যেগুলো আমরা প্রকাশ করতে পারি না। কেউ ডিস্কোয় যাচ্ছে এই সমস্ত অবদমিত ইচ্ছের তাড়নায়, কেউ বা মেয়েদের বিরুদ্ধে নানা রকম অপরাধ করছে। সুতরাং খুব সহজ নয় এর সমাধান পাওয়া। আমাদের সামাজিক আবহাওয়া মধ্যেই এ-সব অপরাধের বীজ নিহিত।

পুলিশ কমিশনার সুজয় চক্রবর্তীর বক্তব্য ছিল ঃ আমাদের মূল্যবোধের সঙ্গে অনেক কিছু জড়িয়ে আছে। আমি এই শহরে বড় হয়েছি। কো-এডুকেশনল কলেজে পড়িনি, তবে

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি। আমাদের সহপাঠিনীই ছিল, অন্য কিছু হত না। এখন সেই মূল্যবোধ আর নেই। আমরা বড়জোর গাইতাম, 'মিলন, রাতি পোহাল,' এখনকার ছেলেমেয়েরা গাইছে পার্পল হেজ। ১৯৬০ সালে আমেরিকার কাউন্টার কালচার শুরু হয়। দু'ধরণের সাংবাদিকতা আছে, একটা আমেরিকান, একটা ব্রিটিশ। এক সময় ব্রিটিশ সাংবাদিকতা এদেশে চলত। ক্রাইমটা শুধু রিপোর্ট করা হত। এখন লেখা হয়, 'মৈত্রেয়ীর চোখের জল শুকোল না', এই ভাবে রং চড়িয়ে লেখা হয়। আমেরিকান প্রেস ইতালিয়ান মাফিয়া তৈরী করেছে। আমাদের সাংবাদিকতাও এই ভাবে অপরাধ তৈরী করছে। এছাড়া দেখবেন কিছু পুরুষ কানে দুল পরে, গায়ে উল্কি দিয়ে ঘুরছে।

.... আমরা যে সব সময় ওদের অপরাধ প্রমাণ করতে পারি, তা নয়, তবে এ-সব হল পাঙ্ক কালচার। ধরে পুরে দিচ্ছি। আবার দেখুন, কোনও মেয়ে যদি রাতে বাইকে করে উড়ো চুমু দিতে দিতে যায়, তার হাত ধরে যে টানতে নেই, সেটা অনেক পুরুষই জানে না। কারণ, তাদের সামাজিক শিক্ষা হয় নি। এদের সামাজিক শিক্ষা দিতে হবে। সেই শিক্ষা শুধু তো পুলিশ দেবে না, আমাদের সবাইকে, আপনাদেরও এগিয়ে আসতে হবে এই কাজের জন্য। তবেই হয়তো ...

এই 'হয়তো'-র আশাবাদ দিয়েই শেষ হল অগ্নিময় আলোচনাসভা।

সব চেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার পশ্চিমবঙ্গের পুলিশবাহিনীও আজ পার্টি ক্যাডারে পরিণত হয়েছে। লাল পার্টির ধ্বজা ধরে ওরা আজ যা খুশি করে বেড়াচ্ছে। জানুয়ারী (০১/০৩) মাসে পুলিশ পশ্চিম দিনাজপুরের এক গৃহবধূকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে এক দল পুলিশেব সামনে মহিলাকে নগ্ন হতে বাধ্য করে। নগ্ন হবার পর বলে, 'তুই'ত আর গৃহবধূ নোস। তোর'ত শ্লীলতাবোধ টুকুই নেই। পালুবনী নামে অন্য এক গ্রামের মহিলাকেও প্রায় নগ্ন অবস্থায় টানতে টানতে ভ্যানে তুলে নিচ্ছে, এই অবস্থাও অনেকে দেখেছে। কামতাপুর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকাব অভিযোগে এক পঞ্চদশী কিশোরীকে পুলিশ বলেছে — 'তুই ছেলে কি মেয়ে বোঝা যাচ্ছে না। পোশাকটা খুলে ফেল দেখি। দেখব পুরুষ না মেয়ে। এরা কি পুলিশ! সার্জেন্ট বাপি সেনকে খুন করল যারা তারাও'ত পুলিশ। পাঁচ জন কনস্টেবল কি করে এক যুবতীর পিছু ধাওয়া করে তাকে টানাটানি করে! এ-অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়েই সহকর্মীদের হাতে প্রাণ দিতে হল ৩২ বছরের যুবক বাপি সেনকে।

বইমেলার বিতর্ক সভায় বিতর্ক শুনতে শুনতে মনে পড়ে গেল ওভারল্যান্ড পত্রিকা কর্তৃক আয়োজিত এক বিতর্ক সভার কথা আজ থেকে এক যুগ আগে। তখনকার দিনের নামকরা নারীবাদীদের অনেকেই অংশ নিয়েছিলেন সেই বিতর্ক সভায়। তাদের বক্তব্য বিশদভাবে ধরে রেখেছিলাম ডায়েরীর পাতায়। এঁদের অনেকেই আর ইহজগতে নেই। এঁদের বক্তব্য আজ ইতিহাস মাত্র।

আশাপূর্ণা দেবী

সাম্প্রতিককালে প্রকাশ্য দিবালোকে যেভাবে মহিলারা নির্যাতিত হচ্ছেন তা ভাবতেও অবাক লাগছে। পঁচাশি বছর বয়সে পৌঁছেও আমি কোন কিছুই যেন মেলাতে পারছি না। চিন্তাই করা যায় না, নির্যাতিতাদের মধ্যে বয়স্কা মহিলারাও রয়েছেন। নারী নির্যাতন অতীতেও ছিল, কিন্তু বর্তমানে যখন আমরা নিজেদের সুসভ্য বলে দাবী করি তখন এধরণের ঘটনা দেখে লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায়।

বিজ্ঞানের দৌলতে বর্তমান পৃথিবীতে নানান ধরণের উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমরা আগের চেয়ে শিক্ষিত হয়েছি। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকেই যায় যে, আমরা কি প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে পেরেছি? প্রকৃত শিক্ষা মানুষের মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। অথচ চরিত্র গঠনের কোনও উদ্যোগ সাম্প্রতিককালে চোখে পড়ছে না। অন্যদিকে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার বোঝা ক্রমশ ছেলেমেয়েদের ওপর চেপে বসেছে। ছেলেমেয়েদের বইখাতার ওজন বাড়ছে কিন্তু জ্ঞানে গরিমায় তারা ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে।

বর্তমান সময়ের মেয়েরা আদালতে, বিমানে, অফিসে সর্বত্রই পুরুষের পাশাপাশি কাজ করছে। কিন্তু তারাও নিজেদের অধিকার, নিজেদেব সম্মান বজায় রাখতে পারছে না। এর জন্য কি তাদের কোন দায়িত্ব নেই? আমার মতে, অবশ্যই আছে। আমার কাছে মেয়েরা এসে জিজ্ঞেস করে, তারা সিঁদুর পরবে কি পরবে না? মেয়েরা স্বামীরর পদবী নেবে কি নেবে না ইত্যাদি। আমি তাঁদের বলেছি এই সমস্ত অসার ব্যাপার নিয়ে তোমরা কানাগলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন? এখন তোমাদের সামনে বিশাল পৃথিবী রয়েছে। আকাশ-পাতাল সবই তোমাদের হাতের কাছে এসে গেছে। অথচ তোমরা এই ছোট্ট জায়গাতেই পাক খাচ্ছ। মেয়েদের নিজস্ব যে চেতনা, যেটাকে নারীমুক্তি বলা হচ্ছে, সেটা যেন এখনও ফ্যাশানের খাতিরেই আছে, হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেনি। তাই খুঁজে মরছে কিসে মুক্তি? সংস্কার মুক্তি না পদবী মুক্তি? বা সিঁদুর মুক্তি ইত্যাদি। আর অন্যদিকে দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে নারী নির্যাতন।

একটা বিশেষ ঘটনা যখন সর্বাত্মকভাবে ঘটে, সমাজের ওপর তার ছায়া এসে পড়েই। এমনকি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রভাবও সমাজের ওপর এসে পড়ে। এখন এই সমস্ত মাধ্যমগুলি ব্যবসায়িক দিক থেকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কাজেই সমাজের ওপর তার প্রভাব পড়বেই।

আমাদের সমাজজীবনটিও তো অনেকটাই বদলে গেছে। মেয়েরা বা তরুণ বয়সের ছেলেমেয়েরা, যারা সিনেমার প্রধান দর্শক, তারা যদি পরম আগ্রহে কুরুচিপূর্ণ দৃশ্য দেখতে চায়, তাহলে তো ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ের স্বার্থে ওই ব্যাপারটাকে আরও এগিয়েই দেবেন। কিন্তু কাজটা তাঁরা খুব ভাল করছেন না। তারা নিজেদের আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি সমাজের কল্যাণের কথাটা যদি আংশিকভাবে অন্তত ভেবে দেখতেন, তাহলে অবশ্যই আমাদের মঙ্গল হতো। আর রাজনীতির অভিভাবকদের সম্বন্ধে একটু থেমেই কথা বলতে হয়। তারা দেশকে কোন্ পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, সেটাই আমাদের এখন চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্প, সংস্কৃতি, সিনেমা, সাহিত্য সব মিলে কতটুকু কি ক্ষতি করতে পারে? রাজনীতি তার চেয়ে অনেক বেশি পারে। কারণ, রাজনীতির ক্ষমতা অনেক বেশি। সত্যি কথা বলতে কি সম্প্রতি, আমাদের চারপাশে যে সব মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে সেগুলো ভীষণভাবে মুহ্যমান হয়ে থাকে আমাদের মনে।

আমি বলব, মেয়েরা রক্ষণশীল নয়, পুরুষেরাই বেশি রক্ষণশীল। মেয়েরা রক্ষণশীলতা ভাঙতেই চায়। কারণ, তারা অবরোধের মধ্যে থাকতে থাকতে বহু রকম জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করেছে। তাই আজ মেয়েরা সেই সমস্ত অবরোধের বেড়াগুলো ভেঙে দিতে চাইছে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পশ্চিমী হাওয়ার দাপট মেয়েদের মাধ্যমেই আমাদের দেশে বেশি মাত্রায় প্রবেশ করেছে। সমাজের চেহারাটা সব জায়গায় এক নয়। অনেক জায়গায় নারী নির্যাতনের ব্যাপারে মেয়েদের ভূমিকা প্রধান। আবার অনেক জায়গায় অন্য চেহারা। বিপরীত চিত্র।

তবে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি, এখনও হতাশায় ভেঙে পড়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। সমাজে এখনও শুভ শক্তির প্রভাব রয়েছে। তাই আমার মধ্যে এখনও একটা আশাবাদী মন রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, সমাজজীবনে শুভ শক্তি এবং অশুভ শক্তির লড়াই বরাবরই ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। লড়াইয়ে কখনও এক পক্ষ জিতে যায়, কখনও অন্যপক্ষ। এভাবেই চলতে থাকে সমাজ। তবে এটা ঠিক যে, সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত তো শুভ শক্তিরাই।

রাজনীতিতে অপরাধের অনুপ্রবেশ অন্যতম কারণ
গীতা মুখার্জী

মেয়েদের ওপর নির্যাতন যে ক্রমশ বেড়ে চলেছে একথা বোধহয় সকলেই স্বীকার করবেন। আমাদের পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েরা নির্যাতিত হবেন সে এমন আর্শ্চযের কথা নয়, যদিও কথাটা নিতান্ত দুঃখের। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় ৪৮ বছর পবে, সংবিধানে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার লিখিত হওয়ার এত বছর পরেও জীবনের কতকগুলি ক্ষেত্রে অন্তত নারী নির্যাতন কমছে না, বাড়ছে। এটা একেবারেই শোচনীয় ব্যাপার।

ভারতবর্ষের হিন্দিবলয় — যেখানে সমাজতন্ত্রের প্রভাব এখনও সর্বাধিক, নারী নির্যাতন সেখানে সমধিক একথা সবাই জানেন। কিন্তু সে সব জায়গাতেই এমন যে ধরণের প্রকাশ্য বীভৎসতা নিয়ে নারী নির্যাতন হচ্ছে তা একেবারে মধ্যযুগীয় বললেও অত্যুক্তি হবে না। সাম্প্রতিককালে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে কয়েকটি জায়গায় হরিজন মেয়েদের উলঙ্গ করে গ্রামের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া এরই একটা উৎকট নিদর্শন।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হিসাবে কয়েকবছর আগে পর্যন্ত আমরা গর্ববোধ করতাম যে, বীভৎস ধরণের নারী নির্যাতন এখানে হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গেও নিতান্ত লজ্জাজনক বেশকিছু ঘটনা কিছুকাল হল শোনা যাচ্ছে যা রামমোহন, বিদ্যাসাগরের দেশের মানুষ হিসাবে আমাদের লজ্জিত না করে পারে না। সমাজে নারীর মর্যাদা বাস্তবে অসম হওয়ার দরুন যত রকমের নির্যাতন তাকে সহ্য করতে হয়, সবই নারী নির্যাতনের পর্যায়ে পড়ে বলে আমি মনে করি।

এই নানাবিধ নির্যাতনের মধ্যে পড়ে পণপ্রথা। পণের জন্য বধূহত্যা, পরিবারের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন, অকারণে স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যাওয়া, ডাইনি প্রথা, যে মালিকের কাছে নারী শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন তাদের তরফ থেকে নানাবিধ নির্যাতন, যে অফিসে মহিলা কাজ করেন কখনও কখনও তার কর্তাদের তরফ থেকে অশোভন প্রস্তাব ও ব্যবহার।

এর মধ্যে কোনও কোনও ধরণের অত্যাচার আগের চেয়ে অনেক বাড়ছে, যেমন পণ প্রথার অত্যাচার ও বধূহত্যা প্রভৃতি। এই বিভিন্ন ধরণের অত্যাচারের পেছনে মূল কারণটাই নিশ্চয়ই সমাজে নারীর অসম পর্যাদা। কিন্তু তা ছাড়াও আরও কয়েকটি কারণ এখন এই অবস্থাকে আরও জটিল করে দিচ্ছে।

ধর্ষণ, বীভৎস ধরণের অশালীন ব্যবহার ইত্যাদি বেড়ে যাওয়ার তিনটি প্রত্যক্ষ কারণ স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে। তার একটি হল এই যে, বহু ভাল ভাল আইনকানুন সত্ত্বেও বহু জায়গায় পুলিশ প্রশাসন তা কার্যকর করতে এগিয়ে আসে না। অনেক জায়গায় এফ আই আর নিতেই চায় না। যদিও বা বহু কষ্টে এফ আই আর নেয়ানো গেল, তো দেখা যায় মামলাগুলিকে যতদিন সম্ভব

ঝুলিয়ে দেওয়া, যথাযথ সাক্ষ্যপ্রমাণ যাতে চেপে দেওয়া যায় তার চেষ্টা করা ইত্যাদি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না তা নয়। কিন্তু ব্যতিক্রমের সংখ্যা ঘটনার তুলনায় কম। স্বভাবতই এসব হয়ত প্রধাতন অপরাধীদের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার ভিত্তিতে এবং তা ছাড়াও সাধারণভাবে প্রশাসনিক শিথিলতার জন্য।

দ্বিতীয় কারণটি হল, রাজনৈতিকক্ষেত্রে অপরাধীদের অনুপ্রবেশ এবং অত্যাচারকারীদের রাজনৈতিক আশ্রয়দান। কম-বেশি পরিমাণে অনেক রাজনৈতিক দলেই এখন এ-প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এটা খুবই উদ্বেগের কথা। তৃতীয় কারণটি হল, অর্থনৈতিক দুরবস্থার দরুন অনেক ক্ষেত্রে মানুষের একাংশের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায়।

আশু কারণ এগুলি হলে স্বভাবতই এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াইও সেই অনুযায়ী করতে হবে। সমাজের সর্বোচ্চ স্তরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে, প্রশাসনের উচ্চস্তরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটা বিপুল লড়াই হলে তবেই পুলিশি প্রশাসনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিছুটা লড়া যায়। স্বভাবতই এই লড়াই খুব কঠিন। তথাপি পুলিশ প্রশাসনকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচল করতে হলে প্রশাসনের প্রতি স্তরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই একটা অবশ্য কর্তব্য। এ-বিষয়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলির দায়িত্ব সমধিক। কিন্তু সেই সঙ্গে এই ধরণের নির্যাতন হলে, যেখানে হলো সেই এলাকার মেয়েরা ও সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা একত্রিত হয়ে যদি তাৎক্ষনিক প্রতিবাদে মুখর হন, থানার ওপর চাপ রাখতে পারেন, তাহলে কিছু ফল হবেই না এমন নয়। তাই এই ধরণের সামাজিক হস্তক্ষেপেব ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য সামাজিক সচেতনতার সৃষ্টি এখন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলির পুলিশ প্রশাসনকে চাঙ্গা করতে হলে দুটি জিনিস করতেই হবে। একটি হলো প্রশাসনকে রাজনৈতিক স্বার্থে বিবেচনা না করে অপরাধীদের ধরার জন্য আইনকানুন চালু করার ক্ষেত্রে কোন রকম ভয় বা পক্ষপাত না দেখিয়ে কাজ করার জন্য উদ্দীপিত করা। রাজনৈতিক দলগুলি অপরাধীদের প্রশয় দেওয়া বন্ধ না করলে এ-কাজ করা অসম্ভব। অথচ তা করতে পারলে শেষ বিচারে সেই সব রাজনৈতিক দলের লাভই হবে। তা না হলে আপাতত ভোটের দিকে চেয়ে তারা যদি এ-বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বিরত হন তাহলে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যাবে।

আর একটি কথা এই সূত্রে বলা দরকার, যা কেবল ধর্ষণ প্রভৃতি অপরাধের ক্ষেত্রে নয়, নারীর প্রতি সব রকম অত্যাচারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তা হল এই যে, এই ধরণের অপরাধের ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলই বলুন, সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানই বলুন এবং সমাজের সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই বলুন তাঁদের একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। তা হল ক্ষুদ্র রাজনৈতিক বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে এ-বিষয়ে সকলকে কাজ করতে হবে। এই জিনিসটা বোধহয় সবচেয়ে বেশি দরকার। নারী নির্যাতনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় মনে হয় পণপ্রথা ও পণের জন্য বধূহত্যা।

পণপ্রথার অত্যাচার যে কত বেড়েছে, তা শহরে ও গ্রামে সর্বত্রই সুস্পষ্ট। ১৯৫৩ সাল থেকে আমি যখন মেদিনীপুরের গ্রামে কাজ করতে গিয়ে ওই জেলায় প্রায় একটানা দশ বছর ছিলাম, তখন দেখতাম এক গ্রামের মেয়ে দু'দিনের মধ্যে বৌ হয়ে অন্য গ্রামে চলে গেল। সঙ্গে নিল কেবল পরণের লালপাড় কোরা কাপড়, শাঁখা ও সিঁদুর। পণের দাবী আমি দেখিনি। আজ

যখন সেই সব গ্রামে যাই, তখন দেখি বরের মা-বাবা চাইছেন টেলিভিশন, মোটর সাইকেল। আর গহনা, খাট, বিছানা ইত্যাদি তো আছেই। ৪০ বছরে অগ্রগতির বদলে এই অধোগতি যে কতখানি বেদনাদায়ক তা বলার নয়।

অথচ কেন এমন হবে? একই লোকের তো ছেলে ও মেয়ে উভয়েই রয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই এক ব্যবহার করলে সব পরিবারই তো লাভবান হবেন। হচ্ছে কিন্তু ঠিক উল্টো।

এর একটা কারণ হলো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কনজিউমারিজিমের অনুপ্রবেশ। এটা চাই, ওটা চাইয়ের অনবরত খাঁকতি। এ-বিষয়ে শিক্ষিত লোকেরা কিন্তু অশিক্ষিতদের চেয়ে অনেক বেশি অপরাধী।

পণপ্রথা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এর অত্যাচারে বহু পরিবার সর্বস্বান্ত হচ্ছে। তাই এর বিরুদ্ধে একটা সামগ্রিক অভিযান গড়ে না তুললেই নয়।

গণচেতনা সৃষ্টির কাজে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও অন্যান্য মাস মিডিযারও একটা বড় ভূমিকা আছে বলে আমার মনে হয়। খববের কাগজেব ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা কথা প্রযোজ্য। তারা যদি সত্যিকারের ভূমিকা এ-বিষয়গুলিতে পালন করতে চান, তাহলে তাদের নিজ নিজ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে হবে। নইলে রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে ব্যাপক গণচেতনা তৈরি করার ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা নেওয়া কিন্তু কঠিন হবে। এছাড়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পণপথা-বিবোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করতে হবে।

সামগ্রিকভাবে নারীর প্রতি অত্যাচাবের মধ্যে কুসংস্কারেরও একটা ভূমিকা আছে। ডাইনিপ্রথা থেকে শুরু করে আরও অনেক প্রথার সঙ্গে তা জড়িত। তাই কুসংস্কারেব বিরুদ্ধে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার জন্যও একটা সর্বাত্মক প্রচারের প্রয়োজন।

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ করাও এ-রাজ্যে বিপজ্জনক
ইলা মিত্র

পশ্চিমবঙ্গে ইভটিজিং, পথপ্রথার অত্যাচার ও সাধারণভাবে নারী নির্যাতন নিয়ে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে। ওই প্রস্তাবের মধ্যে একটি জায়গায় মন্তব্য করা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের ঘটনা কমেছে। সংবাদপত্রে খবরটি দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। কারণ সেদিনই শহরের উপকণ্ঠে আগরপাড়ার চার দুষ্কৃতির হাতে প্রাণ হারালো জনৈক নিরাপত্তা রক্ষী। তার একমাত্র অপরাধ, তিনি দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে এক মহিলার ইজ্জত বাঁচাতে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁর প্রাণ দিতে হল। অর্থাৎ নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ করাও পশ্চিমবঙ্গে বিপজ্জনক।

বিধানসভায় পাস হওয়া প্রস্তাবের সঙ্গে আমি একমত নই। আমাদের দেশে প্রতি ৫৪ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হন। প্রতি দু'ঘন্টায় পণের জন্য একজন নারীকে হত্যা করা হয়। প্রতি ৪৩ মিনিটে একজন নারী অপহৃতা বা নিগৃহীতা হন। প্রতি ৫২ মিনিটে একটি করে ইভটিজিং-এর ঘটনা ঘটছে। ১৯৯১ সালের ইন্টারন্যাশানাল ক্রাইম রিসার্চ ব্যুরোর তথ্য থেকে উপরোক্ত তথ্যগুলি পাওয়া গেছে। সংখ্যাতীত ধর্ষণ, অসংখ্য নারী-নিগ্রহের খবর পুলিশ পর্যন্ত যায় না — অতএব তা ধরা হয় নি। বিরানব্বই সালের রিপোর্ট অনুযায়ী নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতায় মহারাষ্ট্র প্রথম

পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয়।

আমি বলবো, পশ্চিমবঙ্গে নারী-নিগ্রহের ঘটনা বাড়ছে। বধূহত্যার পেছনে শাশুড়ি ও ননদের যোগাযোগের ঘটনা অনেকক্ষেত্রে প্রমাণিত। কিন্তু এর পেছনে সমাজ-মানসিকতার ভূমিকাও বিশাল। জনৈক আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকাশ্য রাজপথে মারধর করে কাপড় খুলে নেওয়া এইজন্যই সম্ভব হয়, যেহেতু বহু পুরুষ ও রমণী সেটা দাঁড়িয়ে দেখে। কোথাও সেই নারী পুরুষরা ঝাঁপিয়ে পড়ে না, অথচ ডাকাতির ক্ষেত্রে ডাকাতকে পিটিয়ে মারতে দেখি। কারণ সমাজ-মানসে নারীর জন্য শ্রদ্ধাবোধ নেই।

ফুলবাগান থানায় নেহারবানুর ঘটনা নিয়ে অনেক হইচই হয়েছে। কিন্তু পরে সেই বস্তির মেয়েদের বলা হয়েছে, তাদের আর কেউ কাজ দেবে না। উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ ও মোরাদাবাদে দুটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। দু'জন হরিজন মেয়েকে উলঙ্গ করে গ্রামবাসীদের সামনে ঘোরানো হয়েছে। যুবকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে কিন্তু রমণীকে রক্ষা করার সাহস কেউ দেখায়নি।

১৯৯১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতন ও নিগ্রহ যথেষ্ট বাড়ছে। ১৫.৩.৯৪ তারিখে কলকাতার একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে, একজন ধর্ষিতা রমণী গ্রামপ্রধানের কাছে যান। প্রধান তাকে থানায় যেতে বলেন। কিন্তু থানায় ডাইরি নেওয়া হয় না। পরন্তু ও সি তাকে প্রধানের কাছে যেতে বলে। তাহলে এর প্রতিকার কোথায়? দায়ী কি শুধু রাজ্য সরকার? আলপনা নিগ্রহ দাঁড়িয়ে দেখলাম কিন্তু কিছু করলাম না। আমরাই মূল অপরাধী। সমাজসেবী মানুষ যদি সমাজসেবিকতা, মানবিকতা সব বিসর্জন দিয়ে বসে থাকে তবে নারী নির্যাতন বাড়বেই। প্রাচীন মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলছি। জাগ্রত জনমতই পারে পুলিশকে দিয়ে কাজ করানে আর পারে মৃতপ্রায় সমাজ বিবেককে জাগাতে। পারা দরকার — কেননা নারী নির্যাতন প্রত্যহের সংবাদ হয়ে উঠেছে। নারীর সম্মানরক্ষায় সমাজ না এগোলে নিগ্রহকারীরা দমিত হবে না।

মহিলা সংগঠনের সমস্ত প্রতিবাদ, দাবি ও অভিযোগকে পরোয়া না করে একের পর এক নারী নিগ্রহের ঘটনা ঘটে চলেছে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পরিণতিতে নারীর শ্লীলতাহানি হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দাঙ্গাকারীরা নারীকে বেছে নিচ্ছে নৃশংস পৈশাচিক উল্লাসের উপকরণ হিসাবে।

প্রগতিশীল পশ্চিমবঙ্গেও এই দুর্জনেরা চারিদিকে ঘুরছে। নারীর ওপর এখন যা চলছে তা দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার নয়। মেয়েদের পেটাতে ভালো লাগছে, বিবস্ত্র করতে ভালো লাগছে, শ্লীলতাহানি করতে ভালো লাগছে। সভ্য সমাজে এই ধরণের ঘটনা নারী সমাজের পক্ষে ভয়াবহ। গোটা দেশের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী পশ্চিমবঙ্গ আলাদা কিছু নয় তা প্রমাণিত হতে শুরু করেছে অনেক আগেই। আলপনার ঘটনার জের কাটতে না কাটতেই চন্ডীতলা লেনে অঞ্জনা রায়ের ঘটনা। পুলিশ এলো ঘটনার ছয়দিন পরে। শাস্তি না হওয়ায় এই অপরাধ চলবেই। ক'দিন আগে কান্দি শহরের কাছে এক মহিলা মেলা দেখতে গিয়ে গণধর্ষিতা হন। উত্তর কলকাতার নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীটের কলকাতা পুরসভার এক কর্মী চাকরী দেওয়ার নামে এক তরুণীকে ধর্ষণ করে। কয়েক দিন আগে শিলিগুড়ির রাণীডাঙাতে এক মহিলাকে তার সন্তানদের সামনেই ধর্ষণ করা হয়। ১৯৯০ সালে বানতলার ঘটনার অপরাধীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায় নি। এরপর থেকেই নারী-নিগ্রহকারীরা আরও উৎসাহ পেয়ে গেছে। মালদার মানিকচকের গদাইচরের মহিলাদের গণধর্ষণ করে, রাজ্য ফরেনসিক ল্যাবরেটরির এক মহিলাকর্মী বক্রেশ্বর তহবিলে চাঁদা দিতে না চাওয়ায়

তাঁকে যথেষ্ট প্রহার করা হয়। কিন্তু দুষ্কৃতীরা কোথাও শাস্তি পায় নি। মধ্য কলকাতার এক বার থেকে এক গায়িকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার ওপর অত্যাচার করা হয়। কিন্তু দুষ্কৃতিরা এখনও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রাজ্য মহিলা কমিশন রাজ্যে নারী নির্যাতন বাড়ছে বলে স্বীকার করেছে। এর কারণ অপরাধীদের গুরু পাপে লঘু দন্ড। মহিলাদের সার্বিক উন্নতির জন্য সভা সমিতি হলেও একটা ত্রুটি থেকেই যাচ্ছে। অর্থাৎ এ-ব্যাপারে মানুষের প্রগতিশীল চেতনা উদ্দীপ্ত হচ্ছে না।

আমরা চোখের সামনে যে কোন অত্যাচার দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। বিপন্ন নারীর আর্তনাদ আমাদের কানে পৌঁছয় না। তাই ন্যাশনাল ক্রাইম বোর্ডের রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠি না। ওই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, শুধু ১৯৯৩ সালে সাত হাজারের বেশি মহিলাসংক্রান্ত অপরাধ নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ধর্ষণ, অপহরণ, স্বামীর অত্যাচার ও পণজনিত বধূহত্যা। তার আগের বছর ১৯৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কাছে নথিভুক্ত ধর্ষণের অভিযোগ ৫৭৭, আর নথিভুক্ত নয় তার সংখ্যা শতগুণ।

পুরুষের স্বার্থেই নারীরা উৎপাদনশীল কাজের বাইরে

গৌতম রায়

মানবসমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। নিয়ত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক যুগের সোপান পেরিয়ে মানবসভ্যতা প্রবেশ করলো ঊনবিংশ শতাব্দীর ধনতন্ত্রের বিকাশের যুগে। ধনতন্ত্রের বিকাশের যুগেই দেখা দিল নবজাগরণের আলোকে যুক্তিবাদী চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারাই সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিল আনুষ্ঠানিকভাবে নারীর স্বাতন্ত্রকে। যদিও এই স্বীকৃতির কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর একটি বিখ্যাত উক্তি ঃ 'অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্তির সময় থেকে যেসব অসম্ভব ধ্যানধারণা আমাদের সময় পর্যন্ত চলে এসেছে, তার মধ্যে একটা হল এই যে, নারী যেন সমাজের সূচনা থেকেই পুরুষের দাস ছিল।' নবজাগরণ সম্পর্কে এঙ্গেলসের এই মূল্যায়ণটির কথা মনে রাখতেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি নবজাগরণের সীমাবদ্ধতাকে, সেই সঙ্গে নারী-আন্দোলনের আধুনিককালের গতিপ্রকৃতিকে।

প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজ ছিল মাতৃপ্রধান। সমাজের সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত ছিল নারীর কর্তৃত্ব। সেসময়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটেনি। মানুষ তখন দলবদ্ধ হয়ে বাস করতো। পরিবারপ্রথা তখনও চালু হয় নি। সুবিধা অনুযায়ী নারী-পুরুষের মধ্যে কাজ ভাগ করে নেওয়া হতো। সে-যুগে সমাজে নারীর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এর বড় কারণ অবশ্যই সামাজিক উৎপাদনের ওপর সে-যুগে নারীর কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা। এই প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজ ক্রমে বিবর্তিত হতে শুরু করল। মানুষ ক্রমেই কৃষিভিত্তিক উৎপাদন করতে শিখল এবং অর্থনীতির প্রচলিত নিয়মানুসারে উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই জড়ো হতে লাগল উদ্বৃত্ত সম্পদ। ক্রমেই এই সম্পদের মালিকানা ন্যস্ত হতে লাগল সমাজের পুরুষদের মধ্যেই একশ্রেণীর হাতে। এই সম্পদ তাদের কাছে জমা হতে থাকল ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে। অন্য পুরুষেরা সম্পদশালী মানুষদের ক্রীতদাসে পরিণত হল এবং এই সময় থেকেই নারীদের ঠেলে দেওয়া হল পুরুষদের অধীনে। পরিবারগুলির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হল কেবলমাত্র ঘরকন্নার কাজে। ক্রমেই তাদের সামাজিক উৎপাদনশীল কাজের আওতার বাইরে

ঠেলে দেওয়া হল। এভাবেই ক্রমশ শোধিত পুরুষদের সঙ্গে নারীর ভাগ্যও একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেল। অতি প্রাচীন যুগেই সমাজে ব্যক্তিগত সম্পদের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই সূচনা হল নারী-নির্যাতনের। এর ওপর প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উৎপত্তি নারীকে আরও অন্ধকারে ঠেলে দিল। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম সবই পুরুষ নিয়ন্ত্রিত। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে নারীর ঠাঁই হল সবার নিচে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রাচীন ইতিহাসে কুমারী বলির নামে নারী নির্যাতনের নজির ছড়িয়ে রয়েছে নানা ধর্মীয় এবং সামাজিক দলিলে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীশোষণই মানবসমাজে সূচনা করেছে নারী নির্যাতনের। যুগে যুগে এই নির্যাতনের গতি প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। পুরুষশাসিত ধনবাদী সমাজব্যবস্থা ক্রমেই নারীকে পরিণত করেছে কেবলমাত্র পণ্য হিসাবে। এই মানসিকতাই যুগ যুগ ধরে নানা প্রকারের ছলে বলে কৌশলে নারী নির্যাতন ঘটাচ্ছে।

সমাজের প্রতিটি স্তরে নারী নির্যাতন ঘটছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই নির্যাতন ঘটছে শারিরীকভাবে আবার অনেক ক্ষেত্রে এই নির্যাতন ঘটছে অর্থনৈতিকভাবে। ইটভাটা শিল্পে নারী শ্রমিকদের ওপর শারিরীক ও অর্থনৈতিক দু'ভাবেই নির্যাতন চলছে। এক্ষেত্রে তৃপ্তি মিত্রের 'অপরাজিতা' নাটকের একটি বিশেষ সংলাপের কথা খুব মনে পড়ছে। সেখানে বলা হচ্ছে, রাজ্য-ভাষা নির্বিশেষে ট্রেনে-বাসে মেয়েদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করা — এই ক্ষেত্রে সব রাজ্যের লোকেদেরই আশ্চর্যজনক মিল রয়েছে। ব্যঙ্গ করে তৃপ্তি মিত্র বলেছিলেন, এখানেই আমাদের জাতীয় সংহতি। বাস্তব ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে। ইভ টিজিং যেভাবে সমাজের প্রতিটি স্তরে চলছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।

কিছুদিন আগে সাংসদ গীতা মুখোপাধ্যায় অনুযোগের সুরে বলেছিলেন, খোদ পার্লামেন্টে মহিলা প্রতিনিধিদের ঠিকমতো গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং মহিলা প্রতিনিধিদের বক্তব্য প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে না। বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে এ-ধরণের অভিযোগও আমাদের শুনতে হয়। বামপন্থীরা দীর্ঘ ১৭ বছর রাজ্যে ক্ষমতাসীন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত তারা কোনও মহিলা প্রতিনিধিকে ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রী করেনি। এক্ষেত্রেও নারী অবহেলিত।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে চাই সামাজিক প্রতিরোধ

বিদ্যা মুন্সী

কলকাতা শহরে এবং পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক কয়েকটি নারী নির্যাতনের ঘটনা মহিলা আন্দোলনের কর্মীদের এবং সাধারণভাবে সকল মহলে ব্যাপক উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। সারা ভারতে নারী নির্যাতন যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার আওতা থেকে পশ্চিমবঙ্গ বাইরে থাকবে তা আশা করা অবাস্তব। কিন্তু প্রকাশ্য রাজপথে বড়তলা থানার সামান্য দূরত্বে এক মহিলাকে বিবস্ত্র করে ঘন্টা চারেক ধরে মারধর চলতে থাকবে এবং প্রতিবেশীরা ভয়ে মহিলার সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারবে না, পুলিশকেও খবর দেবে না — এটা শুধু লজ্জাজনক নয়, সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। এরকম আরও কিছু ঘটনার খবর আসছে, যা সত্যিই লজ্জার, দুঃখের। আমাদের পুরুষশাসিত সমাজে হাজার বছর ধরে নারীর ওপর বৈষম্য চলে আসছে। নারী নির্যাতন,

পণপ্রথা, বধূহত্যা ইত্যাদি সব ঘটনার পেছনে এই বৈষম্যই যে মূল কারণ তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু সাম্প্রতিক কালে মেয়েদের প্রতি অসম্মান ও অসাম্য আরও যেন বাড়ছে। পারিপার্শ্বিক নানা কারণ নানা দিক থেকে এতে উৎসাহ যোগাচ্ছে। অশালীন পোস্টার, বিজ্ঞাপন, চলচ্চিত্র ইত্যাদি বন্ধ করতে আইন থাকা সত্ত্বেও আইনের ফাঁক দিয়ে দূরদর্শনের বিজ্ঞাপনে ও তথাকথিত মনোরঞ্জক অনুষ্ঠানেব এমন সব দৃশ্য থাকছে, যাতে যুবমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটছে। এই নিয়ে সংসদ থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তবে প্রতিবাদ উঠেছে। ইতিমধ্যে যুবক ও তরুণদেরও মেয়েদের প্রতি আচাব-আচরণ তা প্রকাশ পাচ্ছে। তারা এই সব অনুষ্ঠান থেকে যা শিখছে, তাতে তাদেব মেয়েদের প্রতি সাধারণ সৌজন্য বোধটুকু থাকছে না। শিশুদের ওপরও এর প্রভাব পড়ছে। অন্যদিকে, সব সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মৌলবাদীদের নিজেদের ধর্মের ঐতিহ্য রক্ষার নামে মধ্যযুগীয় রীতিনীতি চালু কবছে। পারিবারিক সম্পর্কের নামে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা কায়েম করতে চাইছে। মেয়েদের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে উপদেশ দিচ্ছে।

প্রচারের মাধ্যমেই প্রতিরোধ গড়তে হবে

গীতা সেনগুপ্ত

কোনও একটি রাষ্ট্র বা সমাজের নৈতিক বা আত্মিক উন্নয়ন ও বিকাশের একটি মাপকাঠি হচ্ছে সেই সমাজে বা রাষ্ট্রে মেয়েদের অবস্থান এবং তাঁদের প্রতি সামাজিক মানসিকতার পর্যায় বা স্তর। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিককালে এ-রাজ্য সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নারী-নিগ্রহের যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে, সেটা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে এবং তা লজ্জা ও অগৌরবের বিষয়ও বটে। আর শুধু আমাদের দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক স্তরে সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও নারীর অবমাননা ও নিগ্রহের ঘটনা ক্রমবর্ধমান। বিভিন্ন মহল থেকে এ-নিয়ে নানা বাকবিতণ্ডা, নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা কার হচ্ছে। কিন্তু সেগুলি সমস্যার সমাধানে খুব একটা সাহায্য করতে পারছে না। প্রকৃতপক্ষে পারিবারিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই নারীর প্রতি যে বঞ্চনা ও বৈষম্যের মনোভাব দীর্ঘকাল ধরে প্রকট হয়ে চলেছে, তার উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে অবশ্যই দেখা যাবে এটি বর্তমান শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শ্রেণীবৈষম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মানসিকতারই অবদান বা কুফল। এই সমাজব্যবস্থায় সঙ্কটের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে সামাজিক ধ্যান ধারণা, মূল্যবোধ (Social Ethics) ইত্যাদি আজ অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। পৃথিবীজুড়ে আজ পুঁজির যে সঙ্কট শুরু হয়েছে তার কারণে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বেকারী বাড়ছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাচ্ছে। উন্নত ধনবাদী দেশগুলিও এর হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। স্বভাবতই এইসব দেশে মানুষের বিক্ষোভ বাড়ছে এবং তা সংগঠিত আন্দোলনের রূপ যাতে না নিতে পারে তারজন্য পৃথিবীজুড়ে ধনবাদী শিবিরের পক্ষে এক চক্রান্তের জাল বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাই নির্যাতনের উৎসভূমি

ডঃ সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রতিককালে নারী নির্যাতন অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে চলেছে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ

নেই। খবরের কাগজ খুললেই রোজ বধূহত্যা, ধর্ষণ, নিগ্রহ ইত্যাদির খবর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। খবরের কাগজ থেকে জানা গেল যে, চীন দেশে ইদানিংকালে কলকারখানার নারী শ্রমিকরা গর্ভবতী থাকাকালীন তার প্রাপ্য ছুটি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এমনকি চাকরী থেকেও বরখাস্ত হচ্ছে। নারী-শ্রমিকদের কম মাইনে দিচ্ছে এবং বেশি খাটিয়ে নিচ্ছে। একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ চীনের পক্ষে এটা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী ব্যাপার। আর পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষ করে ইউরোপ এবং আমেরিকায় নারীদের 'পণ্য' রূপেই দেখা যায় এবং দেখানো হচ্ছে। ফলে নারীরা প্রাপ্য মর্যাদা ন্যায্য অধিকারের জন্য ক্রমশ 'উইমেনস্ লিব'-এর আন্দোলনকে জোরদার করে তুলছে।

পাশ্চাত্যের 'কনজিওমারস্টিক' ভোগবাদী সমাজে নারীকে পণ্য এবং ভোগের সামগ্রী করে দেখায়। এই দ্যাখাটা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ফসল বলে মনে হলেও চীনের মতো সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সমান অধিকার কেন ব্যহত হয অথবা নারীর ন্যায্য মর্যাদা ও প্রাপ্য অধিকার কেন দূরাগত থাকে সেইটিই আমাদের কাছে বারবার প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়। একথা ঠিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যে সব জাতিগোষ্ঠী বা 'এথনিক গ্রুপ' পরিচালিত সেখানে ভূমির অধিকার মেয়েদের ওপরেই বর্তায। সেখানকার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাপনায় নারীর কতৃত্ব, প্রাধান্য ও অধিকার একান্তভাবেই দৃঢ়তার ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। আবাব পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত যেসব 'এথ্নিক গ্রুপ' সেখানে ব্যাপারটা একেবারেই উল্টো, পুরুষেরাই জমির অধিকারী, পারিবারিক সমাজজীবনের কর্তৃত্বের মূলে পুরুষ-প্রাধান্য — নারীরস্থান সেখানে দ্বিতীয় স্তরে।

তাই নারী-পুরুষের দ্বন্দের আসল কারণটি খুঁজতে হবে ওইখান থেকেই। জমির অধিকার, অর্থনৈতিক প্রাধান্য, পারিবারিক কর্তৃত্ব, পুত্র-কন্যার ওপর প্রাধান্য — এ সমস্ত নিয়েই যে প্রতিষ্ঠার লড়াই আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে, তার মাঝখান থেকেই আসল প্রশ্নের জবাব পেতে হবে। তাই যখন 'নারী নিগ্রহের' প্রশ্ন ওঠে, সেখানে পুরুষ নিগ্রহেব ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে রাখা যাবে না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যদি নারীদের ওপর অবিচার-অত্যাচার-নিগ্রহ-অন্যায় করার মূলে যেমন পুরুষ সক্রিয় ঠিক তেমনি মাতৃতান্ত্রিক জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে পুরুষের প্রতি নিগ্রহ কিছু কম দেখা যায় না।

বাংলা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে 'চাষ আর বাস'। কৃষিভিত্তিক সমাজজীবনে যেদিন থেকে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শিখেছে তখনই তার সঙ্গে জমির, মাটির সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরী হয়েছে এবং ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপারটা দেখা দিয়েছে। জমি চাষ, শত্রুর থেকে আত্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধি ইত্যাদির প্রয়োজনে, মেয়ের চেয়ে ছেলের কদর বেড়েছে। ছেলেরা আদর পেয়েছে, আর মেয়েরা নিগ্রহের শিকার হয়েছে। কৃষিভিত্তিক সমাজ জীবনে তাই ছেলের আদর আর মেয়ের অনাদর। প্রবচনে তাই বলা হয়েছে — 'পুতের মুতে কড়ি, মেয়ের গলায় দড়ি'। এমনকি কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত বলে গরুর ক্ষেত্রে মেয়ে গরু প্রার্থনা জানাচ্ছে আর বৌ-এর ক্ষেত্রে ব্যাটাছেলে কামনা করছে।

প্রবাদে বলা হচ্ছে 'গাইয়ের বেটি বইয়ের বেটা — তবে জানবে কপালে গোটা'। সুতরাং এই ভাবেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী নিগ্রহের বীজ বপন করা শুরু হয়েছিল কৃষির আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাকে সামনে রেখে, না-হলে এটাই বা বলা হবে কেন — 'মেয়েছেলে কাদার ঢেলা, ঝপাস করে জলে ফেলা।' এই প্রকার আর একটি 'মেয়ের নাম ফেলী, পরে নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি।'

ভারতবর্ষ বহুদিন ধরেই তার মিশ্র অর্থনীতির পথ বেয়ে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের ব্যাপারটিকে মর্যাদা দিয়ে আসছে। বৈদিকযুগ থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর নিজস্ব অধিকার স্বীকৃতই ছিল।

বিভিন্ন যুগে পুরুষশাসিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি নানাভাবে নারীর অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করেছে — শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সামাজিক মর্যাদাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে হরণ করা হয়েছে। কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল বাস্তবজগতে। কিন্তু ভাবের জগৎ সাহিত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীকে আদর্শ ভার্য্যা, স্নেহময়ী কন্যা, মমতাময়ী মাতারূপে চিত্রিত করা হয়েছে। আসলে বাইরের সম্পত্তিগত ব্যাপারে যতই লড়াই থাকুক না কেন গৃহস্থ-জীবনের পারিবারিক বৃত্তের মধ্যে নারীর মর্যাদার ক্ষেত্রে কিন্তু বহুদিন ধরে তৈরী হয়েছিল। তা না হলে সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে এই আদর্শের রূপগুলি ওইভাবে ফুটে উঠতে পারতো না।

কিন্তু পরবর্ত্তী ক্ষেত্রে হাজার বছরের পরাধীনতায়, ধর্মীয় বিপর্যয়ে, বিজাতীয় ভাবধারায় ভারতবর্ষীদের জীবনচর্চার ক্ষেত্রে যে সাংস্কৃতিক কর্মবৃত্তি এনে দিয়েছিল, সেখান থেকেই আবার শুরু হয়েছিল সতীদাহ, বহুবিবাহ, গৌরীদান ইত্যাদি নারী নিগ্রহের পাপ প্রচেষ্টাগুলি। উনিশ শতকের আধুনিক শিক্ষা নারী মর্যাদাবৃদ্ধির সহায়ক হলেও বিংশ শতকের প্রথম চার দশকে দেশ মাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে নারীর যোগ্য ভূমিকা নির্ণীত হলেও, স্বাধীনতার পরবর্ত্তী দশক থেকেই রাজনীতির নাম করে যে পার্টিবাজি-গোষ্ঠীদ্বন্দ-অর্থনৈতিক শোষণ শুরু হয়েছিল দ্রুত তালে। তারই ফসল আজকের সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে নারী নিগ্রহের বীভৎসতা। ব্যক্তিজীবনে অতিরিক্ত লোভ এবং লালসা, পারিবারিক জীবনে স্বার্থপর অর্থগৃধ্নতা, সমাজজীবনে মায়া-মমতাহীন আত্মকেন্দ্রীক বিচ্ছিন্ন মনোভাব, রাষ্ট্রজীবনে আত্মম্ভরী উদ্দেশ্যহীন আদর্শহীন নেতৃত্ব, রাজনৈতিক জীবনে ভন্ডামি আত্মসর্বস্ব মস্তানকেন্দ্রিক ব্যাভিচারী মনোবৃত্তি — আজ সামগ্রিভাবে নারীর মান-মর্যাদা-সম্ভ্রম সতীত্বকে ধুলায় মিশিয়ে দিচ্ছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উপগ্রহ-কালচারের এক বিস্ময়কর ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনের প্রচন্ড তান্ডব। সহস্র বছরের পরাধীনতা যেখানে আমাদের সংস্কৃতির মূলে কোন রকম কুঠারঘাত করতে পারেনি, শত আঘাতে ও অত্যাচারে আমাদের পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনে নারীর মান-মর্যাদা-সম্ভ্রম ও কৌলিন্য অন্তত খানিকটা বজায় রেখে চলছিল, আজ তার মূলেই কুঠারাঘাত শুরু হয়েছে। আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির মূলচ্ছেদ হবে। ঐতিহ্যের (ভারতীয় ধারায় মাতৃত্বের ইমেজ) মহীরুহটি ধূলিসাৎ হয়ে যে 'ভ্যালুস্' গুলি ক্ষয় হতে হতে তলানিতে এসে ঠেকেছিল তা কিন্তু একইসঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। আর তখনই হয়তো শুরু হবে আগামী দিনের নারী নিগ্রহের আরও এক জঘন্যতম বীভৎসতম অধ্যায়। তখন নারী হয়ে উঠবে শুধুই পণ্য।

অসুস্থ সমাজে নারীকে সুস্থ রাখা যায় না

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

প্রভাতী সংবাদপত্রগুলিতে প্রতিদিনই নারী নির্যাতনের সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। এ যেন রুটিমাফিক ব্যাপার। ক্রমাগত এসব খবর প্রকাশিত হওয়ায় এই ধরণের খবরের গুরুত্ব হ্রাস

পাচ্ছে। অনেকটা গা-সওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই নারী নির্যাতনের ঘটনায় আজ আর তেমন প্রতিক্রিয়া নজরে আসছে না। অবশ্য নারীর অধিকার নিয়ে, নারী স্বাধীনতা নিয়ে কিছু কিছু আন্দোলন হচ্ছে। কিন্তু আসল ঘটনা হল, নারীবাদীগণ যখন অধিকার নিয়ে তীব্র চীৎকার করছেন তখন তাঁরা শুধু 'অধিকার'-এর আকাঙ্ক্ষায় ডুবে থাকছেন, সামনে কোনও স্থির লক্ষ্য নেই। নারীবাদীগণ প্রতিবাদী হলেও সমাজের প্রেক্ষাপটে তার প্রতিফলন ও তার প্রতিসরণের দিকে লক্ষ্য তেমন নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে সমগ্র বিশ্বজুড়ে আজ নানাভাবে নারী নির্যাতন চলছে। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে। সারা বিশ্ব জুড়ে হিংসার উম্মত্ততা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সংবাদপত্রে শুধু ভারত নয়, সমগ্র ইউরোপের, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ আজ অন্তঃকলহে মত্ত। রাজনীতিকগণ কলহে শুধু ব্যস্ত বলে দেশ গঠনের কাজ, নাগরিক তৈরীর কাজ পিছিয়ে পড়ছে। আজকাল নাগরিক তৈরী হচ্ছে না। মানুষরূপী যন্ত্র তৈরী হচ্ছে। মানসিক প্রতিবন্ধীতে দেশ ছেয়ে গেছে। নারীসমাজেই শুধু তার প্রতিফলন পড়ছে না, সমাজজীবনের সব ক্ষেত্রেই এর প্রতিফলন ঘটছে। সমগ্র দেশ যখন অসুস্থ, তখন নারীকে কি পৃথকভাবে সুস্থ রাখা যায়? নারীও আজ কিন্তু অসুস্থ। নারীর মমতাময়ীরূপ আজকাল ক'জনার মধ্যে দেখা যায়? নারী অধিকার বলে কিছু চাইছে কিন্তু অন্তরে ও নারী পরিবর্তিত হয়ে বিধ্বংসী খেলায় কি মেতে ওঠে না? দায়িত্ব ও অধিকার পরস্পর জড়িত। নারী নির্যাতন হচ্ছে তার জন্য কি অন্যেরাই দায়ী? এক্ষেত্রে দায়ী নয় নারী? মানতে একটু কষ্ট হয় বইকি। নারী সমানভাবে বা খুব সূক্ষ্ম ও কূট উপায়ে অন্য নারীকে বেশি যন্ত্রণা দেয়। যে যন্ত্রণা দিচ্ছে এবং যে যন্ত্রণা ভোগ করছে এদের কোন্ 'নারী' স্তরে উপনীত করা হবে? এক্ষেত্রে নারীদের নতুন কিছু ভাবতে হবে।

পুরুষ যেমন নারী-নিগ্রহ করে, নারীও তেমনি নারী-নিগ্রহ করে। আলপনা ব্যানার্জীরা শারীরিকভাবে নিগৃহিত হন — অন্যদিকে মানসিক নিগ্রহের খবর ক'টা চোখে পড়ে। এক্ষেত্রে নারী কিন্তু পুরুষের থেকে অনেক এগিয়ে। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে, সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নারী কি শারীরিক নিগ্রহকে উস্কিয়ে দেয় না? বিজ্ঞাপনের নারী মডেলাররা যদি এককাট্টা হয়ে অশ্লীল বিজ্ঞাপনের উপাদান না হন, তবে কি তাদের প্রাচীনপন্থীর খাতায় নাম লেখানোর ভয় জন্মাবে? বিজ্ঞাপনে অধিকাংশের কোন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে না। অকারণে, অপব্যবহৃত হচ্ছে নারী — নারীরা কি বোঝেন না?

ইদানিং দূরদর্শনের সর্বগ্রাসীরূপ আমাদের অজান্তেই ঘরকুনো, স্বার্থপর, আত্মমগ্নতাকে ঢেকে দিচ্ছে। সমাজের কিয়দংশ অতিরিক্ত যৌনদৃশ্য সংবলিত নাচগানের অ্যাডিকশনে ভুগছে। অন্যপক্ষে, মেয়েরা এই সমাজের অধিকাংশই কেরিয়ার সচেতন যতটা হচ্ছে, ততটা সমাজমনস্ক হচ্ছে না। কেরিয়ার গড়ার সাথে সমাজ-মনস্কতার বিরোধ থাকতে পারে না। যে সমাজ পচে গলে যাচ্ছে সেই সমাজে বড় বড় কেরিয়ার সচেতন লোক কোন কাজে আসবে? স্বার্থপরতা যেখানে প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে প্রভাবিত হচ্ছে।

বানতলার নারী নির্যাতনের তীব্রতা থিতিয়ে গেছে। এখন প্রতিদিন রোমহর্ষক সব ব্যাপার ঘটছে। মানুষ পশুস্তরে উপনীত হয়ে পেশী শক্তিকে মস্তিষ্ক-র ওপরে স্থান দিচ্ছে। একে অন্যের সমস্যা মন দিয়ে শুনছে না, সমাধানের পথ নেই, কেবল খোলা রয়েছে নির্যাতনের পথ। সমস্যার চাপে যুবসমাজও যেন বিভ্রান্ত, বিহ্বল। তাই নারী নির্যাতনের সংবাদেও তারা বিদ্রোহ করে না।

বরং হতাশাই যুবসমাজকে যেন গ্রাস করছে। এরই পরিণতিতে নানা রকম অসামাজিক কাজ। তাছাড়া ভোগবাদী সমাজে মানবিক মূল্যবোধেরও অবক্ষয় ঘটেছে। এই মূল্যবোধের অবক্ষয়ই নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। এ-কাজে নারী এবং পুরুষের উভয়ই সমানভাবে দায়ী। নির্যাতনের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা মোটেই কম নয়।

একসঙ্গে রুখে দাঁড়াতে হবে মেয়েদেরই

অমলা শংকর

একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় পৌঁছে ভাবতেই পারছি না যে, কলকাতার মতো একটি শহরের জনাকীর্ণ রাজপথে দাঁড়িয়ে হাতে গোণা কিছু দুষ্কৃতি একজন মহিলার ওপর নির্যাতন চালানোর সাহস পায়। প্রতিবাদ করতে কেউ এগিয়ে আসেন না। সাধারণভাবে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোটাই যুবধর্ম। সেই যুবকরাও গর্জে ওঠা তো দূরের কথা, সামান্যতম প্রতিবাদটুকুও করেনি। আবার ভাবতে অবাক লাগে, মেয়েরাও এই ধরণের নির্যাতন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে না। অতীতে একসময় মেয়েদের পুরোপুরি পণ্য মনে করা হতো। তখন যেন-তেন-প্রকাবে তাঁদের বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটাই ছিল বাবা-মায়ের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু এখন নিশ্চয়ই সে কথা কেউ বলতে সাহস করবেন না। প্রায় প্রতিটি পরিবারে, বাবা-মায়েরা তাঁদের সন্তানদের সাধ্যমতো শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকেন। তাহলে কি ওই শিক্ষার কোনও প্রতিফলন আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে না। বাস্তবে সত্যি কিন্তু সেটাই। তবে কি এই শিক্ষা ব্যবস্থার দৌলতে ডিগ্রি, ডিপ্লোমার বহর যত বাড়ছে আমাদের মানসিকতা ততই কদর্য রূপ ধারণ করছে।

যাঁরা দেশের শাসনব্যবস্থার ধারক-বাহক, তাঁরাও এই অবস্থার জন্য কম দায়ী নন। ঘরে ঘরে দূরদর্শনের মাধ্যমে আনন্দানুষ্ঠানের নামে যেভাবে অশ্লীলতার 'প্যারেড' করানো হচ্ছে, তার দায়ভার সমাজপতিদের ওপর বর্তায়। এখন আমাদের দেশে শিল্পকলার নামে যা চলছে তাকে শিল্প হিসেবে মেনে নেওয়া কঠিন। বহুক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটে থাকে যাকে কে বা কারা শিল্পকলা বলতে সচেষ্ট হবেন জানি না — কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে আমি কোনও অবস্থাতেই এই ধরণের নোংরামিকে সমর্থন করবো না। কারণ, মূল্যবোধের অবক্ষয়ে যা ক্ষয়প্রাপ্ত তা কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, সমাজ-জীবনের বহুক্ষেত্রে মূল্যবোধের যে অবক্ষয় এসেছে নির্যাতনকারীরা তারই ফসল। ফসল না বলে আগাছা বলাই ভাল। যাা নারী নির্যাতনের মতো জঘন্য অপরাধের কাজে লিপ্ত থাকে তাদের মধ্যে কি রক্ত-মাংসের অস্তিত্ব রয়েছে! বোধহয় না। তাদের মধ্যে কি মনুষ্যসুলভ বোধ রয়েছে? বোধ করি তাও নেই। থাকলে আর যা-ই হোক প্রকাশ্য দিবালোকে দিনের পর দিন এই ধরণের জঘন্য অপরাধ করতে পারতো না। কিন্তু এর চেয়েও ভাবতে কষ্ট হয় যে, এই সব দুষ্কৃতীরা একের পর এক ঘটনা ঘটাচ্ছে অথচ যতটা প্রতিরোধ আসার কথা ততটা আসছে না। দুষ্কৃতীরা যেন সমাজটাকে নিজেদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত করে নিচ্ছে।

আসল ব্যাপারটা হল, সমাজে এখন রক্ষকরাই ভক্ষক হয়ে উঠেছে। আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই, কেউ তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মদত না পেলে অন্যায় করার সাহস পেতে পারে। কিন্তু অপরাধীরা অন্যায় করে যাবে আর আমরা চিরকাল হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব, তা তো হতে

পারে না। ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, মেয়েরা বারবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে, নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তাই অন্য কেউ, অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবে এই ভরসা না করে মেয়েদেরই ঐক্যবদ্ধভাবে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, দুষ্কৃতীরা মানসিকভাবে দুর্বল হয়। তাই মেয়েরা যদি একজোট হয়ে রুখে দাঁড়ান, তাহলে এই ধরণের অন্যায়ের প্রতিকার করার ক্ষেত্রে সমাজকে বিব্রত হতে হবে না। এভাবে প্রতিরোধ গড়ে উঠলে যাদের মদতে সমাজবিরোধীরা প্রশ্রয় পাচ্ছে তারাও সতর্ক হয়ে যাবে। তারাও আর এই ধরণের অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়ার কিংবা দুষ্কৃতীদের লালনপালন করার সাহস পাবে না।

নারী আন্দোলন নারী মুক্তির আন্দোলন নয়

সুজাতা দে (বসু)

একবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যে সমস্যাগুলো আমাদের বিশেষভাবে চিন্তান্বিত করে তুলেছে তার মধ্যে অন্যতম হল নারী-সমস্যা। এই সমস্যার সঙ্গে জড়িত হয়ে বযেছে নারী নির্যাতনের প্রশ্ন। নারী-সমস্যা শুধু নারীদের সমস্যা নয়, এটা একটা সামাজিক সমস্যা, সামাজিক উন্নয়ন, অগ্রগতি ও পরিবর্তনের পথে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এ-সমস্যার প্রেক্ষাপট শুধু ভারতবর্ষ নয়, এ-সমস্যার প্রেক্ষাপচ সারা বিশ্ব। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ থেকে শুরু করে ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশে সর্বত্রই নারীরা অবহেলিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত। অবশ্য সমস্যার মাত্রায় বিভিন্নতা রয়েছে, বিভিন্নতা রয়েছে নারী-নিগ্রহের বাস্তব প্রকাশে।

উন্নত দেশগুলিতে যেখানে সাক্ষরতা ৯৫ শতাংশের অধিক, মেয়েদের গৃহে অবরোধের প্রথা যেখানে নেই, সমাজও বহুলাংশে কুসংস্কারমুক্ত। সেখানে যখন নারী-স্বাধীনতার অস্তিত্ব শুধুমাত্র তত্ত্বগত তখন অশিক্ষা, কুসংস্কাব, দারিদ্র্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নারীর পদমর্যাদা যে ধূলায় লুণ্ঠিত, তা বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

ভারতীয় সমাজে নারীরা সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক সমস্ত দিক থেকে বৈষম্যের শিকার। পারিবারিক ক্ষেত্রে কন্যাসন্তান একটি বোঝা বিশেষ। দক্ষিণ ভারতের কোনও কোনও গ্রামাঞ্চলে কন্যাসন্তান হত্যা এখনও প্রচলিত রয়েছে। হাজাব হাজার টাকা পণ দিয়ে বিবাহদানে অসমর্থ দরিদ্র, অশিক্ষিত পিতা কন্যাসন্তান হত্যার মধ্যে দিয়েই খুঁজে নিয়েছে এই সমস্যার সমাধান। অন্যদিকে ধনী মহিলারা কন্যা ভ্রূণ হত্যায় মেতে উঠেছেন ভবিষ্যত কন্যাদায় এড়াবার জন্য।

কন্যাসন্তানের জন্ম অধিকাংশ পিতামাতাকে সুখী করে না। ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত অবহেলায় এক বিরাট সংখ্যক শিশুকন্যার মৃত্যু ঘটে। দরিদ্র পবিবারগুলিতে পুষ্টি, শিক্ষার সুযোগ সুবিধা সবই পুত্রসন্তানের জন্য সংরক্ষিত থাকে। ধনী পরিবারে এসব সুযোগ সুবিধা কন্যাসন্তান লাভ করে কিন্তু তাকে বড় করে তোলা হয় পুত্রসন্তানের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। পুরুষের মনোরঞ্জনে সে কতটা সক্ষম সেটাই হল তার উপযুক্ততার মাপকাঠি। মেয়েরা নিজেরাও আত্মনির্ভরশীলতা লাভের মনোভাব নিয়ে বড় হয়ে ওঠে না।

গ্রামাঞ্চলে ১৮ বছরের নিচে বালিকাদের বিবাহদান নারী নির্যাতনের একটি রূপ বলা যেতে পারে। এর ফলে অনেক বালিকা অনিচ্ছাকৃত মাতৃত্বের বোঝা বহন করতে না পেরে অকালে

মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পারিবারিক নারী নির্যাতনের কদর্য রূপ হল বধূ নির্যাতন, বধূহত্যা। বধূ নির্যাতনে প্রথম স্থান অধিকার করে রয়েছে বিহার, তার পরের স্থান কেরল ও মধ্যপ্রদেশের। বধূ নির্যাতন ও বধূহত্যার অধিকাংশ ঘটনাগুলিই জড়িত হয়ে রয়েছে পণপ্রথার সঙ্গে। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে পণ সংক্রান্ত বধূহত্যার সংখ্যা ১৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি ১ ঘন্টা ৪২ মিনিটে একটি পণঘটিত বধূহত্যার ঘটনা ঘটছে। অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ মৃত্যুহারের সবচেয়ে অধিক বৃদ্ধি ঘটেছে ওড়িশায়। তার পরবর্তী স্থানে হিমাচলপ্রদেশ, কেরল, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি সব রাজ্যগুলোতেই রয়েছে। ১৯৬১ সালে পণপ্রথা-বিরোধী আইন প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও কুশিক্ষা, আত্মমর্যাদাবোধের অভাব, পরধন অপহরণের নির্লজ্জ প্রয়াস আমাদের এই দূষিত আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে দিচ্ছে না।

১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে মহিলাদের ওপর সর্বপ্রকার অত্যাচার ৩৭.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই মোট অপরাধের ৬৮.৩ শতাংশ ঘটেছে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান ও দিল্লীতে। ভারতে প্রতি ৫৪ মিনিটে একটি ধর্ষণ, ২৬ মিনিটে একটি শ্লীলতাহানি, ২৩ মিনিটে একটি নিষ্ঠুরতা সংঘটিত হচ্ছে। ১৯৯৩ সালে সারা ভারতে ৬০৭১১ টি নারীঘটিত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। তার মধ্যে ধর্ষণ, অপহরণ, স্বামীর অত্যাচার, পণের জন্য পুড়িয়ে মারা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্র অপরাধ তালিকার সর্বশীর্ষে, এরপরেই উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের স্থান। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী গতবছর উত্তরপ্রদেশে শুধুমাত্র পণপ্রথার শিকার হয়েছে ১৫৬৩ জন মহিলা, মধ্যপ্রদেশে ২০৫৬ জন ধর্ষিত হয়েছেন। দিল্লিতে গত তিন বছরে ৭০০০ নারীঘটিত অপারাধ নথিভুক্ত করা হয়। এই শহরে ধর্ষণের ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৩ সালে ১৯৮১টি নারী ঘটিত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।

সামাজিক অবক্ষয় সর্বপ্রকার অপরাধ বৃদ্ধির কারণ কিন্তু নারীঘটিত অপরাধবৃদ্ধির মূল আরও অনেক গভীরে। নারীর সামাজিক নিম্ন পদমর্যাদা, শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ত্রুটিযুক্ত করে রেখেছে। নারী যতদিন না অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর হতে পারবে ততদিন তার প্রকৃত স্বাধীনতা আসতে পারে না। সমস্ত উন্নত, স্বল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে নারীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে, পণ্য হিসেবে দেখা হয়। তারই প্রকাশ আমরা দেখি সিনেমা, টিভি, পত্রপত্রিকায়, সাহিত্যে এবং নারীদেহের বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রদর্শনে। আমাদের সমাজও নারীকে এভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে এই চিরাচরিত চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন।

আধুনিক নারী আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রেই রূপ নিচ্ছে নারীবাদী আন্দোলনে, নারীমুক্তির আন্দোলনে নয়। নারীবাদী আন্দোলনের প্রবক্তারা নারী স্বাধীনতা বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা তাদের নিজেদের কাছেই স্পষ্ট নয়। তাই তাদের সংগ্রাম মূলত পুরুষের বিরুদ্ধে। তাদের সংগ্রাম স্বাধিকার অর্জনের মাধ্যমে আত্মমর্যাদাবোধের প্রতিষ্ঠা নয়, তাদের সংগ্রাম পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনকে অস্বীকার করে এক স্বৈরাচারী জীবন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। পাশ্চাত্যের ধনী দেশগুলিতে নারীবাদ এক সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে তুলেছে। বিবাহ বন্ধনের দুই শরিকের সমমর্যাদা, সম অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হয়ে বিবাহ বন্ধনকে অস্বীকার করার ফলে এক নৈরাজ্যের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, পারিবারিক

পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে, গৃহহীন অনাথ শিশুদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাবৃদ্ধি চিন্তিত করে তুলেছে সমাজবিদ ও রাষ্ট্রনায়কদের। অসামাজিক কার্যকলাপ ও অপরাধ প্রবণতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এই নারীবাদের ঢেউ ভারতের সমাজজীবনকে স্পর্শ করতে শুরু করেছে। এ-আন্দোলন যে সঠিক পথের নিশানা দেয়নি তার প্রমাণ মেলে নারী নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান পরিসংখ্যান থেকে।

পশুরাও প্রবৃত্তিজাত আচরণে অনেক শালীন

দীপালি দে সরকার

প্রতিনিয়ত নারী নির্যাতনের ঘটনা রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে। নির্যাতনের সীমা-পরিসীমা নেই। আমরা শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে জীবনচর্চার ও সাধনার সমুদ্র মন্থন করে এই গরল তুলেছি ও তুলছি প্রতিদিন। আমরা অমানবিক আচরণ করলে অনেক সময় নিজেদের পশু পদবাচ্য করি। সত্যিই কি আমরা পশুদেরও যোগ্য? পশুপাখিদের ভেতরেও নারী-পুরুষ আছে। কিন্তু তারাও প্রবৃত্তিজাত আচরণে অনেক শালীন।

যাই হোক, এখন আমাদের দেখতে হবে নারী নির্যাতনের কারণগুলো কী? দেখা গেছে, নারী নির্যাতনের পেছনে বহু কারণ জড়িয়ে আছে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, নারীর দেহ পুরুষের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। তাই সে যে কোনওভাবে নারীকে কাছে পেতে চায়। তাই কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়েই ভুলেই যায় নারীর নিজের শরীরের ওপর নারীর নিজেরও অধিকার আছে।

প্রকৃতিই নারীর দেহকে অরক্ষিতভাবে গঠন করেছে। ইচ্ছে করলেই পুরুষ জোর করে নিজের প্রবৃত্তিজাত চাহিদা পূরণ করতে পারে। তাছাড়া, দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে পুরুষ অনেক বলবান।

নারী-পুরুষ সমান নয়। থাকা, খাওয়া, শিক্ষা, যত্ন — এসবে পুরুষেরই অগ্রাধিকার, নারীর নয় — এই ধরণের অসম মানসিকতা মাতৃকোল থেকে গড়ে ওঠে।

নারী যা করবে পুরুষ তা করবে না, কিংবা পুরুষ যা করবে নারী তা করবে না — এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি এখনও পরিবার আঁকড়ে ধরে আছে। নারী ও পুরুষ উভয়েই উভয়ের পরিপূরক। এই ধরণে চিন্তাভাবনার আজও অভাব।

নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই এবং থাকলেও বর্তমানে সেই স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ নেই। পুরুষের অধীন থাকায় সেই অর্থ ভোগ করার সুযোগ নারীকে দেওয়া হয় না। কেউ কেউ স্বোপার্জিত অর্থ ভোগের চেষ্টা করলে নির্যাতন করা হয়। তার মধ্যে মানসিক নির্যাতন অন্যতম।

পরিবার, সমাজ, আইন-আদালত, প্রশাসন নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় আগ্রহী নয়। নারী নির্যাতনকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয় না।

পণপ্রথার জন্য পুরুষরা নয়, নারীরা নিজেরাই দায়ী। এক্ষেত্রে যারা নির্যাতন করে তারা শাশুড়ি, ননদ কিংবা জা। এখন তো আবার বধূরাও শাশুড়ি নির্যাতন করছে। সবাই কিন্তু নারী। পুরুষরা নারীর কোলেই মানুষ হয়। তাই পুরুষকে অমানুষ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নারীর এড়িয়ে যেতে পারেন না। শ্বশুর কিংবা স্বামী কিংবা পরিবারের অন্য পুরুষ সদস্যরা যাঁরা থাকেন তাঁরা যদি নির্যাতন চালাতে চান তাহলে এই সব নারীরাই কিন্তু রুখে দিতে পারেন। বাস্তবে ত হচ্ছে না। চলচ্চিত্র নারী নির্যাতনের জন্য বহুলাংশে দায়ী। দূরদর্শনে নানা অনুষ্ঠান, বিশেষ করে চলচ্চিত্র বা চিত্রগীত।

নারীরা নিজেদের পুরুষের ভোগ্যসামগ্রী বলে মনে করে। মনে করে সেবাদাসী, আজও। আজও নারীরা পছন্দমত কিংবা কাজ চলার মতো দরদাম পেলে নিজেকে বিকিয়ে দেয়। সিনেমা, বিজ্ঞাপন, মডেল ইত্যাদিতে কর্মগ্রহণ সেই মানসিকতার পরিচয় বহন করে। দেহকে আবৃত রেখেও এই কাজ করা যায়। নির্যাতনের নানা কারণের পাশাপাশি প্রতিকারের কিছু পথও খুঁজে বার করতে হবে। প্রথমত, নারীদেহ পুরুষের কাছে আকর্ষণীয় বলেই পুরুষকেই নারীদেহের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। পুরুষের জীবনে নারীর প্রয়োজন আছে, এটা মেনেই রামকৃষ্ণ সারদাকে বিবাহ করেছিলেন। বিবেকানন্দ মার্গারেট নোবেলকে ভগিনী নিবেদিতায় রূপান্তরিত করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, প্রকৃতিগতভাবে গঠিত নারীদেহ সম্পর্কে একটাই বক্তব্য, নারী নিজের দেহ নিজে রক্ষা করার সব রকম ব্যবস্থা নেবে। এরপর, নারীর শরীরের ওপর অধিকার পিতার এবং স্বামীর। জন্মদাতা হিসেবে পিতা এবং নারীদেহ ভোগ করার অধিকার হিসেবে স্বামী সব রকম আক্রমণ থেকে নারীকে রক্ষা করবেন।

তৃতীয়ত, পরিবার, সমাজ, আইন-আদালত এবং প্রশাসনকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে নারী নির্যাতন বন্ধ করার জন্য। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

চতুর্থত, মাতৃকোল থেকেই শেখাতে হবে নারী-পুরুষ উভয়ের পরিপূরক।

পঞ্চমত, নারী-পুরুষ উভয়েই উভয়ের স্বোপার্জিত অর্থ সম্মানের সঙ্গে ভোগ করবেন। উভয়কে যথেচ্চাচার বর্জন করতে হবে।

ষষ্ঠত, পুরুষ বা নারী কেউ পণ্য নন। তাই বিয়ের হাটে কেউই নিজেকে বিক্রি করবেন না। পণ দেবেন না, নেবেনও না।

সর্বশেষে উল্লেখ্য, বিজ্ঞাপন বা চলচ্চিত্রে নারীকে অনাবৃত করে দেখানো চলবে না। গল্পের প্রয়োজনে যেখানে প্রয়োজন সেখানে রূপক ব্যবহার করতে হবে।

নারী নির্যাতন এখন স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে

দীপালি সরকার

শুনতে হয়তো খারাপ লাগবে কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো আমাদের পুরুষশাসিত সমাজে নারী নির্যাতন বর্তমানে স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথাটা পরিষ্কার করে নেওয়া যেতে পারে।

অফিস কিংবা আদালতের অভ্যন্তরে একটু সচেতনভাবে কান পাতলে শোনা যাবে প্রতিটি লোকই পাশের বন্ধুকে বেশ রসিয়ে তার বাড়ির মহিলাকে কিভাবে কড়া শাসনে রাখেন তা সগর্বে শোনাচ্ছেন। এমনকি নিজের পুরুষত্ব জাহির করার জন্য কি প্রতিক্রিয়া করে থাকে তারও বিস্তৃত বর্ণনা দেন। যিনি শোনেন তিনিও উপভোগ করেন। এমনকি নির্যাতনের মাত্রা বাড়াতেও উৎসাহিত করেন। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু সম্প্রদায়ের একটি অংশ — যাঁরা পুঁথিগত বিদ্যায় বিদ্বান। এই চিত্রের ফলে এটাই পরিষ্কার হচ্ছে যে, মহিলারা নিজের ঘরেও নিরাপদ নন বরং প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হচ্ছেন। শুধু ঘরেই নয়, বাইরের জগতে মহিলাদের আতঙ্কের মধ্যে চলাফেরা করতে হয় প্রতি মুহূর্তে। সংবাদপত্রের পাতায় চোখ রাখলে তা আরও পরিষ্কার হবে। নারীরা বিভিন্নভাবে সম্মান হারাচ্ছেন।

বড়ই বেদনার বিষয় যে, এ-ব্যাপারে আমরা কেউই তেমনভাবে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ

করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি না। ভীতসন্ত্রস্তভাবে মুখ লুকিয়ে বাস করছি যে যার নিজের মধ্যে। সম্প্রতি আবার নারী নির্যাতনের মাত্রা যেন বেড়ে গেছে অধিক পরিমাণে। এর পিছনে কতকগুলি কারণও আছে। আগে মানুষের মধ্যে যে মূল্যবোধগুলি ছিল বর্তমানে তা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ একে অন্যের প্রতি যে মমত্ববোধ দেখাতো তা এখন বহুলাংশে অনুপস্থিত। সবটাই বিচার করা হচ্ছে আর্থিক মানদন্ডের ভিত্তিতে। তাই গৃহে কিংবা বাইরে মহিলাদের ওপর নির্যাতন বাড়ছে। এরই সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে মহিলাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের স্বীকৃতি। প্রচার মাধ্যমের অবিবেচক লেখা এবং প্রচার কিন্তু নির্যাতনের পরোক্ষভাবে সাহায্য করছে।

এসব ছাড়াও যেটা মূল এবং বর্তমানে প্রধান কারণ বলে মনে করি, তাহলে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে নাক গলানো এবং দলের স্বার্থে অন্যায়কে প্রশ্রয়দান। কলকাতায় আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্যাতনের ঘটনা নারী সমাজের কাছে লজ্জাজনক, বেদনারও। কিন্তু সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যের, তা হলো, আলপনা দেবীকে নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি দায়িত্বজ্ঞানহীন নোংরামি করেছে। কোথায় ভদ্রমহিলা বিপদে, প্রতিটি দল একাত্ম হয়ে দোষীকে শাস্তি দেবে, তা না করে অনেকেই কুৎসিত প্রচার করে মানসিকভাবে নির্যাতন চালাতে লাগলেন। সুস্থভাবে ওইসব রাজনৈতিক দলগুলির অভিভাবকেরা ভাবলেন না যে, মহিলাটি অসহায়। তার এক কিশোর পুত্র আছে। দলগুলির এই নোংরা খেলায় ওই ফুলের মত কিশোর মনটি যে বিষাক্ত হলো এবং রাজনীতি সম্পর্কে ঘৃণার সৃষ্টি হলো তা কেউ টের পেলেন? এইতো বেশ কিছুদিন আগে গ্রীসে গিয়েছিলাম নারী স্বাধীনতার ওপর একটি আন্তর্জাতিক আলোচনায় অংশ নিতে। সেখানে এক সাংবাদিক আমায় প্রশ্ন করেছিলেন, ভারতে নারী নির্যাতন এত বেশি কেন? সত্যি কথাটা বলতে না পারলেও কয়েকটি সমস্যার কথা বলে দেশের মুখ রক্ষা করতে হয়েছে। এই আলোচনায় অংশ নিতে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি যে, নারী নির্যাতনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলি জড়িয়ে পড়ে না।

নারী নির্যাতন কমাতে হলে কতকগুলি পদক্ষেপ নেওয়া আশু প্রয়োজন। এর মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাহলে মহিলাদের উপযুক্ত শিক্ষা এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য পরিবেশ তৈরী করা এবং সমাজে পুরানো মানবিক মূল্যবোধগুলি ফিরিয়ে আনা।

অবশ্য এটা অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে করাতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রকৃতভাবে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা দরকার। বিশেষ করে মানব সমাজের মঙ্গল করার উদ্দেশ্য তাদের শিক্ষার মধ্যে বিশেষ করে থাকা উচিত। শুধু ভোটের রাজনীতিই নয় — সবশেষে যেটা প্রয়োজন তাহলো নারী নির্যাতনের অবসানে তৈরী বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ আইন বদল। অবশ্যই এটা করা উচিত জনসাধারণের সঙ্গে আলোচনার পর। তবে মনে রাখতে হবে নারী নির্যাতন বন্ধ করা যাবে তখনই যখন আমরা প্রত্যেকে আমাদের বর্তমান অবস্থান ছেড়ে বেরিয়ে এসে এক সঙ্গে প্রতিরোধে রুখে দাঁড়াব।

মেয়েরা স্বাবলম্বী ও দৃঢ় হলেই নির্যাতন কমবে

জয়া রায়

নারী নির্যাতন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধির কারণ অন্তত আমার মনে হয় হতাশা। যদিও এই হতাশা আমাদের দেশ ছাড়িয়ে এখন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র ভারতের মধ্যে হতাশার

বহিঃপ্রকাশ ঘটছে নারী নির্যাতনের মধ্য দিয়ে। বিষয়টি সহজ করা দরকার। আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে এটা ঠিক। কিন্তু বাস্তব কথা হলো ওইসব শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান হচ্ছে না। অথচ প্রত্যেকেরই জৈবিক প্রয়োজনে স্বাভাবিক চাহিদাগুলি কিন্তু দানা বাঁধছে মনের গভীরে। কিন্তু উপায় নেই তা নিবৃত্তির। কারণ অসঙ্গতি এই যে না পাওয়ার বেদনা, যার মধ্যে থেকেই আসে হতাশা। চক্ষুলজ্জার খাতিরে অন্যভাবে প্রকাশ না হয়ে পরোক্ষভাবে নারীরা এর বলি হচ্ছে। হয়তো অনুসন্ধান কবলে দেখা যাবে যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সচেতনভাবে নির্যাতন হয় নি। তবুও হচ্ছে তা। কিন্তু চোখ খুলে দেখুন অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা এর সুবিচার পাচ্ছেন না। সরকারের বা প্রশাসনের ভূমিকাও সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। একথা ঠিকই, আমাদের দেশে চলতি আইন যথেষ্ট শক্ত নয়। অন্তত মহিলাদের প্রতি অসম্মান দেখালে ঠিক যেমন শাস্তি অপরাধীর পাওয়া দরকার তেমন কখনই হয় না। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশে মেয়েদের অসম্মান করলে হাত-পা কাটা হয়। এমনকি প্রকাশ্য জনসমক্ষে ফাঁসি দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে।

হিন্দি ছবির প্রভাবও নির্যাতন বৃদ্ধির কারণ বলে মনে করি। এর জন্য দায়ী সরকারের ত্রুটিপূর্ণ সেন্সর বোর্ড। ভাবা যায়! প্রতিদিন সিনেমা হলগুলিতে কিংবা দূরদর্শনে কী সব অশ্লীল ছবি দেখানো হয়। তা সেন্সর বোর্ড কিভাবে পাস করে? তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। আমাব প্রবল আপত্তি, ছবির মধ্যে ধর্ষণ এবং প্রতিশোধমূলক বিষয়টি দেখানো নিয়ে। এটা কি কোনওভাবেই বন্ধ করা যায় না? সরকার কর নেবার জন্য যেভাবে ছবিগুলির প্রতি উদারতা দেখাচ্ছে, তা ঠিক নয়।

বর্তমানে নাবী নির্যাতনের ধারা অবশ্য বদলাচ্ছে। পরিস্থিতি অনুসারে নির্যাতন হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন হবে। আগে যেমন ছেলের বাবার চাহিদা অনুসারে পণ না দিলে মেয়েকে শ্বশুর বাড়িতে নানাভাবে গঞ্জনা দেওয়া হতো, এখন অবশ্য সরকারের আইন কঠোর হওয়ায় পণেব জন্য সবাসরি নির্যাতন না করলেও ঘুরিয়ে আঘাত করা হচ্ছে। চরিত্র হননের চেষ্টা হচ্ছে। এমনকি এজন্য তাড়িয়ে দেবার ঘটনা ঘটছে। বিজ্ঞানের দৌলতে বর্তমানে নতুন নতুন যে সৃষ্টি হচ্ছে, তাও নারী নির্যাতনের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ-কথার মানে এই নয় যে, বিজ্ঞানের সৃষ্টির আমি সমালোচনা করছি। আর তা করতে পারি না। কারণ বিজ্ঞান তার পথে এগিয়ে যাবে। কিন্তু আমার আপত্তি অন্য জায়গায়। বিশেষ করে বিজ্ঞানের দৌলতে আজকাল যে লিঙ্গ নির্ধারণের ব্যবস্থা হয়েছে, সেটাকে আমরা ভালভাবে কাজে না লাগিয়ে তা খারাপভাবে ব্যবহার করছি। দেখা যাচ্ছে অন্তঃসত্তা অবস্থায় পরীক্ষা করে যখন মেয়ে হবে বলে জানা যাচ্ছে, তখনই মেয়ে ভ্রূণটিকে হত্যা কার হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে মেয়েদের জন্মাবার কি কোনও অধিকার নেই। এটা সত্যিই নিন্দনীয়।

বিবাহের সময় পাত্রী-নির্বাচনে রঙ নির্ধারণের যে প্রচলন চলে আসছে, তাও নারী নির্যাতনের মধ্যে পড়ছে। বর্ণবিদ্বেষের জন্য আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার সমালোচনা করে থাকি। বিরুদ্ধ মত প্রকাশের জন্য এ নিয়ে হাজার হাজার পাতা লিখে খরচও করেছি। কিন্তু আমাদের দেশে নিজের কিংবা পরিবারের পুত্র, ভাই কিংবা বন্ধুর জন্য যখন পাত্রী নির্বাচন করতে যাই, তখন মেয়েটির রঙ ফর্সা কিনা যাচাই করে দেখি। একই সঙ্গে তার চুল, পায়ের পাতা, মুখশ্রী, গলার স্বর, হাঁটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুঁটিয়ে দেখা হয়।

দেখতে দেখতে পাত্রপক্ষের অভিভাবকেরা ভাবেন, একে আমার বাড়ির গৃহবধূ কিংবা স্ত্রী করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কেমন হবে। আসলে মেয়েটিকে দেখা হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র

হিসেবে। এ নিন্দনীয় ব্যবস্থা চলতে দেওয়া উচিত নয়। মনে রাখা উচিত, মেয়েরা বাজারের আলু, পটল কিংবা সবজি নয় যে, যাচাই করতে হবে।

বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে যেভাবে মেয়েদের অশ্লীল ছবির মধ্যে দিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতেও নারী নির্যাতনের উৎসাহকে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে বিড়ি, দেশলাই, কিংবা মদ যে কোন বিজ্ঞাপনে মেয়েদের ছবি। এছাড়া অন্যান্য অশ্লীল বিজ্ঞাপনে তো কতভাবেই যে ব্যবহার করা হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। এর ফলে আমাদের রুচি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নোংরা বিষয়ের দিকে ঝোঁক বাড়ছে।

এছাড়াও সতীপ্রথা, শিশু বয়সে বিবাহ, অর্থের লোভে বিবাহের নামে বিদেশে মেয়েদের বিক্রি করার মধ্য দিয়েও নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে চলেছে। যে সময়ে দাঁড়িয়ে মহিলারা মহাকাশ থেকে শুরু করে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে, সে সময় নারীকে শুধুমাত্র সেক্স হিসেবে বিচার করা হচ্ছে। এটা বড় বেদনাদায়ক। সবচেয়ে খারাপ লাগে এই ভেবে যে, নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেখানে পশুদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই স্বাধীন, সেখানে মানুষের সমাজে স্ত্রীদের নিজস্ব মতামত কিংবা নির্বাচনের কোনও অধিকার নেই।

নারী নির্যাতনের বন্ধের জন্য সবচেয়ে আগে মেয়েদের দৃঢ় হতে হবে। আমাদের মেয়েদের উচিত হবে পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য মানসিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা। শেষ করার আগে আমার নিজের বিশ্বাসটা বলতে পারি, তা হল নির্যাতন কমবে তখনই, যখন আমরা সে নারী হই কিংবা পুরুষ, সেটা না ভেবে ভাবতে এবং পরিচয় দিতে শিখবো নিজেদের মানুষ হিসেবে। এই মানসিকতা প্রত্যেকের মধ্যে গড়ে তোলা জরুরি।

স্মৃতিশাস্ত্রের যুগ থেকেই শুরু নারী নির্যাতন

সুনীল দত্ত রায়

সমাজ ও সংসারে নারী আর পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। তামাম বিশ্বের সৃষ্টিলীলা পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনসম্ভূত। বিশ্বের জীবনধারার গতিকে মানুষ আর মানুষীই টিকিয়ে রেখেছে। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের নারী-পুরুষের জৈবিক সম্পর্কের তত্ত্ব অসার প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, মানুষের মনের সূক্ষ অনুভূতি, আনন্দ, কিংবা আকর্ষণ মানুষকে ঘিরেই জন্ম নেয়। ওই আনন্দ কিংবা আকর্ষণ শুধুমাত্র জৈব অভিপ্রায় পূরণের জন্য নয়। কবি, চিত্রকরের কাছে নারী যেমন প্রেরণা, সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যে নারীই মূল উদ্দীপক। নারী-বিবর্জিত কোনও সমাজ, কোনও দেশে, কোনও কালে টিকতে পারে না। বৈদিক সমাজে নারীর স্থান ছিল মর্যাদার আসনে সুরক্ষিত। অধিকাংশ নারীমূর্ত্তির অবস্থান ঋগ্‌বেদের দৈবস্তুতিতে। ওখানে দেবী 'অদিতি' মাতৃরূপে কল্পিতা — তিনিই আদর্শ, গৃহিনী, কন্যা ও ভগিনী। নারীচরিত্র একাধিক শ্লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে ঋগ্‌বেদে। সভাগৃহে নারীর প্রবেশাধিকার, আকর্ষণীয় পোশাকে সজ্জিতা নারীর পতি নির্বাচন, সঙ্গীত, নৃত্যকলায়, রমণীর পারদর্শিতা, নির্ভীক মহিলার যোদ্ধারূপে উপস্থিতি ইত্যাদি বৈদিক সমাজেরই দৃষ্টান্ত। বাল্যবিবাহ সে-যুগে ছিল না। তবে, বরপক্ষকে কন্যাপক্ষের কাছে 'আসুর' ও শুল্কদানের প্রথা মানতে হতো। নববধূ সম্পর্কে বেদে উল্লিখিত হয়েছে — তুমি শ্বশুরের ওপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের ওপর সম্রাটের ন্যায় হও।

স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে নারীর স্থান হলো একেবারে বিপরীত — 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা।' প্রধান কারণ স্ত্রী-শিক্ষার অবনতি আর কন্যার বাল্যবিবাহ। এ-যুগে কন্যাসন্তানের ওপর পিতামাতার বীতরাস প্রবল হয়েছিল। পুত্র সন্তান ছিল বাঞ্ছনীয়। এ-যুগটিতে ব্রহ্মচর্য পালনকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। স্ত্রীজাতির সান্নিধ্য সাধনপথে অন্তরায় বিবেচিত হয়েছে। বাল্যবিবাহের বিষময় ফল টেনেছে নারী — শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিতা অল্পবয়স্কা, অনভিজ্ঞা নারীরা সমাজে চরম পরাধীনতা ও পরমুখাপেক্ষীতার শিকার হয়েছে।

স্মৃতিগ্রন্থে মনুও জানিয়েছেন — ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র মহতি' অর্থাৎ কুমারী অবস্থায় পিতা, বিবাহের পর স্বামী ও বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের অধীনে থাকতে হবে। বৈদিক যুগে বিধবা বিবাহ কিংবা নিয়োগ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মনুস্মৃতির অনুশাসনে দুটি প্রথাই নিষিদ্ধ হয়।

মধ্যযুগে কন্যার বিবাহ রজোদর্শনের পূর্বে না দিলে ব্রহ্মহত্যার পাপে ভাগী হবার নির্দেশ আরোপিত হয়। বহুবিবাহ তথা কৌলিন্যপ্রথার বলি হয় নারী। মধ্যযুগের প্রান্তভাগে মুসলমানদের অনুকরণে নারীর ওপর অবরোধ প্রথা কঠোরতর হয়। শিক্ষা, শিল্পকলায় নারীর প্রবেশাধিকার অবহেলিত থাকে। নারীজাতির ক্রমোন্নয়ন আবার উনিশ শতক থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হতে শুরু করে।

নারীর প্রতি সমাজের অবিচার ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সতীদাহ প্রথাব বিলোপ, বহুবিবাহ প্রথার দূরীকরণ, শিশুবিবাহে বিরোধিতায় রাজা রামমোহন রায়ের অবদান আমরা দেখেছি। আমরা পেয়েছি স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে বিধবা বিবাহে বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কাবমূলক বৈপ্লবিক আন্দোলন। আমাদের সামনে সমাজ সর্বপ্রথম অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্র সেনের ব্রহ্মসমাজের প্রগতিশীল ভূমিকা দেখেছে। অথচ পুরুষসমাজ নারীকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা কিংবা শ্রদ্ধার আসনটি ছেড়ে দেয় নি।

সংস্কারপন্থী শিবিরের সঙ্গে প্রগতিবাদী শিবিরের সংঘর্ষ, রক্তপাত ঘটেছে। সংরক্ষণপন্থীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মের ছাতায় নিজেদের আড়াল করেছেন। ধর্মেব ছাতায় মুখ ঢেকে নারীকে তাঁরা ব্যবহার করেছেন ভোগ্যবস্তু হিসেবে। অনেক চড়াই উতরাই পার হয়ে বর্তমানে নারীসমাজ শিক্ষার্জনের পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছে, স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ কিংবা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেয়েছে।

(শিক্ষিত) নারী ও (শিক্ষিত) পুরুষের সমানাধিকার সামাজিক ও আইনগতভাবে স্বীকৃত হলেও আভিজাত্য ও শৌখিনতার আড়ালে বধূ নির্যাতন, পণপ্রথা, সাবালিকা ও স্বাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও শ্বশুরগৃহে নিগ্রহ, ক্ষেত্র বিশেষে স্বামীরই ইঙ্গিতে ও যোগসাজশে বধূর ওপর বর্বোরোচিত চরম পরিণামের ঘটনা সংবাদপত্রে এখনও আলোড়িত হচ্ছে। শিক্ষা যদি চেতনার ধারক হয়, নারী-পুরুষের সমানাধিকার যদি সামাজিক ও আইনগতভাবে স্বীকৃত হয়, বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলনের জোয়ারে আমাদের দেশও যদি প্লাবিত হয়, তাহলে নারী নির্যাতনের ভয়াবহ ও নির্লজ্জ দৃষ্টান্তগুলো কেন বারবার প্রচারমাধ্যমে ভেসে উঠবে?

প্রচার মাধ্যম পরিবেশিত নারী নির্যাতনের দৃষ্টান্তগুলো সামনে রেখেই তাহলে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে নারী-পুরুষ উভয়কেই। সমাজবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব বিশারদ ও সমাজ সংগঠনকেও অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে সমাধান সূত্রে পৌঁছতে। সর্বাগ্রে পারিবারিক ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনে পুরুষকে যুগাতীতকালের পুরুষ শাসিত সমাজের নারীকেন্দ্রিক উন্নাসিকতা বর্জন করে সম

মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, যাতে পুত্র-কন্যার সামনে মাতৃজাতির অসম্মান কোনভাবেই না ঘটে। স্ত্রীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলে স্বামী যে রেহাই পাবে না, এ-বোধটি সঞ্চারিত হওয়া জরুরী। নারীকেও এ-বিষয়ে একই সূত্র অনুসরণ করতে হবে।

নারী নির্যাতনকে কেন্দ্র করে পুলিশি হস্তক্ষেপ, আদালত, আইনের প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ, মহিলা সংগঠনেব হস্তক্ষেপ ইত্যাদিগুলো আসছে পরে। পূর্বাহ্নে একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য প্রচারে থাকবে — 'নারী-পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক।'

সমাজের অশুভ শক্তি অতীতেও ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকবে। এই অশুভ শক্তির ক্রিয়াকলাপই দিবালোকে ঘটায় শ্লীলতাহানি। এই অশুভ শক্তির মোকাবিলা আইনের পথেই হবে। ব্রিটিশ প্রসিডিওয়র কোড ও ইন্ডিয়ান পেনাল কোডকে পুনর্নবীকরণ করাও জরুরী। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইন ও আইনেব সঠিক প্রয়োগে পুলিশ ও আইনবিদদের যথাযথ ভূমিকা পালন নিঃসন্দেহে সঠিক হওয়া প্রয়োজন।

নারী-নির্যাতনের অঙ্গ হিসেবে সারা বিশ্বজুড়ে লিঙ্গ নিধারণ পরীক্ষা, ভ্রূণহত্যার জন্য নবকলবরে চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোর রমরমা ব্যবসা নারীজন্মকে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রমাণ করেছে। এই প্রয়াসও অবিলম্বে বন্ধ করা হোক।

কন্যার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে

ডঃ চিত্রা রায়

আজকের প্রতিটি দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকায় নারী নির্যাতন বিষয়ে বহু লেখালেখি হচ্ছে। গড়ে উঠছে অজস্র মহিলাসমিতি এবং নারীকল্যাণ সংস্থা। প্রবন্ধে আলোচনায়, বক্তৃতায় — বড় বড় কথার চাষ হচ্ছে প্রচুর, বিশাল বিশাল সঙ্কল্পের বুদবুদ উঠছে আবার মিলিয়েও যাচ্ছে। নির্যাতিতাদের পক্ষ থেকে দোষারোপ করা হচ্ছে অত্যাচারী অসংযমী পুরুষদের, দায়ী করা হচ্ছে নিরাপত্তারক্ষীদের কাপুরুষোচিত নীরবতাকে, প্রশ্ন তোলা হচ্ছে সমাজে এবং সংসারে নারীর স্থান নিয়ে। কিন্তু প্রকৃত সমস্যার তেমন কোনও হেরফের দেখা যাচ্ছে না। বধূহত্যা এবং নারী নির্যাতন যেন দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এজন্য বারে বারে একে অন্যকে দোষারোপ করে আরও কতদিন দায়িত্ব এড়ানো যাবে?

একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সমস্যাটির জন্য আমরা কেউ কম দায়ী নই। 'এ আমার এ তোমার পাপ'। আজ এর শিকড় চলে গেছে আমাদের রক্তে, সংস্কারে, চেতনায়, যে নারীর দৌলতে আমরা সুন্দর পৃথিবীকে দেখি, রক্তে জোর এলে তাকেই আমরা প্রথম অবহেলা করি। কারণ জন্মাবধি তাকে অবহেলিত, বঞ্চিত, নিরক্ত, বিবর্ণ দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। নিজের বাবা-মার কাছেও সে যে মর্যাদা পায়নি, স্বামী-পুত্রের কাছেও সে তা আশা করে না। আত্মসম্মানজ্ঞান নামক অনুভূতিটি তার মধ্যে গড়েই ওঠে নি, গেড় উঠতেই দেওয়া হয় নি। তাই পিতৃগৃহে, শ্বশুরালয়ে অবহেলিত, নির্যাতিত, অত্যাচারিত হতে হতে সে ধরেই নেয় — এই তার ভবিতব্য। অথচ উভয় পরিবারেই যাবতীয় শ্রমসাধ্য কাজ ধৈর্য-সহ্যের সঙ্গে নীরবে সম্পাদন করে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তিকে সে-ই করেছে সুদৃঢ়। তাই শুধু প্রবন্ধে, আলোচনায় বা বক্তৃতায় নয় — পরিবর্তন আনতে হবে আমাদের জীবনবোধ এবং জীবনচর্চায়। যুগ পাল্টে গেছে,

প্রাচীন সংস্কারের চশমাটি খুলে ফেলার সময় এসে গেছে। আর সমস্যা থেকে পিছন ফিরে গা-বাঁচালে চলবে না। সমাজে এবং সংসারে মেয়েদের বারে বারে নির্যাতিতা হওয়ার পিছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। যেমন — পৈত্রিক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বিষয়ে সংশয়াচ্ছন্ন বলে অনেক সময় মেয়েরা অপমানিতা ও নির্যাতিতা হয়। আজকের যে সাবালিকা কন্যাটি বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যায় সে আর সেই 'গৌরীদানে'-র যুগের বালিকাটি নয়, তাই তার জীবনের অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যে পিত্রালয়ে অতিবাহিত হয়েছে, বিয়ের পরই সেখান থেকে তার সমস্ত স্মৃতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলা অনুচিৎ এবং অন্যায় বরং তার একটি নিজস্ব কক্ষ থাকা উচিত যেখানে তার প্রিয় বই-খাতা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সযত্নে স্থান পাবে। আর থাকবে একান্ত নিজস্ব কিছু অর্থ বা সম্পত্তি। যাতে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে সে কখনই নিরাশ্রয় বা বিপন্ন বোধ করবে না। সরকার আইন করলেই হবে না — প্রতিটি পিতমাতাকে তার প্রতিটি সন্তানের জন্য সমান দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য থাকতে হবে। আত্মসম্মানজ্ঞান এবং আত্মপ্রত্যয়বোধের অভাব ও মেয়েদেরকে অসম্মানিত হতে সাহায্য কবে। এক্ষেত্রেও দায়িত্ব মূলত অভিভাবকদেরই, পিতামাতার উচিত প্রথম থেকেই পুত্র এবং কন্যাকে সমান দৃষ্টিতে মানুষ করা, সমানভাবে শারিরীক এবং মানসিক বিকাশের বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া, সমান শিক্ষায় এবং আচরণে শিক্ষিত করা, সমান পোশাকে এবং খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত কবা, সমান আত্মসম্মানজ্ঞান এবং আত্মপ্রত্যয়বোধ জাগিয়ে তোলা।

বে-আব্রু সাজপোশাক এবং বিকৃত 'আধ-গরবী' ধরণের চলন-বলনও মেয়েদেরকে নির্যাতনের শিকার করে তোলে। পিঠ, পেট কাটা ব্লাউজের সঙ্গে শাড়ী পবার চেয়ে বা 'মিনি-ম্যাক্সি'-র টানাপোড়েনের চেয়ে অনেক ভদ্র এবং মার্জিত পোশাক হল প্যান্ট-শার্ট ঢিলে সালোয়ার কামিজ। এতে ছুটে, দৌড়ে বাসে বা সাইকেলে চড়ারও সুবিধা হয়।

সর্বোপরি প্রয়োজন প্রতিটি মেয়ের নিজস্ব ব্যাক্তিত্বের জাগরণ ঘটানো। এই দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে তার সমস্ত সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করে তোলা।

উপরোক্ত বক্তব্যের সমালোচনা করবার জন্য মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন দু'একজন। সমরকান্তি গুপ্তভায়া বললেন —

মেয়েরা স্বাবলম্বী ও দৃঢ় হলেই নির্যাতন কমবে — শ্রীমতী রায়ের এই সুচিন্তিত অভিমতকে (২০.০৩.৯৪ ওভারল্যান্ড) সমর্থন করলেও আজ সন্দেহ জাগে যে, 'স্বাবলম্বী' হওয়া কারো কারো পক্ষে খানিকটা সহজতর হলেও 'দৃঢ়' হওয়া বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় অনেকের পক্ষেই সহজ নাও হতে পারে। এর মূল কারণ আমাদের শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থার ওপর আমাদের সিনেমা, রেডিও এবং টেলিভিশনের মতো শক্তিশালী গণমাধ্যমগুলিতে প্রচারিত ও প্রদর্শিত নানা কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান সমূহের প্রভাব। সেই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিতে 'জনসাধারণ এমনটি চায়' বলে আজকাল সে সমস্ত অনুষ্ঠান সর্বদাই দেখানো হচ্ছে, তাতে 'মানুষ' সম্পর্কে আমাদের মহাপুরুষদের দেওয়া অতীতের সেই 'মানুষ হল দেবোপম' এই সংজ্ঞাটিকে আর ভাবা যাচ্ছে না। এটা হল বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে তার জৈবিক পশুবৃত্তিকেই আরও উত্তেজিত করে দেওয়ার এক ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। আর সেটাও করা হচ্ছে 'সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র সমাজ জীবনের প্রতিবিম্ব' এই মহান যুক্তির অন্তরালেই। ফলে, এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে আমাদের সমাজজীবনেই। সাধারণভাবে কিছু মানুষ, কোনও সিনেমার কোনও ভাল দিক থাকলেও সেগুলোকে গ্রহণ করার পরিবর্তে, তার

কুরুচিপূর্ণ খারাপ ভাবগুলোকেই আরও বেশি করে অনুকরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে বলেই মনে হয়। আর তাই হয় তো 'কুরুচি' আমাদের প্রকৃত শিক্ষাকে দিনের পর দিন আরও বেশি করে কলুষিত ও বিকৃত করে তুলছে। ওই একই ভাবে হয়তো বা ড্রাগ সম্পর্কেও অতিরিক্ত প্রচারের ফলেও, ড্রাগের ব্যবহার, ক্রমেই কমে আসার পরিবর্তে, বরং সুদূর গ্রামাঞ্চলেও এমনকি ড্রাগ সম্পর্কে এতদিন যারা কিছুই জানতো না, তারাও আজ অনেকটা 'কৌতূহল' বশেই আরও বেশি বেশি সংখ্যায় ওই ড্রাগেই আসক্ত হয়ে পড়ছে।

বলাবাহুল্য, শিক্ষা সচেতনতা বিস্তারের নামে আমাদের শিক্ষা ও সচেতনতার ক্ষেত্রে, এই রকম প্রচারের ফলে, আদৌ কোনও দূষণ ঘটছে কি না, সে-সম্পর্কেও এদেশে কোনও সঠিক গবেষণা আজও পর্যন্ত হয় নি। আর তা না হওয়ার ফলস্বরূপ আমাদের সমাজের আজ এই 'অবক্ষয়', যার শিকার হয়ে পড়েছে নারী-পুরুষ উভয়েই। তাই মেয়েরাও যেমন শিল্প-সৃষ্টির নামে জড়িয়ে পড়ছেন 'নগ্নতায়' পুরুষও তেমনই অভ্যস্ত হচ্ছেন 'কুরুচি ও হিংস্রতায়' যে ঘটনাগুলোর অবশ্যম্ভাবী ফল হল আজকের এই ক্রমবর্ধমান রুচিবিকৃতি, হিংস্রতা ও নারী নির্যাতন। ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও আর্থিক নানা সমস্যার চাপেও আমাদের যুব সমাজ আজ এক লক্ষ্যহীন বিভ্রান্ত অবস্থায় এসে এসে পৌঁছেছে। আজ অনেক ক্ষেত্রেই নারীও যেমন নারীর শত্রু, তেমনই আবার পুরষও বিভ্রান্তের মতো পুরুষের বিরুদ্ধে ই কাজ করে চলেছেন। এক অথেত এ হল আত্মহননের সামিল।

কিন্তু তবুও আজ সমস্ত কিছু প্রতিকূলতাকে সর্বশক্তিতে অস্বীকার করে আমাদের মেয়েদেরকেই যাবতীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে আরও 'দৃঢ়' হতে হবে। তাদেরর 'আত্মমর্যাদাবোধ'-ই তাদেরকে যাবতীয় 'শোষণের' বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনেক বেশি শক্তি যোগাতে পারে। সমস্ত রকম শোষণ এবং নির্যাতন রুখতে চাই প্রতিটি মহল্লায় মহিলা সংগঠনগুলির সঠিক সংগ্রামমনস্কতা।

কমল দত্ত-র বক্তব্যও খুব মন দিয়ে শুনলাম।

বিংশ শতাব্দীর শেষ ধাপে যখন আমরা পৌঁছে গেছি, যখন আমরা পৌঁছে গেছি, যখন আমরা আমাদের প্রতিদিনেব জীবন ধারাকে বিজ্ঞানের প্রভাবে উন্নত করে চলেছি। ঠিক তখনি আমাদের দৈনন্দিন সমাজে 'নারী নির্যাতনের' 'বহুমুখী-ক্ষত' দেখতে হচ্ছে। বর্তমান সময়ে সমাজে-শিক্ষাব্যবস্থার দৌলতে ডিগ্রি ডিপ্লোমার বহর যত বাড়ছে ততই আমাদের সমাজে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে কদর্যতা বাড়ছে। প্রতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের ওপর যেমন শিক্ষার বোঝা বেড়েছে, বেড়েছে বই খাতার ওজন, বেড়েছে শিক্ষিতের হার। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত কতজন? কতখানি বেড়েছে প্রকৃত জ্ঞান ও গরিমার গভীরতা?

আজ বিজ্ঞানের দৌলতে নারীরা আদালতে, বিমানে,অফিসে সমাজের সর্বত্র বহুমুখী কর্মজগতে, পুরুষের পাশাপাশি সমাগত। সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে পণ্যের জন্য বধূহত্যা, পরিবারের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন, অকারণে স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যাওয়া বা ডিভোর্স করা, ডাইনি প্রথা, কর্মক্ষেত্রে মহিলা কর্মীদের প্রতি অফিসের (পুরুষ) কর্তাদের অশোভন আচরণ, মেয়ে ভ্রূণ হত্যা, পুত্রবধূ ও স্ত্রী নির্বাচনে কালো ও ফর্সা রং নিয়ে যাচাই করা — আফ্রিকার (দক্ষিণ) বর্ণবিদ্বেষকেও হার মানিয়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত মহিলাদের অস্থি মানসিকতা। নারীমুক্তি আন্দোলনের নামে পশ্চিমী হাওয়ায়, কিছু অসার চিন্তা ভাবনার পিছু পিছু মরীচিকার মত ঘুরে ঘুরে সামাজিক রক্ষণশীলতার বেড়াগুলি ভেঙে ফেলতে চাইছে।

সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে যা ক্ষয়প্রাপ্ত তা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমান সমাজজীবন বহু ক্ষেত্রে মূল্যবোধের যে অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে নির্যাতনকারীরা তারই আগাছা। নির্যাতন হল ওই আগাছার ফসল। আজকের সমাজ এই আগাছায় ভরে যাচ্ছে বলেই প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদটুকুও হয় না। ফল কুড়বার মতই নারী নির্যাতন দেখে মজা অনুভব করতে ব্যস্ত থাকে সকলেই।

'নারীও মানুষ' — এই বোধশক্তি আজ ক্ষয়প্রাপ্ত। এর জন্য দায়ী যেমন টিভি কালচার, তেমনি দায়ী নারীকে ব্যবহার অশ্লীল বিজ্ঞাপন, পোস্টার। দায়ী পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে এফ আই আর নিতেও পুলিস সম্মত হয় না। ঘুষ নিয়ে ওইসব মামলাগুলি বহুদিন ঝুলিয়ে রাখা হয়। এমনকি সাক্ষ্যপ্রমাণ চেপে দেওয়াব প্রবণতাও দেখা যায়।

পুরুষশাসিত সমাজে নারী নির্যাতনের জন্য যেমন পুরুষরা দায়ী, তেমনি নারীরাও কম দায়ী নন। বহুমুখী নারী নির্যাতনেব প্রতিটি ক্ষতের জন্য নারীরাও দায়ী। এটা প্রমাণিত।

সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে মানুষসৃষ্ট এই সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ের মিলিত অবদানে গড়ে উঠেছে আজকের এই মানব সভ্যতা। এ-সৃষ্টির মাঝে এ সমাজের মাঝে — কেহ ছোট নহে, কেহ বড় নহে। পুরুষ ও নারী উভয়েই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আজকের দিনে আমরা যদি নারী ও পুরুষ উভয়েই মানুষ হিসাবে ভাবতে শিখি, নারী যদি তাদের মোহিনী শক্তি দিয়ে পুরুষকে পশুত্বে পরিণত না করে, তাহলেই নারী তার সম্মান বজায় রাখতে পারবে। তবেই সার্থক হবে নারীমুক্তি আন্দোলন।

নারী নির্যাতন ভোগবাদেরই পরিণতি — একথাটি বেশ জোর দিয়ে বললেন অজিত বসু।

নারী নির্যাতন নিয়ে ইদানিং কাগজে খুব লেখালেখি হচ্ছে। খবরের কাগজে নারী নির্যাতন বিষয়ক ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রমাণ করে যে, এই বিষয়ে সমাজের সকল স্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বেশ চিন্তিত। নারী নির্যাতনের ঘটনা নতুন নয়। আদিমকালেএ নারী নির্যাতনের ঘটনা ছিল বর্তমানে তো আছেই। আগামী দিনে যে থাকবে না, তেমন নিশ্চয়তা নেই। যে ব্যাপারটি উদ্বেগের কারণ তা হল, শিক্ষা এবং সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নারী নির্যাতনের ঘটনা এবং বৈচিত্র দুই-ই বাড়ছে। মানুষ হিসেবে আমরা ধর্মগত, পেশাগত, রাজনীতিগত কিংবা অন্য কোনওভাবে বিভক্ত। আবার রাজনীতিগতভাবে কেউ সি পি এম, কেউ কংগ্রেস, কেউ বা অন্য কোনও দল বা আদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু সামগ্রিকভাবে মানবজাতিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক — পুরুষ, দুই — নারী। পেশাগত, আদর্শগত, ধর্মগত কিংবা অন্য কোনওভাবে বিভক্ত সকল শ্রেণীর মানুষ এক হয়ে গেলেও নারী-পুরুষের মধ্যে যে দৈহিক ও মানসিক পার্থক্য আছে, তা কোনওদিন এক হবার নয়। এই পার্থক্য সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দূর করা যাবে না। কারণ নারী-পুরুষের মধ্যে যে নৈতিক পার্থক্য আছে, তা যদি দূর হয়, তাহলে সৃষ্টিই থমকে যাবে। যতদিন নারী-পুরষের এই দৈহিক পার্থক্য থাকহে, ততদিন নারী নির্যাতনেক সম্ভাবনা থাকবে। তবে সামাজিক বিবর্তনে নির্যাতনের রকমফের হতে পারে। সভ্যতার বিকাশ নারী নির্যাতনের আশঙ্কা অনেকটা হ্রাস করতে পারে।

নারী নির্যাতনের ঘটনা যে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই বাড়ছে তা নয়, সারা পৃথিবীতেই নারী নির্যাতনের ঘটনা বাড়ছে। এর কারণ বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো মানুষকে ভোগবাদের দিকে বেশি করে প্ররোচিত করেছে। রেডিও, টিভি, সিনেমা, সাহিত্য, সংবাদপত্র ইত্যাদি

শক্তিশালী গণমাধ্যমগুলোও ভোগবাদের আদর্শকে ফলাও করে প্রচার করছে। এই ভোগবাদের মূলকথা আত্মতৃপ্তি, তা সে যেভাবেই হোক না কেন। এর কুপ্রভাব পড়ছে সমাজের সর্বত্র। নারী নির্যাতনের মধ্যেও এই ভোগবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। সুতরাং শুধু আইন করে নারী নির্যাতনের ঘটনা রোধ করা যাবে না। এই ভোগবাদের দরুণ একজন নারীকে দৈহিক, মানসিক কিংবা অন্য কোনওভাবে নির্যাতিত হতে দেখেও এখন আমরা বাধা দিতে এগিয়ে যাই না। উল্টে নির্যাতিত নারীর নির্যাতনের কাহিনী বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের কাছে রঙ চড়িয়ে প্রকাশ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করি। খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি প্রভৃতি গণমাধ্যমগুলিও এই অবস্থার সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে নারী নির্যাতনের ঘটনা ফলাও করে ছাপছে কিংবা প্রচার করছে।

সাধারণ মানুষকে সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে নারী নির্যাতনের ঘটনা কমানো যাবে না। শুধু সরকারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সমাজের প্রতি সকলেরই দায়িত্ব আছে। সমাজের সকল স্তরের মানুষ যদি অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তাহলে ভোগবাদের প্রসার ঘটতে পারবে না। ভোগবাদের প্রসার যদি রোধ করা যায়, তাহলে নারী নির্যাতনের ঘটনা কমতে বাধ্য। তাই নারী নির্যাতনের ব্যাপারে সকলকে একসঙ্গে এগিয়ে এসে সমাজে ভোগবাদের প্রসার রোধ করতে হবে। সুস্থ সংস্কৃতি প্রসারের মাধ্যমে তা করা সম্ভব।

প্রধান শাসকদল কর্তৃক সামাজিক দুর্বৃত্তায়ন

উপরোক্ত বক্তাদের বিভিন্ন মতামত শোনার পর মনে হলো তারা একটি প্রধান কারণকে তেমন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেননি। বিভিন্ন ধরণের নারী নির্যাতনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রধান কারণ ক্ষমতায় থাকার জন্য প্রধান শাসকদল কর্তৃক সামাজিক দুবৃত্তায়ন। বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের বিরূপ মনোভাব, বিরূপ সমালোচনা যতো বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে সি পি এম ততো বেশি মস্তান, ঠিকাদার, চোরা কারবারি সোজা কথায় সমাজ শত্রুদের হাত ধরে ভোট বৈতরণী পেরোবার চেষ্টা করে এসেছে। আমার এ-বক্তব্যের সমর্থনে কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। আলপনা-অঞ্জনার কথা দিয়েই শুরু করা যাক।

দৃশ্য - ১

আমি আলাপনা বন্দ্যোপাধ্যায়। হ্যাঁ, আমিই সেই মহিলা, যার ভাগ্যদেবী সব সময়ই লুকিয়ে হাসেন। আমার পরিচয় নতুন করে কী আর দেব আপনাদের কাছে। আমি এখন সবার কাছেই পরিচিত — সু কি কু, তার বিচারও করবেন ভাগ্যদেবী আপনারা নন। কোনও রাজনৈতিক নেতারাও নন। কোনও রাজনৈতিক নেতারাও নন। কোনও সমাজসেবী নন। ৩৭ বছরের বিধবা নারীরা যে সত্যিই অসহায় তা আমি মর্মে মর্মে বুঝতে পারি। না, কোনও সহানুভূতি কুড়ানো বা বাহবা পাবার জন্য বলছি না, মেয়ে হিসাবে কোনও কোটায় বিশেষ সুবিধা নেবার জন্যও নয়, এটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা যে মর্মান্তিক তারই দু চার কথা আপনাদের শোনাই।

আপনারা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন, আমার কপাল পোড়ার ঘটনার ব্যাপারে। আমাকে প্রকাশ্যে রাস্তায় পিটিয়েছে কিছু গুন্ডা। যত সহজে উচ্চারণ করলাম, ঘটনা তত সহজ নয়। বহু দূর অবধি এর শিকড় ছড়ানো। এতসব কথা জানতে হলে একটু পিছতে হবে আমায়। আমি কে, কোন জায়গা থেকে আজ এখানে এসে পৌঁছেছি। আমার স্বামী মানস ব্যানার্জীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয় ৭৪ সালে। সতেরো বছরের উত্তরপাড়ার বাসিন্দা, যখন বিয়ে করে চলে এলাম শহর কলকাতায়, তখন কলকাতা ছিল আমার কাছে না দেখা, এক আশ্চর্য শহর।

থাকতাম স্বামীর সঙ্গে সিঁথির দিকে। তার ধারে কাছেই ছিল শ্বশুর বাড়ির অন্যান্য আত্মীয়রা। ১৯৭৮ সালে আমাদের পুত্র সন্তান জন্মায়। গরীবই হোক, বড়লোকই হোক, পুত্র সন্তান কার না আদরের হয় বলুন? বুবুন আমাদের কোলজোড়া ছেলে। স্বামী কখনও কোনও অসৎ পথে অর্থ উপার্জন করেননি। ফলে সংসারের অভাবের মধ্যেই বুবুন বড় হতে থাকে। সিঁথিতে থাকতাম বলে বুবুন পড়ত রামকৃষ্ণ সংঘ বিদ্যামন্দিরে। ছেলেকে মানুষ করে তোলার স্বপ্ন দেখতাম তখনই। এ বছর বুবুনের মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা। জীবনের প্রথম পরীক্ষা যখন ছেলেমেয়েরা বাবামায়ের কোল ঘেঁষে দিচ্ছে। ছেলেমেয়েদের ক্লান্ত মুখ স্নেহের আঁচলে

মুছিয়ে দিচ্ছেন বাবা, মা, আমার ছেলে তখন মায়ের জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য জীবনদায়ী ওষুধের খোঁজে কখনও রাস্তায় ছোটাছুটি করছে, কখনও বা পুলিশ কর্তাদের মর্জিমাফিক যখন তখন লালবাজারে কি বড়তলা থানায় দৌড়তে হচ্ছে।

বুঝতে পারছেন তো, ভাগ্যদেবী আমার কতবড় সহায়? আমার বিচিত্র জীবনে কালো ছায়া ঘনিয়ে আসে ৯০ সালের সেই দিন। আমার পরম সহায়, বন্ধু আমার স্বামী ইহলোক ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে গেলেন। আমি ও আমার নাবালক সন্তান একেবারে জলে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়িতে যা ঘটে থাকে, আমার বাড়ি তার ব্যতিক্রম ছিল না। দরিদ্র হলেও মানবিক তাড়নায় এগিয়ে এলেন বাবার বাড়ি এবং শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। তারা আমাদের তখন থেকেই আর্থিক সাহায্য করে যেতে থাকেন। তাদের পরামর্শ মতো আমি চলে এলাম সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রিটের এই বাড়িতে। ৯২ সাল থেকে থাকতে আরম্ভ করি এখানে।

আপাততভাবে এই পাড়া নির্ঝঞ্ঝাটের। আমার বাড়িতে দু ঘর ভাড়াটে। একতলা দোতলায়। তিনতলায় আমরা থাকি। আগে এখানেও ভাড়াটে ছিল বলে আসতে এতদিন সময় লাগল। আমি আমার নিজের ভাড়াটেদের সঙ্গে ছাড়া, আর কারুর সঙ্গেই বিশেষ মিশতাম না। কিন্তু আমরা আসার কিছুদিন পরে আমার বাড়িতে হঠাৎ একদিন আসে প্রদীপ মান্না, দিলীপ মান্না। পাড়ায় তাদের নাকি বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। তবে আমার সঙ্গে এসে এরা প্রথমেই দিদি বলে সম্পর্ক পাতিয়ে নেয়। এরা আমার ঘরের একটি অংশে ভাড়া থাকতে চেয়েছিল। আমি একেবারেই রাজি হইনি। কারণ বিধবা বলেই ঠিক করে রেখেছিলাম, বাড়িতে অচেনা পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ। আমার মাথায় যদিও অর্থের চিন্তা প্রবল, তাহলেও যেনতেন ভাবে টাকা উপার্জন করার আমি ঘোরতর বিরোধী। এত দুঃখের মধ্যেও একটা কথা না বলে পারছি না, আমার ছেলে নাবালক হলেও মায়ের কষ্ট দূর করার জন্য বেশ কিছুদিন ধরে একটি রেশন দোকানে খাতা লিখত। খাতা লেখা বাবদ সে কখনও ২৫০ টাকা কখনও ৩০০ টাকা পেত। অতএব বুঝতেই পারছেন, অভাবের মধ্যে থেকেও মাথা উঁচু করে চলার প্রবণতা তার বাবাই শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। যে কথা চলছিল, আমার কাছে ওই নতুন পরিচিত ছেলেরা বারদুয়েক যাতায়াত করে। এমনকি একথাও বলেছে, যে কোনও বিপদ হলেই যেন তাদের আমরা ডাকি। তবুও বার বার ভাড়া চাইবার জন্য আমাকে উত্যক্ত করতে থাকে। আমি এ-ব্যাপারে অনড় ছিলাম। একদিন তারা এও বলল কিছু লোহার স্ক্র্যাপ ছাদে এনে রাখতে চায়। আমি তাতেও বাধা দিই। এর মধ্যেই বছর খানেক আগে আমি প্রয়োজনে পাঁচ হাজার টাকা ধার করি। বলেছিলাম অল্প অল্প করে শোধ করে দেব। বেশ কিছু টাকা আমি ইতিমধ্যে শোধ দিয়েও দিই। কিন্তু কী যে হল, ঘর না পাওয়াতে আক্রোশ জন্মাল আমাদের উপর প্রচন্ড।

সেদিন ছিল ১৮ই ফেব্রুয়ারী। সরস্বতী পুজো মাত্রই তিনদিন আগে শেষ হয়েছে। বুবুনের এক জ্যাঠা খুবই অসুস্থ বলে সন্ধ্যার মুখে দেখে ফিরছিলাম। ৭/১০-এ সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে নামি। পাড়ার দোকান থেকে পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে এক আমূল কৌটো কিনি। রাধাকৃষ্ণর মন্দিরের কাছাকাছি এসেছি, এমন সময় দিলীপ-প্রদীপের ভাই কুচুন (যতন মান্না) আমার পথ আগলে দাঁড়াল। আর অশ্রাব্য গালাগালি দিতে দিতে আমার কাপড় ধরে টানতে টানতে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের কাছে নিয়ে গেল। ওখানে মান্না পরিবারের আরও কেউ কেউ ছিল, তবে অচেনা ছেলে এবং মেয়েরাও ছিল। আমার মুখে ক্রমাগত চড়, ঘুষি পড়তে লাগল। আমি কিছু

বুঝে ওঠার আগেই পেটে লাথি আর মাথায় লাঠি পড়ল। এরপর আমার দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না, পাড়ার লোকদের মধ্যে কেষ্টবাবু আমায় বাঁচাতে আসেন, কিন্তু তিনিও বাধা পেয়ে ফিরে যান। আমি পড়ে পড়ে যেতে বুঝতে পারি আমার শাড়ি রক্তে ভিজে যাচ্ছে। আমার বুক শত সহস্র হিংস্র আচঁড়ে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে, শুধু ভাবছি বুবুনকে ওরা মেরে ফেলবে না তো। এরপর তারা শাড়ি খুলতে আরম্ভ করে, বাধা দেবার ক্ষমতা কোথায়, যে বাধা দেব। তারপর আমার আর জ্ঞান থাকে না। ওই অবস্থাতেও তারা মুখে মদ ঢেলে দেয়। আমি রক্তের নদীর উপর পড়ে থাকি।

আমার ছেলে খবর পায় অনেক পরে। কারণ বাড়িতেও তারা একই সঙ্গে হামলা করেছে। আমার ছেলেকে বলেছে, তোর মাকে প্রায় শেষ করে দিয়েছি, তুই যদি এখন যাস, তাহলে তোকেও শেষ করব। ছেলের মন তো। শত হুমকিতেও সে টলেনি। দৌড়ে গিয়ে দেখেছে, রক্ত নদীর মাঝে অজ্ঞান বিবস্ত্রা মাকে। যে শাড়িটি আমার পরণে ছিল, সেটিকে দিয়েই সে মায়ের অসম্মানটুকু ঢেকে দেবার চেষ্টা করেছে। তারপর তো কত কান্ডই হল। আমি হয়তো মরে যেতাম, অথবা পঙ্গু হতাম। কারণ এরকম ভয়ঙ্কর অত্যাচার কোনও পুরুষ শত্রুর প্রতি করতে পারে, তা আমার মনে হয় না। আমার নিজের কোনও সম্ভ্রম তারা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেনি। পেটের উপর যে অবিরাম লাথি বর্ষিত হয়েছিল তার জেরে আমি শয্যাশায়ী। ডাক্তাররা সঠিকভাবে এখনও রোগ ধরতে পারেননি। যে বীভৎস অত্যাচার আমাকে সহ্য করতে হয়েছে, তার জন্য দরকার সুচিকিৎসা, প্রচুর অর্থ আর এক গভীর নিরাপত্তাবোধ। যা আমাদের দুই প্রাণীর চারপাশে নেই। এখনও আমি রাতে ঘুমোতে পারি না, দিনে ঘুমোতে পারি না বলে ডাক্তাররা ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রাখছেন। কিন্তু এরপর? এই জড় সমাজের কাছ থেকে আমি কি চাইব? আমার ছেলে, এক বয়ঃসন্ধির সময় দেখেছে ঘাতকের হাতে লাঞ্ছিত হতে মাকে। সে কি আশা করবে? আমরা কি ক্রমশ তলিয়ে যাব এক হতাশার দিকে, নাকি আবার নতুন করে বাঁচতে পারব, আশার আলো দেখতে পাব। এর উত্তর কি কোনও সহৃদয় ব্যাক্তি দেবেন?

দৃশ্য - ২

একজন অসহায় স্বামী বলছেন তার অত্যাচারিতা স্ত্রীর কথা ঃ

অঞ্জনা আমার স্ত্রী। ৮২ সালে আমাদের বিয়ে হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারে বিবাহিত স্ত্রীর যা ভূমিকা, অঞ্জনা তার থেকে ব্যাতিক্রমী নয়। সংসারের পাঁচটা ঝামেলা সামলিয়ে, স্বামীর পরিচর্যা করেই তার দিন চলে যেত। ৮৪ সালে আমাদের ছেলে অভিষেকের জন্ম। ফলে অঞ্জনার ঘাড়েই এসে পড়ে ছেলেকে বড় করে তোলার বাড়তি ঝামেলা। আমি বিবেকানন্দ রায়, এক ছোট ব্যবসায়ী। তবে তিন জনে ভালভাবে থাকার ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি।

চন্ডীতলা ঘোষ লেনের এই বাড়ি আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি। ৪৫ বছরের বাসিন্দা আমরা। চন্ডীতলার নিজেদের বাড়িতেই আমার স্ত্রী এরকমভাবে লাঞ্ছিতা হবে, তা ভাবতে পারিনি। আমার স্ত্রী যেরকমভাবে সমাজবিরোধীদের হাতে মার খেল, তাতে প্রথমে আমি একেবারেই হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এই বাড়ির ভাগে আমরা তিন ভাই আছি। আমি থাকি সবার উপরের তলায়। দোতলা এবং আমার সাধারণ প্যাসেজ বলে আমাদের চাবি কমন।

দোতলার দাদারা এখানে থাকেন না। কিন্তু আমাদের না জানিয়েই তারা এক অচেনা

ব্যক্তির কাছে নাকি বাড়ি বেচে দিয়েছেন। আমরা ব্যাপারটায় পুরোপুরি অবগত ছিলাম না। ফলে নতুন ভাড়াটে বলে দাবী করা ব্যক্তিরা এ-বাড়িতে ঢোকার অনুমতি পায় নি। জানি না এর থেকে আক্রোশ বশতই আমার স্ত্রীর উপর হামলা হল কিনা।

আমাদের দশ বছরের ছেলে অভিষেক পড়ে সাউথ পয়েন্ট স্কুলে। বার্ষিক পরীক্ষা চলছিল তার। নিয়মিত দুপুর তিনটে নাগাদ আমার স্ত্রী ছেলে আনতে যায়। ৮ মার্চেও তার পরিবর্তন ঘটেনি। সবে তিনতলা থেকে দোতলায় নেমেছে অঞ্জনা। এমন সময় দোতলার পথ জুড়ে দাঁড়ায় দুই অচেনা যুবক। প্রথমে অশ্রাব্য গালাগাল করে, তারপরেই তাকে মারতে আরম্ভ করে। এমনকি ধাক্কা দিয়ে দোতলা থেকে একতলায় ফেলে দেয়। মাথাটা গিয়ে লাগে একতলার দরজায়, তারপরই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। শব্দ শুনে একতলার দাদা-বৌদি ছুটে আসেন। এসেই ওই রকম দেখে খুব নার্ভাস হয়ে পড়েন। কিন্তু গুন্ডাদের ধরা যায় নি। তারপর থেকে অঞ্জনাকে তো সুস্থ করে তোলা যাচ্ছে না। থেকে থেকেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে।

অঞ্জনার এই ব্যাপারটা আমাদের পরিবারে খুবই আতঙ্কের ছায়া ফেলেছে। এক নিরপরাধ বাড়ির বউকে কি অপরাধে যে এরমকভাবে লাঞ্ছিত হতে হল, তাই এখন বিচার্যের বিষয়। মেয়েরা বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এখন পুরুষদের হাতে মার খাচ্ছে — এ কথাটা এতদিন শুনতাম, অন্য দৃষ্টিতে আলোচনাও করতাম। কিন্তু সত্যিই তারা কতবড় অসহায়, সেটা আজ মর্মে মর্মে টের পাচ্ছি। আমরা তাহলে যাচ্ছি কোথায়? যে সমাজে মহিলাদের এইটুকু নিরাপত্তা কেউ দিতে পারে না, সেখানে তাহলে প্রশাসন চলে কিসের উপরে। আমার এবং আমার অসুস্থ স্ত্রীর সামনে এখন প্রশ্ন একটাই আমরা যাই কোথায়? মেয়েরা কি এরপর বাড়ি থেকে বেরনো বন্ধ করে দেবে? বাড়িতেই বা এদের নিরাপত্তা কোথায়?

আরও বড় সমস্যা আমাদের দশ বছরের অভিষেককে নিয়ে। গুন্ডারা মাকে মেরেছে — এই কথাটা যখন শুনবে, তখন থেকে তার মন বিষিয়ে উঠবে। শুধু কি তাই, তার মনে যে ভয় বাসা বেঁধেছে সেই ভয় থেকেই জন্ম নেবে শত সহস্র ছিদ্রান্বেষী পথের। যা তাকে সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ হতে বার বার বাধা দেবে।

১৯৯৪ সালে সফিউন্নিসা লিখেছিলেন ঃ

"১৯৯৪ সালটি কি নারী অসম্মান বছর? নারী আন্দোলনকারীদের সমস্ত প্রতিবাদ, দাবি, অভিযোগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে একের পর এক ঘটে চলেছে নারী নিগ্রহের ঘটনা। জানুয়ারী থেকে যেন সুপরিকল্পিতভাবে চিরাচরিত বধূ হত্যা, নারী নির্যাতনের পাশাপাশি সংযোজিত হয়েছে নারী-অসম্মানের ঘটনা।

গোষ্ঠীদ্বন্দের পরিণতিতে নারীর শ্লীলতাহানি নতুন কোনও ঘটনা নয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে শুরু করে পাড়ার চুনো মাস্তানদের পেশী আস্ফালন — সর্বক্ষেত্রেই নারীকে বেছে নেওয়া হয় নৃশংস পৈশাচিক উল্লাসের উপকরণ হিসেবে।

জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে এলাহাবাদের কাছে দাউনা গ্রামে এক হরিজন মহিলাকে নগ্ন করে হাঁটানো হল। প্রকাশ্য দিবালোকে সর্বজনসমক্ষে অসীম দুঃসাহসে কুর্মি সম্প্রদায়ের কিছু লোক এই কান্ড করেছে। জাতপাতের দ্বন্দ্বদীর্ণ রাজ্যে মুলায়ম সিং যাদব ক্ষমতায় আসার পর জাতপাতের দ্বন্দ আরও বেড়েছে। তার পরিণতিতে নারী অসম্মানের ঘটনাও তাল মিলিয়ে

চলেছে। গত ডিসেম্বরে তিনি ক্ষমতায় আসার পর পরই ঘটেছে গণধর্ষণের ঘটনা। বারাবাকিতে এক হরিজন মহিলা শিকার হন গণধর্ষণের। হামিরপুরের বহুজন সমাজ পার্টির এক বিধায়কও এই অপকর্মের সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে ক্ষেতের সামান্য ফসল তোলা নিয়ে বিতণ্ডার পরিণতিতে পঞ্চাশোর্ধ এক মহিলাকে প্রকাশ্য রাস্তায় বিবস্ত্র করা হল। হাঁটানো হল। অবশ্য ঘটনাটি আলোড়ন তোলায় ১৪ জন কুর্মিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কর্তব্যে অবহেলার দায়ে গুরুপুর থানার ষ্টেশন অফিসার সহ চারজন পুলিশ কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়।

জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে পাঞ্জাবে ঘটে গেছে আর এক জঘন্য ঘটনা। পরমেশ্বরী, সুরজিৎ কাউর, মহিন্দার কাউর ও রাজিন্দার কাউর ধর্ষিত হয়েছেন আইন ও শান্তিরক্ষকদের হাতেই। তা নিয়ে কোনও প্রচারমাধ্যমে সেভাবে ধিক্কার জানানো হয়নি। নারী আন্দোলনকারীরা কতটা কী করেছেন তাও আমরা জানতে পারিনি। জাতীয় মহিলা কমিশন গঠন হবার পর সারা দেশে মেয়েদের উপরে নানা ধরণের অবাঞ্ছিত অত্যাচার কি পরিকল্পিতভাবেই ঘটেছে? না, কি পরিচিত অপরাধের একঘেয়েমি কাটাতে অপরাধীরা বেছে নিচ্ছে শুধু মেয়েদেরই?

প্রগতিশীল পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকানো যাক। শোনা যায়, এক সময় এই বাংলার দুর্দান্ত কুখ্যাত ডাকাতরা গৃহস্থ বাড়িতে ডাকাতি করতে গেলে বাড়ির মেয়েদের 'মা' সম্বোধনে নিরাপদ জায়গায় সরে যাবার পরামর্শ দিত।

দলের কোনও হঠকারী সদস্য মেয়েদের গায়ে হাত তুললে বা অসম্মান করলে দলপতি তার শিরোচ্ছেদ করেছে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যেত। এখন দুঃশাসনরা চারপাশে। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার ব্যাপারটি প্রকৃতির অবাঞ্ছিত নিয়ম হিসেবে মেনে নিয়েও বলা যায়, নারীর উপরে এখানে যা চলছে তা সবল দুর্বলের ব্যাপার নয়। মেয়েদের পেটাতে ভাল লাগছে, বিবস্ত্র করতে ভাল লাগছে, যৌন অত্যাচার করতে ভাল লাগছে — অপরাধীদের মধ্যে এই প্রবণতা ক্রমাগত বাড়ছে। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে এক ধরণের যৌন বিকৃতি। মূল্যবোধের অবক্ষয় বললে বড্ডো বেশি আভিধানিক হয়ে যায়। মূল্যবোধ তৈরী করেছে পুরুষই। তাদের একটা শ্রেণী সেটা ভাঙছে। আগে প্রতিবাদ বা প্রতিকার হত, নিন্দার ঝড় উঠত। এখন চা সহযোগে সাধারণ মানুষ এসব খবর পড়েন। উত্তেজিত হয়ে স্বাস্থ্যের, মনের ক্ষতি করেন না।

আলপনা ব্যানার্জির ঘটনা নিয়ে অদ্ভুত কান্ড একের পর এক ঘটছে। রাজনৈতিক রঙ দিয়ে চাপান উতোরের খেলা চলছে। মহিলার স্বভাব চরিত্র নিয়ে দু-একবার কথা উঠেছে। রাজনৈতিক নেতারা দিল্লী ছুঠছেন। কলকাতাতে জনসভাও হচ্ছে। এবং পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা জানি এসবই ঢাকঢোল পিটিয়ে যাত্রা পণ্ড করার সুনিপুণ আয়োজন। পুলিশ প্রশাসন যেমন আছে থাকবে। যারা কাণ্ড ঘটিয়েছে দু'দিন বাদে খোলা রাস্তায় বায়ুসেবন করতে করতে নতুন কোন ঘটনার মহড়া দেবে। আলপনা কতটা দোষী বা দোষী নন সে প্রশ্ন যে আদৌ বড় নয়, প্রশ্ন হল, সভা একটা সমাজে এই ধরণের ঘটনা নারী সমাজের পক্ষে কী ভয়াবহ সেটিই। দোষী বা নির্দোষ মেয়ে মাত্রই যে নিরাপত্তাহীন এবং অসহায় — গোটা দেশের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও আলাদা কিছু নয় তা প্রমাণিত হতে শুরু করেছে অনেক আগেই। এ তারই পুনরাবৃত্তি মাত্র।

আলপনার ঘটনার জের চলতে চলতেই বেপোরয়া কৌতুকে অপরাধীরা আবারও আসরে নেমেছে। চন্ডীতলা লেনে নিজেদের বাড়িতে সমাজবিরোধীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন গৃহবধূ

অঞ্জনা রায়। মদ্যপ অবস্থায় দুই দুষ্কৃতি তাকে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করে। তলপেটে সজোরে লাথি মারে। তার চিৎকারে কোনও ফল হয়নি। পুলিশ রিপোর্ট করার ৬ দিন পরে পুলিশ তার বাড়িতে যায়।

মেয়েদের উপর অপমানের এক নিত্য ধারাবাহিক খেলা যেন চলছে অবাধে। বলা বাহুল্য — নারী ধর্ষণ বা নারী নিগ্রহের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি না হওয়ায় তা অবাধে চলছে। বাড়ছেও। মেয়েদের কোথাও আর নিরাপত্তা নেই। মাত্র কয়েকদিন আগে কান্দি শহরের কাছে এক গৃহবধূ গণধর্ষিতা হলেন। মেলা দেখতে গিয়ে। রাতের নির্জনতায় নয় — সন্ধ্যে বেলা সুযোগ বুঝে দু'জন তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। আরও দু'জন পরে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ফাঁকা মাঠে তাকে নিয়ে ধর্ষণ করে।

উত্তর কলকাতার নীলমণি মিত্র স্ট্রীটেও সেদিন ঘটল একই ঘটনা। কলকাতা পুরসভার প্রসূতি সদনে পুরসভারই এক কর্মী এক যুবতীকে চাকরি দেবার নাম করে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর রক্ষীদের ঘরে তাকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। আরও তিনজন তার সঙ্গে যোগ দেয়। গণধর্ষণের শিকার সেই যুবতীকে প্রচন্ড আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কয়েকদিন আগে শিলিগুড়ির কাছে রাণিডাঙাতে এক মহিলাকে তার সন্তানদের সামনে ধর্ষণ করা হয়। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। নিম্নবিত্ত বা তথাকথিত সমাজের নিম্নস্তরের মহিলাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। বিশেষ করে পরিচারিকা ধর্ষণ তো প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা হতে চলেছে। তা নিয়ে বিন্দুমাত্র আলোড়ন ওঠে না।

বিশেষ কিছু অত্যাচার, অপমান, নিগ্রহ আছে যা শুধু নারীকেই করা যায়। তা করাও হয়ে থাকে। তবে ভারতীয় মূল্যবোধের গভীরে তা গভীর আঘাত হয়ে বাজত এতদিন। ছোটখাট ঘটনাগুলিও গুরুত্ব পেত দু'দশক আগেও। এখন অবস্থা বদলেছে। বিশেষ করে বানতলার ঘটনার হাত ধরে যেন ক্রমাগতই ঘটে চলেছে অবাঞ্ছিত ঘটনা প্রবাহ।

১৯৯০ সালে বানতলার নারকীয় ঘটনা আলোড়ন সৃষ্টি করলেও দোষীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায় নি। তারপর থেকেই যেন নারী নিগ্রহকারীরা উৎসাহ পেয়ে গেছে। এরপরে গঙ্গাসাগরগামী তীর্থযাত্রী মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে। মানিকচকে গদাই-এর চরে বেশ কিছু মহিলাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। বিরাটির ঝুপড়িবাসী মহিলার শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে। সিঙ্গুরের ধর্ষিতা গৃহবধূর কথা অনেকেরই মনে আছে। রাজ্য ফরেনসিক ল্যাবরেটরির এক মহিলা কর্মী বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির এক নেতা সবার সামনে সবার সামনে তাকে যথেচ্ছ প্রহার করে। দুষ্কৃতীরা কোথাও শাস্তি পায় নি। এর মধ্যে নেহারবানু ধর্ষণের ঘটনা অবশ্য বেশ সাড়া ফেলে। অন্যদিকে লালবাজারের সামনে পুলিশ গাড়ির একজন চালক এক মহিলার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। তারও শাস্তি হয় নি। বছর তিনেক আগে এসপ্ল্যানেডের বুকে রাত ন'টায় মহিলাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সারারাত ধরে গণধর্ষণ করা হয়। মধ্য কলকাতার বারের এক গায়িকাকে অপহরণ করে শ্লীলতাহানি করে দুষ্কৃতীরা। বলা বাহুল্য, কোনও ক্ষেত্রেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায় নি অপরাধী। কোথাও কোথাও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা।

রাজ্যে নারী নিগ্রহের ঘটনা বাড়ছে স্বীকার করেছে মহিলা কমিশনও এর কারণ হিসেবে অপরাধীদের গুরুপাপে লঘুদন্ড দাবি করাও হয়েছে। মহিলাদের উন্নতির জন্য কত না পরিকল্পনা

নেওয়া হচ্ছে হত কয়েক বছরে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মহিলা শাখা মহিলা সমাজের অতন্দ্র প্রহরারত বলে নিজেদের দাবী করে থাকে। মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে কত না সভা সমিতি, সেমিনার হচ্ছে। গঠিত হয়েছে মহিলা সেল, মহিলা কমিশন। এক কথায় আয়োজনের কোনও ত্রুটি নেই।

ত্রুটি শুধু এক জায়গাতেই। মানুষের প্রতিবাদী চেতনা লুপ্ত হতে চলেছে। চোখের সামনে যে কোনও অন্যায়কে মেনে নিতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। বিপন্ন নারীর আর্তনাদ তাই আমাদের কানে পৌঁছায় না। বিপদগ্রস্তের দিকে ফিরে তাকানোর চাইতে চোখ ঘুরিয়ে নেওয়া সুবিধাজনক মনে করি। প্রতিবাদী শহর কলকাতা, বিবেকের শহর কলকাতা, সংস্কৃতি প্রেমী কলকাতা, সভ্যতা গর্বী কলকাতার বুকে তাই প্রকাশ্য রাজপথে দুঃশাসনেরা নারীর বস্ত্র হরণের খেলায় নামে।"

নারী নির্যাতন বৃদ্ধির প্রধান কারণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, বিশেষত ২৬ বছর ধরে ক্ষমতাভোগকারী সি পি এমের প্রশ্রয়। ক্ষমতাসীন দসের ছত্রছায়ায় থেকে এক শ্রেণীর সমাজদ্রোহী অপরাধপ্রবণ নারী মাংসাসী নর পিশাচের দল নাবী সংহারের তান্ডবলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি ঘটনার কথা বলছি।

দৃশ্য - ৩

রায়তী জায়গার ওপর রাস্তা করতে না দেওয়ায় (০৩.০৪.০৩) মহিলা সমিতি ও সি পি এম কর্মীরা ভগবানপুরে এক মহিলার ওপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে। গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারা হয়। ওই মহিলার বিভিন্ন অঙ্গে ঠ্যাঙারেরা পিন ফুটিয়ে দেয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে বুকে, পিঠে এবং তলপেট চিরে দেওয়া হয়। প্রায নগ্ন মহিলা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা হারান। ওই অবস্থাতেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত গাছে দড়ি বাঁধা অবস্থায় মহিলা এক ঘন্টা পড়ে থাকেন। পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে।

ভয়ঙ্কর এই অত্যাচারের ঘটনাটি ঘটেছে ভগবানপুর থানার চরাবার গ্রামে। লাঞ্ছিতা মহিলার নাম পুষ্পরাণী পাত্র (৩৬)। তিনি কুলবেড়িয়া উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সেবিকা। তৃণমূল সমর্থক স্বাস্থ্যকর্মীর বিরুদ্ধে সি পি এমের অত্যাচারের প্রতিবাদে বুধবার ভগবানপুরে তৃণমূলীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সি পি এমের ভগবানপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক গৌরহরি বর ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, মহিলা সমিতি নেতৃত্ব দিলেও আসলে তা ছিল সমস্ত গ্রামবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। তৃণমূল কংগ্রেস বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করছে। এতে সি পি এমেরই লাভ হবে।

ভগবানপুর হাসপাতালে শুয়ে পুষ্পরাণী পাত্র বলেন, বাড়িতে আমি আর আমার ৭৫ বছরের বিধবা মা থাকি। আমার মা ষাট বছর আগে ২ ডেসিমল জমি রাজাদের কাছ থেকে পাট্টা পেয়েছিল। আমরা তার ওপরেই বাড়ি করে রয়েছি। সি পি এমের নেতারা এসে বলে আমাদের রায়তী জায়গার ওপর মোরাম রাস্তা হবে। আমি বাধা দিয়েছিলাম এবং বিচারের জন্য কাঁথি আদালতে মামলা করি। সি পি এম আমাকে ও বিধবা মাকে মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু তা করিনি। এতেই ওরা আমারে হুমকি দিত।

মঙ্গলবার চরাবারের বাড়ি থেকে কর্মক্ষেত্র কুলবেড়িয়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার সময়

রাস্তা থেকে আমাকে তুলে নিয়ে যায়। অত্যাচারের বিবরণ দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন পুষ্পদেবী। তিনি বলেন, চরাবারে খালপাড়ে বেশ কয়েকজন সি পি এম কর্মী আমাকে জাপটে ধরে। এরপর টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে একটি গাছে বাঁধে। আমার শাড়ি খুলে নেওয়া হয়। এরপর ওরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। টেনসর দিয়ে আমার বুকে, পিঠে, পেটে চিরে দেওয়া হয়। শরীরের গোপন জায়গায় আলপিন ফোটাতে থাকে। লজ্জায়, ভয়ে বেহুঁশ হয়ে যাই।

তৃণমূল বিধায়ক অর্ধেন্দু মাইতি বলেন, পুষ্পদেবী অজ্ঞান হয়ে গেলে মহিলা সমিতি ও সি পি এমের কর্মীরা পালিয়ে যায়। এক ঘন্টা গাছে বাঁধা অবস্থাতেই পড়ে থাকেন। তারপর পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে। ভগবানপুর থানায় অভিযোগেও পুষ্পরাণী পাত্র এই অত্যাচারের কথা লিখেছেন। এগরার এস ডি পি ও অঞ্জন চক্রবর্ত্তী বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। পুলিশ গিয়ে মহিলাকে উদ্ধার করেছে। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভগবানপুর হাসপাতালে কেউই পুষ্পরাণীর চোট নিয়ে কথা বলতে চাননি। তবে হাসপাতাল সূত্র জানাচ্ছে, তার সারা শরীরে গভীর ক্ষত রয়েছে। বিভিন্ন অঙ্গের চোটও গুরুতর। রোগিনী স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতেও পারছে না।

এক মহিলার ওপর ভয়ঙ্কর অত্যাচারের পরেও স্থানীয় সি পি এম নেতারা ভাবলেশহীন। ভগবানপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক গৌরহরি বর বলেন, ওই মহিলাই জবরদখলকারী। গ্রামের রাস্তা অবরোধ করার চেষ্টা করছে। মহিলা সমিতির নেতৃত্বে ৫০-৬০ জন মহিলা তার প্রতিবাদ করেছে। গৌরহরিবাবু বলেন, মারধর হলেও যতটা বলা কওয়া হচ্ছে ততটা হয়নি। অত্যাচারে পুরুষ কর্মীরা ছিল এ কথা তিনি মানতে চাননি। তিনি বলেন, মহিলা সমিতির মেয়েরাই ওকে গাছে বেঁধে মারধর করেছিল। তবে এর মধ্যে কোনও অন্যায় দেখেননি না সি পি এমের লোকাল কমিটির সম্পাদক। তিনি বলেন, 'গ্রামের মানুষকে সঙ্গে নিয়েই মহিলা সমিতি যা করার করেছে। তাছাড়া রাস্তা অবরোধকারী ও জবরদখলকারী মহিলার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ ছিল সাধারণ মানুষের। মঙ্গলবারের ঘটনা তারই বহিঃপ্রকাশ।' ওই মহিলার বাড়িতে সমাজ বিরোধীদের নিয়মিত যাতায়াত আছে বলেও অভিযোগ তুলেছিল সি পি এম।

তৃণমূল বিধায়ক অর্ধেন্দু মাইতি বলেন, 'সি পি এমের মহিলা সমিতিকে সমাজ শোধরানোর দায়িত্ব কে দিয়েছে? থানার অভিযোগ পত্রে চারজন সি পি এম নেতার নাম রয়েছে। পুলিশ মহিলা সমিতির নেত্রী ও সি পি এম নেতাদের গ্রেপ্তার না করলে আমরা ভগবানপুর অচল করে দেব।'

দৃশ্য - ৪

এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে বামনগোলায় ফ্রন্টের দুই শরিক সি পি এম এবং আর এস পি-র মধ্যে বিবাদ তুঙ্গে উঠেছে। অভিযোগ, বামনগোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সি পি এম প্রধান হবিবুদ্দিন সরকার তাঁরই দফতরের চতুর্থ শ্রেণীর এক অস্থায়ী কর্মীর স্ত্রীকে অফিসেই ধর্ষণ করেছেন। মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত ওই কর্মী আত্মহত্যারও চেষ্টা করেন। বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করেন ধর্ষিতা মহিলাও। গ্রামবাসীরা তাকে আটকান। মঙ্গলবার রাতে ওই মহিলা বামনগোলা থানায় সি পি এম প্রধানের বিরুদ্ধে

লিখিত অভিযোগ করেন। বুধবার পুলিশ ঐ গ্রামে পৌঁছনোর আগেই অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধান পালিয়ে যান বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। তাদের অভিযোগ, ধর্ষিতা এবং তার স্বামীকেও স্থানীয় সি পি এম কর্মীরা এদিন সকালে গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছেন।

মালদহের পুলিশ সুপার পঙ্কজ দত্ত বলেন, "ধর্ষিতার লিখিত অভিযোগ পেয়ে আমরা নির্দিষ্ট মামলা শুরু করেছি। অভিযুক্ত প্রধানের খোঁজ মেলেনি। তাকে পেলেই গ্রেফতার করব।" এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সি পি এম এবং আর এস পি-র মধ্যে কাজিয়া শুরু হয়েছে। সি পি এম নেতাদের বক্তব্য, তাদের হেয় করার জন্য আর এস পি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই কুৎসা রটাচ্ছে।

সি পি এমের জেলা সম্পাদক জীবন মৈত্র জানিয়েছেন, এই ঘটনায় তৃণমূলের হাত আছে। যদিও যার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ, সেই হবিবুদ্দিনের স্ত্রী মাসুদা বিবি বলেন, "আমার স্বামীর বদনাম করার জন্যই তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আমার স্বামী এলাকায় জনপ্রিয়। বামনগোলায় প্রার্থী-তালিকা তৈরীর জন্য জেলা কমিটি আমার স্বামীকে দায়িত্ব দিয়েছিল। আমার স্বামী এ কাজ করতে পারে না।"

জামতলায় গিয়ে দেখা যায়, গোটা ঘটনায় বাসিন্দারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। স্থানীয় সূত্রের খবর, বামনগোলা পঞ্চায়েতে গত তিন বছর ধরে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করছেন ধর্ষিতার স্বামী। মাসিক ৫০০ টাকায় তিনি পঞ্চায়েত অফিসে সাফাই কর্মী হিসাবে কাজ করতেন। তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী মাঝেমধ্যেই ওই অফিসে ঝাড়ু দিতেন। অন্যান্য দিনের মতো গত শুক্রবার সকাল ৮টা নাগাদ অফিসের তালা খুলে ঘরদোর সাফ করছিলেন ওই মহিলা। আচমকাই হবিবুদ্দিন অফিসে আসেন। ওই মহিলার হাত ধরে টেনে নিজের চেম্বারে ঢুকিয়ে প্রধান তাকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ।

এই খবরে মহিলার স্বামী মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। স্থানীয় সি পি এম নেতাদের কাছে এর সুবিচার চাইতে গেলে তাকে হুমকি দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। বাড়ি ফিরে ক্ষোভে-দুঃখে ওই ব্যক্তি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের চেষ্টায় তিনি বেঁচে যান। স্বামীকে আত্মহত্যার চেষ্টা করতে দেখে রবিবার সকালে ওই মহিলাও বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

সি পি এমের বামনগোলা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি নিখিলচন্দ্র সিকদার বলেন, "প্রধানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা একেবারে মিথ্যা। আমাদের কাছে কেউ কোনও অভিযোগ করেননি।" তার অভিযোগ, সি পি এম ছেড়ে যারা আর এস পি-তে যোগ দিয়েছে, তারাই ধর্ষণের অভিযোগ করছে। উদ্দেশ্য, সি পি এম-কে হেয় করা।"

এই অভিযোগের তীব্র বিরোধিতা করে স্থানীয় আর এস পি নেতা বিনোদ প্রামাণিক বলেন, "ধর্ষণের ঘটনায় দলের প্রধান ফেঁসে যাওয়ায় সি পি এম এখন উল্টোপাল্টা বকছে। দীর্ঘদিন ধরে সি পি এম এই এলাকায় যা খুশি করছে।"

দৃশ্য - ৫

নদীয়ার ধানতলার পর এবার কোচবিহারের ঘোকসাডাঙার ছেড়ামারি গ্রাম। সেখানে নিজের বাড়িতেই গণধর্ষনের শিকার হয়েছেন সি পি এমের মহিলা সংগঠনের এক সদস্যা। তিনি

নিজেই থানায় গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ জানিয়েছেন। ডাক্তারি পরীক্ষায় গণধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় একটি হাইস্কুলের শিক্ষাকর্মীপদে নিয়োগ নিয়ে এই মহিলার সঙ্গে সি পি এম কর্মীদের একাংশের বিরোধের জেরেই ওই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। গণধর্ষণের অভিযোগে সি পি এমের তিন কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

ওই মহিলা পুলিশের কাছে বলেছেন, ২২ ফেব্রুয়ারী রাতে বাড়িতে তার সঙ্গে ছিল কেবল তার নাবালক সন্তান। মাঝরাতে তিনি শৌচাগারে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বেরোলে দুষ্কৃতীরা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ছেলের সামনেই তারে পর পর ধর্ষণ করে। মহিলা জানান, "ধর্ষণকারীরা মোট ক'জন ছিল, বলতে পারব না তবে আমার তিন জনের কথা মনে আছে। তার পরে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।" পরের দিন মহিলা নিজেই ঘোকসাডাঙা থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান।

ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গত ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারী তিন জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের মধ্যে এক ব্যক্তি ওই মহিলার দেওর। তবে গণধর্ষণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সি পি এমের লোকাল কমিটির সদস্য সমিরুদ্দিন মিঞা এবং অন্য অভিযুক্তদের পুলিশ এখনও ধরতে পারেনি। পুলিশ বলছে, সমিরুদ্দিনকে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ তিনি প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সমিরুদ্দিন ও তার সঙ্গীরা ওই মহিলার বিরুদ্ধে মিছিল বার করে তার নামে গ্রামের বাড়ি বাড়ি হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ। হামলার আশঙ্কায় পুলিশও তাকে গ্রামে ফিরতে বারণ করায় ওই মহিলা এখন আটপুকুরি গ্রামে তার বাপের বাড়িতে আছেন।

নদীয়ার ধানতলার ঘটনার মতো এই ক্ষেত্রেও প্রথম থেকেই পুলিশ শাসক দলকে আড়াল করতে শুরু করেছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার পরভিন কুমার বলেছেন, "এই ঘটনার পেছনে কোন রাজনীতি নেই। তবে একাধিক ব্যক্তি যে মহিলাকে ধর্ষণ করেছে, তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। তিন জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। যাতে দ্রুত চার্জশিট দেওয়া যায়, সেই চেষ্টা করব আমরা।" মাথাভাঙার সি আই রাধেশ্যাম ঘোষ বলেন, "মহিলার ডাক্তারি পরীক্ষায় গণধর্ষণের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তিন জন গ্রেফতার হয়েছে। বাকিদেরও খোঁজ চলছে।"

সি পি এমের মাথাভাঙা-ঘোকসাডাঙা জোনাল কমিটির সম্পাদক নারায়ণ সরকার গণধর্ষণের অভিযোগটি 'সাজানো' বলে দাবী করলেও স্বীকার করে নিয়েছেন, "একটি স্কুলের শিক্ষাকর্মী-পদে চাকরি নিয়ে ওই মহিলার সঙ্গে স্থানীয় সি পি এম কর্মীদের বিরোধ রয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে তারই প্রতিশোধ নিতে ওই মহিলা গণধর্ষণের ঘটনাটি সাজিয়েছেন। পুলিশ ঠিকমতো তদন্ত করলেই সত্য বেরিয়ে পড়বে।" তবে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যাকে গণধর্ষণের অভিযোগে দলেরই তিনজনের গ্রেফতার হওয়ার খবর সি পি এমের কোচবিহার জেলা সম্পাদক চন্ডী পালের কাছে পৌঁছায়নি। তার কথায় "আমি এখনও এ-রকম কিছু শুনিনি। খোঁজ নিয়ে দেখব, ঠিক কি হয়েছে।"

গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির এই সদস্যার অভিযোগ, কয়েক বছর আগে তাদের পরিবার পাটাকামারি রাজেন্দ্রনাথ হাইস্কুলের ভবনটি তৈরী করে দিয়েছিল। সম্প্রতি তারা আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়েছেন। সেই জন্য ওই স্কুলের মহিলা শিক্ষাকর্মীর পদে চাকরীর ইন্টারভিউয়ের সময় স্থানীয় সি পি এম কর্মীদের একাংশ তাকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার দাবী

তোলেন। কিন্তু বাধা দেন সমিরুদ্দিন মিঞা ও তার শাগরেদরা। মহিলার বক্তব্য, তারা নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকেই ইন্টারভিউয়ের সময় মনোনীত করেন। কিন্তু ওই মহিলা মনোনীত প্রার্থীর স্কুল সার্টিফিকেট জাল বলে অভিযোগ করেন জেলা প্রশাসনের কাছে। এমনকি সি পি এমের এক স্থানীয় নেতাই যে এই জাল সার্টিফিকেট বিক্রি করছেন, সে-কথাও তিনি তার অভিযোগে জানান। তার পরেই শিক্ষাকর্মী পদে ওই নিয়োগ বাতিল হয়।

ওই মহিলা বলেন, "তার পরেই আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। প্রথমে ওরা দেওরদের সঙ্গে আমার গোলমাল বাধিয়ে দেয়। তার পরে আমার চরিত্র নিয়ে কুৎসা রটনা শুরু হয়। এ-সব দেখে ভয় পেয়ে আমার স্বামী চাকবির খোঁজে গ্রাম ছেড়ে জয়গাঁ চলে যান। তার পরে আমাকে গণধর্ষণ করে গ্রাম থেকে তাড়ানোর পরিকল্পনা করে ওরা।" তার আরও অভিযোগ, তাকে গ্রামে ফিরতে দেওয়া হচ্ছে না। সমিরুদ্দিন লোকজন নিয়ে প্রতিদিন গ্রামে তার বিরুদ্ধে মিছিল করছেন। ওই মহিলার হয়ে কেউ কথা বললে তারও চরম সর্বনাশ করা হবে বলে গ্রামবাসীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

ঘোকসাডাঙা থানার ও সি পি প্রধানের দাবি, "আমরা সমিরুদ্দিনকে খুঁজে পাচ্ছি না।" যদিও বৃহস্পতিবার ছেড়ামারি গ্রাম লাগোয়া জয়ন্তীর হাটে সি পি এমের কার্যালয়ে গিয়ে তার দেখা মিলেছে। তিনি তখন সান্ধ্য মিছিলের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন। ধর্ষণের অভিযোগ অস্বীকার করে তার বক্তব্য, "স্কুলের চাকরি নিয়েই যত গন্ডগোল। তবে পার্টির নেতাবা বললে আমি থানায় আত্মসমর্পণ করব।"

ধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে কটাক্ষে ক্ষুব্ধ বাম নেত্রীরাও

ধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না বলে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেওয়ার পরেও কোচবিহারের ঘোকসাডাঙায় গণধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেত্রীরা ক্ষুব্ধ। ওই ঘটনার সঙ্গে তাদের দলের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, সেই বিষয়ে কথা বলার সময় সি পি এম-এর রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস ধর্ষিতার 'জীবনযাপন' নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে বলে মন্তব্য করেন। অনিলবাবুর এই মন্তব্যে বিরোধী দল তো বটেই, বামফ্রন্টের শরিক আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লকের মহিলারাও ক্ষুব্ধ। তাদের কথায় ঃ 'ঘটনার সত্যাসত্য বিচার হবে তদন্তে। কিন্তু তদন্তের কাজ শুরু হওয়ার আগেই অনিলবাবু কার্যত ধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এটা উচিত হয় নি।'

আর এস পি নেত্রী গীতা সেনগুপ্ত বলেন, "সংবাদপত্রে অনিলবাবুর মন্তব্য পড়ে আমার খুব অবাক লেগেছে। একজন মার্কসবাদী, বামপন্থী হিসাবে অনিলবাবুর এ-ধরণের মন্তব্য করা উচিত হয় নি। কেননা, আইনে ধর্ষণের যে সংজ্ঞা আছে, তাতে এক জন পতিতাকে ধর্ষণ করলেও সেটা অন্যায়। শাস্তিযোগ্য অপরাধ।"

এর আগে বিরাটিতে মহিলাদের গণধর্ষণের ঘটনা প্রসঙ্গে অনিলবাবুদের পার্টির মহিলা সংগঠন 'পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি'-র এক নেত্রী ধর্ষিতাদের চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে গীতাদেবী বলেন, "প্রশ্নটা কাকে ধর্ষণ করা হয়েছে, তা নিয়ে নয়। কারণ, যে মহিলাকেই ধর্ষণ করা হোক, যে বা যারা করেছে, আইনের চোখে সে বা তারা অপরাধী। অনিলবাবুদের তো এটা জানা উচিত।"

অনিলবাবু অবশ্য তার মন্তব্য থেকে এক চুলও নড়েননি। তিনি আবারও বলেন, "কারও জীবনযাপন নিয়ে প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন উঠবেই। গ্রামের লোকেরাই বলছেন।" অর্থাৎ ঘোকসাডাঙার ধর্ষিতার চরিত্র খারাপ। কিন্তু খারাপ চরিত্র হলেই কি তাকে ধর্ষণের শিকার হতে হবে? এই প্রশ্নের জবাবে সি পি এম-এর রাজ্য সম্পাদক বলেন, "চরিত্র খারাপ হলেই যে তাকে ধর্ষণ করা হবে, এমন কথা তো বলা হয় নি। আমরা মনে করি, ধর্ষণ একটা বর্বরোচিত কাজ। এটা অপরাধ। আমরা নিন্দা করি। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, আদৌ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে কিনা। তা তো পুলিশ বলবে। মেডিক্যাল রিপোর্ট বলবে।

সি পি এম-এর মহিলা সংগঠনের নেত্রীবা এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ঘোকসাডাঙার বিষয়ে অনিলবাবুর মন্তব্যের ব্যাপারে প্রাক্তন সি পি এম সাংসদ মালিনী ভট্টাচার্যের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমাদের মহিলা কমিশন ব্যাপারটি দেখছে। আমি এই বিষয়ে এখন কোন মন্তব্য করব না।" সন্ধ্যায় রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ার পার্সন যশোধরা বাগচি বলেন, "আমরা জেলা প্রশাসনের কাছে ওই ঘটনার সবিস্তার রিপোর্ট চেয়ে বার্তা পাঠাচ্ছি। কমিশনের ফুল বেঞ্চে সেই রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।" ধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে ইতিমধ্যে যে-প্রশ্ন তোলা হয়েছে, সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে যশোধনা দেবী বলেন, "ওই সব ব্যাপারে আমাদের কোনও মাথাব্যাথা নেই। যে কোনও মহিলা নিপীড়িত নির্যাতিত হলে আমরা তার পাশে আগেও দাঁড়িয়েছি, এখনও দাঁড়াব। কোনও ব্যতিক্রম হবে না।"

তবে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেত্রী অপরাজিতা গোপ্পী মনে করেন, "কোনও মহিলার উপরে অত্যাচার হলে তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোল ঠিক নয়।" তৃণমুল কংগ্রেসের মতো তাঁরাও ঘটনার সবিস্তার তথ্যানুসন্ধানের জন্য দলীয় মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিদের ঘোকসাডাঙায় পাঠাচ্ছেন বলে জানান অপবাজিতা দেবী। অনিলবাবুর মন্তব্য প্রত্যাহারের দাবি তুলেছেন কংগ্রেস ও তৃণমূলের মহিলা সংগঠনের নেত্রীরা। প্রয়োজনে তাঁরা রাস্তায় নেমে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন। প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এ-দিন ঘোষণা করেছেন, "অনিলবাবু ঘোকসডাঙায় মহিলার চরিত্র নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, আমরা তার প্রতিবাদ করছি। অনিলবাবু মন্তব্য প্রত্যাহার না-করলে আমরা প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নামব।" কোচবিহারের জেলা কংগ্রেস নেত্রী সবিতা রায়ের অভিযোগ, "দলের অপরাধী কর্মীদের আড়াল করতেই সি পি এম ওই গৃহবধূর চরিত্রহননের চেষ্টা করছে।" তৃণমূল নেত্রী মালা রায় বলেন, "আমরাও আন্দোলন করব। দল বিপাকে পড়লেই অনিলবাবুরা দোষীদের আড়াল করতে মহিলাদের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সি পি এম নেতাদের প্রশ্রয়েই ধর্ষণকারীরা একের পর এক দুষ্কর্ম করছে।"

অনিলবাবু অবশ্য তৃণমূলের এই অভিযোগকে আমল না দিয়ে বলেন, "সি পি এম-এর নামে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের পার্টির কেউ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়।"

এবার আদালতে ধর্ষিতাদের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না

খুব শীঘ্রই ধর্ষণ মামলার জেরায় ধর্ষিতাদের নৈতিক চরিত্র নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন তোলা যাবে না। সেই মর্মে ভারতীয় সাক্ষ্য আইন (ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট) সংশোধন করার সিদ্ধান্ত

আগামীকাল মঙ্গলবার নিতে চলেছে বাজপেয়ী সরকার। উদ্দেশ্য হল ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্তদের দন্ডদান সুনিশ্চিত করা এবং ধর্ষিতা মহিলাদের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করা। যাতে আদালত কক্ষে জেরায় নৈতিক চরিত্র হননের ভয়ে ধর্ষিতা মহিলারা মামলা রুজু করার সাহস না খোয়ান।

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রক এই মর্মে একটি নোট তৈরী করেছে। ওই নোটে বলা আছে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১৫৫ (৪) ধারাটি পুরোপুরি বাতিল করে দিতে হবে। আগামীকাল মঙ্গলবার সকালে এখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এটি হল অন্যতম প্রধান এজেন্ডা। কাল মন্ত্রিসভার বৈঠকেই এ-ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সবকারি সূত্রে জানা গেল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের জন্য আইনমন্ত্রক যে নোট তৈরী করেছে তাতে বলা হয়েছে, ব্রিটিশ জমানায় তৈরী ১৮৭২ সালের ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১৫৫ (৪) ধারাটি সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের মান-সম্ভ্রম ও ইজ্জতের পরিপন্থী। কারণ সাক্ষ্য আইনের এই মান্ধাতার আমলের ধারাটির সুযোগ নিয়ে ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্তদের কৌঁসুলিরা হামেশাই আদালতে জেরার সময় ধর্ষিতা মহিলার নৈতিক চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারা প্রমাণ করার চেষ্টা চালান যে আসলে ধর্ষণ হয়নি। ধর্ষিতা মহিলাই নষ্টা চরিত্রের।

এভাবে পূর্ণ আদালত কক্ষে চরিত্রহানি এবং সামাজিক মান মর্যাদা খোয়ানোব ভয়ে বহু ধর্ষিতা মহিলাই আদতে থানায় গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের বা আদালতে মামলা রুজু করতে চান না। আর তারই সুযোগ নিয়ে ধর্ষণকারীরা বিনা দন্ডে বুক ফুলিয়ে সমাজে ঘুরে বেড়ায়। সম্প্রতি আইন কমিশন এবং জাতীয় মহিলা কমিশন যৌথভাবে ধর্ষণ মামলায় সাক্ষ্য আইনের এই ত্রুটি দূর করার জন্য বাজপেয়ী সরকারেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকের ওই নোটে বলা হয়েছে, আইন কমিশন এবং জাতীয় মহিলা কমিশন মত দিয়েছে যে, শ্লীলতাহানি এবং ধর্ষণের অপরাধের সঙ্গে ধর্ষিতা মহিলার চরিত্রের নৈতিকতা বা অনৈতিকতার কোনও যুক্তিসম্মত সম্পর্ক বা সংশ্রব নেই।

মহিলার চরিত্র নৈতিক বা অনৈতিক যাই হোক না কেন, তিনি যে ধর্ষিতা হয়েছেন বা তার যে শ্লীলতাহানি হয়েছে সেটাই আইনের চোখে (অর্থাৎ আদালতে) একমাত্র বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত। সর্বোপরি আদালতের জেরায় ধর্ষিতা মহিলাকে অবাধে চরিত্রের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তা সংশ্লিষ্ট মহিলার ইজ্জত এবং আত্মমর্যাদাকে ধূলিসাৎ করে দেয়।

তাই কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রক ঠিক করেছে, ভারতীয় সাক্ষ্য আইন সংশোধন করে ওই ১৫৫(৪) ধারা বাতিল করে দেওয়া হোক। এবং একই সঙ্গে সাক্ষ্য আইনে নির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া হোক যে, ধর্ষণ, ধর্ষণের প্রচেষ্টা এবং শ্লীলতাহানি সংক্রান্ত মামলার জেরায় ধর্ষিতা মহিলার চরিত্রের নৈতিকতা নিয়ে কোনও প্রশ্নই তোলা যাবে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এ-ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলে মহিলা তথা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা বাজপেয়ী সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। (বর্তমান, ১২/১১/০২)

নিজেই ধরা দিলেন সেই সমিরুদ্দিন মিঞা। পুলিশ বহু তল্লাশির পরেও যাকে খুঁজে পায় নি, ঘোকসাডাঙায় গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির এক সদস্যাকে গণধর্ষণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত, সি পি এম-এর 'সম্পদ' সেই সমিরুদ্দিন মিঞা ওরফে ক্যালসা সোমবার মাথাভাঙা মহকুমা

বিচার বিভাগীয় আদালতের বিচারক এ কোঙার সি পি এম-এর শিলডাঙা লোকাল কমিটির ওই সদস্যকে এ-দিন জেল হাজতে পাঠিয়ে দেন। আত্মসমর্পণ করলেও ওই সি পি এম নেতার দাবি, "আমি নির্দোষ। দলের নির্দেশ মেনেই আত্মসমর্পণ করলাম। পুলিশ ঠিকমতো ঘটনার তদন্ত করলেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।"

সমিরুদ্দিন দোষী কি না, আদালতে তা প্রমাণসাপেক্ষ হলেও ছেড়ামারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সি পি এম গোষ্ঠী-দ্বন্দ প্রকট হয়ে উঠেছে। সি পি এম সূত্রে জানা গেছে, গোষ্ঠী-দ্বন্দের কারণেই ছেড়ামারির ঘটনা ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে জেলা পর্যায়ের তিন জন নেতাকে নিয়ে তদন্ত কমিটিও গড়া হয়েছে। সি পি এমেব ছেড়ামারির শাখার সদস্য ভবেশ বর্মণ বলেন, "দলেরই কিছু লোক ক্যালসাদাকে সহ্য করতে পারছিল না। ওই গোষ্ঠীর লোকেরাই এই মহিলাকে হাত করে মামলাটি সাজিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সেই জন্যই দলীয় পর্যায়ে তদন্ত চাওয়া হচ্ছে, যাতে গোটা ঘটনার পিছনে যে সব কর্মীর হাত আছে, তারা শাস্তি পায়।" দলেরই এক সদস্যাকে গণধর্ষণের ঘটনায় তিন কর্মীকে যে গ্রেফতার করা হয়েছে, কোচবিহার জেলা সি পি এমের সম্পাদক চন্ডী পালকে দলের পক্ষ থেকে তা জানানো হয়নি।

গত ২২ ফেব্রুয়ারী ঘোকসাডাঙা থানার ছেড়ামারি গ্রামের সি পি এম-এর মহিলা সমিতির সদস্যাকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মী নিয়োগ নিয়ে বিরোধের জেরে সমিরুদ্দিন ও তার শাগরেদরাই তার 'চরম সর্বনাশ' করেছে বলে ওই মহিলা থানায় অভিযোগ জানান। পুলিশ তদন্তে নেমে তিনজনকে গ্রেফতার করে। তবে প্রধান অভিযুক্ত সমিরুদ্দিন এলাকায় ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ তাকে ধরছে না কেন — এই প্রশ্নে এলাকায় তোলপাড় শুরু হয়। ঘোকসাডাঙা থানার ও সি পি প্রধান বলেন, "সমিরুদ্দিনকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।" যদিও গত বৃহস্পতিবার ছেড়ামারি গ্রাম লাগোয়া জয়ন্তীর হাটে সি পি এম-এর দলীয় কার্যালয়ে তাব দেখা মেলে। এমনকি সমিরুদ্দিন সে-দিনই সাংবাদিকদের জানান, "পার্টির নেতারা বললে আমি থানায় আত্মসমর্পণ করব।"

সি পি এম-এর রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস এবং দলের অন্য নেতারা অভিযোগকারিণীর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুললেও ছেড়ামারি গ্রামের বাসিন্দাদের বক্তব্য, ওই কথা বলে পরোক্ষ ভাবে তারা অভিযুক্তকেই আড়াল করার চেষ্টা করছেন। বিশেষ করে সমিরুদ্দিন মিঞার বিরুদ্ধে যেখানে ভূটানি মদের বেআইনী কারবার, বাংলাদেশে গরু পাচার চক্র নিয়ন্ত্রণ করার মতো গুরুতর অভিযোগ আছে। শেষ পর্যন্ত 'বিতর্ক এড়াতেই' দলের নেতারা এই অভিযুক্তকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিতে বাধ্য হন বলে দলীয় সূত্রের খবর।

সমিরুদ্দিন ওরফে ক্যালসা নিজেকে 'নির্দোষ' বললেও তার আত্মসমর্পণ করার খবরে ছেড়ামারি গ্রামের বাসিন্দারা স্বস্তির শ্বাস ফেলেছেন। তাঁদের অনেকেই বলেন, "সি পি এম-এর ছত্রচ্ছায়ায় থেকে গোটা এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন ক্যালসা। তাকে ডিঙিয়ে গ্রামের কারও পক্ষে পুলিশের কাছে পৌঁছনোরও সাহস ছিল না।"

ধানতলা ও ঘোকসাডাঙার গণধর্ষণের ঘটনা নিয়ে বিধানসভা ছিল সরগরম। দু'টি ঘটনাতেই পুলিশ শাসক দলের লোকদের আড়াল করছে অভিযোগ তুলে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং এস ইউ সি-র সদস্যেরা কিছুক্ষণের জন্য কক্ষত্যাগ করেন। অন্য দিকে, বিধানসভার দক্ষিণ-পশ্চিম গেটে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সদস্যরা তুমুল বিক্ষোভ দেখান।

বিধায়ক সোনালী গুহ, কলকাতা পুরসভার মেয়র-পারিষদ মালা রায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের মহিলারা জোর করে বিধানসভায় ঢুকতে গেলে পুলিশের সঙ্গে তাদের ধস্তাধস্তি হয়। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পুলিশ বিক্ষোভকারিণীদের গ্রেফতার করে লালবাজারে পাঠায়।

এ দিন প্রশ্নোত্তর পর্বের পরেই স্পিকার বিরোধীদের আনা তিনটি মুলতুবি প্রস্তাব সভায় পড়ার অনুমতি দেন। প্রস্তাবগুলি পড়েন তৃণমূলের সোনালী গুহ, কংগ্রেসের অজয় দে, এবং এস ইউ সি আই-র দেবপ্রসাদ সরকার। তৃণমূলের প্রস্তাবে কোচবিহারের ঘোকসাডাঙায় গণধর্ষণের প্রসঙ্গ তোলা হয়। কংগ্রেসের আনা মুলতুবি প্রস্তাবে বলা হয়েছে, নদীয়ার ধানতলার আইসমালি গ্রামে বাস-ডাকাতি ও গণধর্ষণের ঘটনায় পুলিশ সম্পূর্ণ নীরব ছিল। পুলিশ ধর্ষিতাদের মেডিক্যাল পরীক্ষা না-করিয়ে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। গোয়েন্দাদের চেষ্টায় ঘটনার ১৭ দিন পরে পুলিশ ধর্ষিতাদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছে। কংগ্রেস ওই ঘটনায় সি বি আই তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

অন্য দিকে, এস ইউ সি-র প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ঘোকসাডাঙার ছেড়ামারি গ্রামে গরিষ্ঠ শাসক দলের কর্মীদের হাতেই মহিলা সংগঠনের সদস্যাকে গণধর্ষণ এবং ধানতলার ঘটনা পুনরায় দেখিয়ে দিল, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নারীর নিরাপত্তা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। আরও লজ্জার বিষয়, ঘোকসাডাঙায় গণধর্ষণের ঘটনায় অন্যতম অপরাধী গরিষ্ঠ শাসক দলের জনৈক সদস্যাকে পুলিশ প্রহরায় এলাকায় অবাধে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেলেও পুলিশ-প্রশাসন জানাচ্ছে 'তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।' তৃণমূল ও কংগ্রেসের প্রস্তাব পাঠ শেষ হতেই ওই দু'দলের সদস্যেরা কক্ষত্যাগ করেন। তার মধ্যেই এস ইউ সি-র বিধায়ক তার মুলতুবি প্রস্তাব পড়তে শুরু করেন। পড়া শেষ করে কক্ষত্যাগ করেন তিনিও।

তার পরেও উল্লেখপর্বে বেশ কয়েকজন সদস্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওই দুই প্রসঙ্গ তুলে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিশেষ করে মহিলাদের উপরে অত্যাচারের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ঘোকসাডাঙায় ধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস যে-মন্তব্য করেছেন, বিরোধী সদস্যেরা তার তীব্র সমালোচনা করেন। কংগ্রেসের আব্দুল মান্নান বলেন, "নদীয়ার ধানতলা, কোচবিহারের ঘোকসাডাঙা — সর্বত্রই ধর্ষণের ঘটনায় সি পি এম কর্মীরা জড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ ধর্ষণকারীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, দলীয় কর্মীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে মহিলা কমিশনও। ফলে ওই কমিশনের উপরে মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছে।" তিনি বর্তমান মহিলা কমিশন বাতিল করে দিয়ে নিরপেক্ষ সদস্যদের দিয়ে নতুন কমিশন গঠনের দাবি জানান।

তৃণমূলের সৌগত রায় উল্লেখ পর্বে কোচবিহারের ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন, সি পি এমের রাজ্য সম্পাদকের মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক। সি পি এম নেতৃত্ব দলীয় কর্মীদের আড়াল করতে চাইছেন বলে অভিযোগ করেন কংগ্রেসের অসিত মিত্র, তৃণমূলের তাপস রায়।

কোচবিহারের ছেড়ামারিতে দলের সদস্যের বিরুদ্ধে এক মহিলা কমরেডকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠায় সি পি এম অস্বস্তিতে পড়েছে। অস্বস্তি এড়াতে মুখে কুলুপ এঁটেছেন সি পি এম নেতারা। কোচবিহারে দলের জেলা সম্পাদকমন্ডলী এদিন গণধর্ষণের ঘটনাটি নিয়ে বৈঠকে বসে। বৈঠকে ডেকে আনা হয় দলের মাথাভাঙা-২ জোনাল কমিটির সম্পাদক নারায়ণ সরকারকে। দলের জেলা সম্পাদকমন্ডলীর অন্যতম সদস্য তথা রাজ্যসভার সদস্য তারিণী রায়

জানিয়েছেন, রাজ্য কমিটি ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে। কাজেই এ ঘটনায় যা বলার রাজ্য কমিটি বলবে।

এই ঘটনার প্রতিবাদে আগামী বুধবার মাথাভাঙা-২ ব্লকে বন্‌ধের ডাক দিল এস ইউ সি আই। ১২ ঘন্টার এই বন্‌ধে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস। গণধর্ষণের জড়িতদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে ডেপুটেশন দিয়েছে তৃণমূল। বি জে পি এবং তৃণমূলের এক প্রতিনিধি দল ছেড়ামারি ও আটপুকুরি গ্রাম পরিদর্শনে যায়।

এদিন মাথাভাঙা-২ জোনাল অফিসে বসে নারায়ণবাবু বলেছেন, গণধর্ষণের ঘটনাটি পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূল-বি জে পি-র সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল-বিজেপি-র হাতছাড়া হয়। এবার ওই পঞ্চায়েতের দখল নিতেই সি পি এমের বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত চলছে। এই ঘটনার সঙ্গে সি পি এম-এর কোনও সম্পর্ক নেই। ধর্ষিতা মহিলা রুণু রায়ের সঙ্গেও সি পি এম-র কোন সম্পর্ক নেই। অভিযুক্তদের মধ্যে ছমিরুদ্দিন মিঞা ওরফে ক্যালসা দলের লোকাল কমিটির সদস্য। তাকে এই মামলায় জড়ানো হয়েছে। অপর অভিযুক্তদের মধ্যে শশী বর্মণ ও ক্ষীরোদ বর্মণ সি পি এমের সমর্থক মাত্র। বাকি অভিযুক্তদের সঙ্গে সি পি এমের কোনও সম্পর্ক নেই। তার অভিযোগ, ছেড়ামারির দুই তৃণমূল কর্মীর সঙ্গে ওই মহিলার অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। গণধর্ষণের কোনও ঘটনা ঘটলে তার জন্য দায়ী ওই তৃণমূল কর্মীরাই জড়িত।

সি পি এম-এর অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল। জেলা তৃণমূলের আহ্বায়ক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এদিন বলেছেন, গণধর্ষণের ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে সি পি এম এখন উল্টোপাল্টা বকছে। আমরা ঘটনাটির বিচারবিভাগীয় তদন্ত চাই। তৃণমূলের এক প্রতিনিধি দল এদিন ছেড়ামারি গ্রামে যায়। বি জে প-র জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিত্যানন্দ মুন্সির নেতৃত্বে বি জি পি-র এক প্রতিনিধিদলও এদনি আটপুকুরি এবং ছেড়ামারি গ্রামে যায়। বি জে পি নেতারা জানিয়েছেন, গণধর্ষণের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী থেকে সরে আসা হবে না। এই ইউ সি আই নেতা কাজল চক্রবর্ত্তী জানিয়েছেন, আমরা এ-ঘটনায় জড়িত সি পি এম নেতা-কর্মীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এবার বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।

এস ইউ সি আইয়ের ডাকা এই বন্‌ধে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস। জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্যামল চৌধুরী বলেন, আমরা জড়িতদের শাস্তির দাবীতে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে ডেপুটেশন দেব। এছাড়া মহিলা কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল ছেড়ামারি গ্রামেও যাবে। রাজ্য তৃণমূল নেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ছেড়ামারিতে আসবে।

অন্যদিকে, সি পি এম রুণুদেবীর বিরুদ্ধে চরিত্রদোষের অভিযোগ তুললেও তার শাশুড়ি মায়া দাসের বক্তব্য, আমার বউমার চরিত্রের ওপর কলঙ্ক চাপানোর চেষ্টা চলছে অনেক দিন। কিন্তু তার চরিত্রে আমি কোনও দোষ পাইনি। একই কথা বলেছেন রুণুদেবীর বিবাহিত ননদ কণিকা দাস। এ ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত সি পি এম সমর্থক মৃণাল দাস রুণুদেবীর দেওর, অর্থাৎ জীবন দাসের ভাই। মায়াদেবী বলেছেন, ছেলে দোষ করলে শাস্তি পাবে। অপরাধ করলে ভাইয়ের শাস্তি হোক তা চান কণিকাদেবীও।

ছেড়ামারি, জয়ন্তীহাটের গ্রামবাসীরাও সি পি এম-এর অত্যাচারের ভয়ে মুখ খুলতে চাননি। তবে তারা অনেকেই একান্তে জানিয়েছেন গণধর্ষণে জড়িতদের শাস্তি দেওয়া হোক। কিন্তু পুলিশ কাউকেই ধরছে না। ধর্ষণের ঘটনার দু'সপ্তাহ পর শুধু মৃণাল দাসকে ধরেছে। অভিযুক্ত অজিত বর্মন ও সমর মল্লিক আত্মসমর্পণ করেছে। অপর অভিযুক্তরা এতদিন প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশের খাতায় ওরা পলাতক। পুলিশও ঘটনাটি নিয়ে মুখ খুলতে রাজি নয়। ঘোকসাডাঙা থানার এক অফিসারের কথায়, গণধর্ষণ হয়েছে, ডাক্তারি পরীক্ষায় তা প্রমাণিতও হয়েছে। এবার পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে।

ছেড়ামারিতে গণধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে গত ২২ ফেব্রুয়ারী রাতে। এরপর ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবীতে গত ৩ মার্চ ঘোকসাডাঙা থানা ঘেরাও করে তৃণমূল। পরদিন তৃণমূলের এক প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল ঘুরে আসেন। গত কয়েক দিনে গ্রামে এ নিয়ে চাপা গুঞ্জন থাকলেও তা এখন আতঙ্কের চেহারা নিয়েছে।

দৃশ্য - ৬

মেদিনীপুরের সবঙে খলাগেড়িয়া গ্রামে অঞ্জলি দাস নামে এক মহিলাকে পাঁচ বছরের শিশুকন্যার সামনে পাশবিক অত্যাচার করে তার গোপনাঙ্গে অ্যাসিড ঢেলে দেয় তিন সি পি এম কর্মী। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষে ডঃ মানস ভুইঞা রবিবার এ খবর দিয়ে অভিযোগ করেন, ঘটনাটি ১০ মার্চ ঘটলেও পুলিশের তরফে এতদিন কোন পদক্ষেপই নেওয়া হয় নি। ঘটনাটি ঘটার পর অঞ্জলির চিৎকারে প্রতিবেশীরা এসে পড়লে সি পি এম কর্মীরা পালিয়ে যায় বলেও ভুঁইঞা জানিয়েছেন। অঞ্জলি রবিবার মেদিনীপুর হাসপাতালে পুলিশকে ওই তিন ব্যক্তির নামও জানিয়েছে। এরা হল নিশিকান্ত মাঝি, সুধীর ঘড়ুই, অমল পাত্র। ভুঁইঞা জানান, স্বামী পরিত্যক্তা অঞ্জলিকে ওই তিন সি পি এম কর্মী মাঝে মাঝেই উত্যক্ত করত। স্থানীয় ও জেলা প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়াতা দেখে ভুঁইঞা জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ জানায়। এরপর পুলিশ এখন নড়েচড়ে বসেছে। তবে এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয় নি।

দৃশ্য - ৭

বান্দোয়ান থানার ধাদকা গ্রামের এক মহিলাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ তুলে 'দোষীর' শাস্তির দাবীতে আন্দোলনে নেমেছে এস ইউ সি। সি পি এম-এর স্থানীয় এক নেতাই মহিলাকে ধর্ষণ করেন বলে দলের রাজ্য সম্পাদক প্রভাস ঘোষ অভিযোগ করেন। তিনি জানিয়েছেন, "ধনু রজক নামে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি (সি পি এম-এর) মহিলার অসহায়তায় সুযোগ নিয়ে ধর্ষণ করেন। ওই মহিলা অভিযোগ করেন পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করছে না। বরং ওই সি পি এম নেতাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে।"

এস ইউ সি-র তরফে বলা হয়, আজ বৃহস্পতিবার বান্দোয়ান থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হবে। দোষীকে গ্রেফতার এবং শাস্তির দাবিতে ওই এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস এবং বি জে পি সহ বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলও সভা সমাবেশ করছে।

তবে, জেলা সি পি এম বিরোধীদের অভিযোগকে একদমই ভিত্তিহীন বলেছেন। বান্দোয়ান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ধনু রজক বলেন, "এ গুলো সমস্তই পঞ্চায়েত ভোটের

আগে আমার বিরুদ্ধে বিরোধীদের চক্রান্ত। গোটাটাই সাজানো ঘটনা।" সি পি এমের জেলা সম্পাদক নকুল মাহাতোও বলেছেন, "উন্নয়নের প্রশ্নে বিরোধীরা এঁটে উঠতে পারবে না বলেই তারা চরিত্রহননের খেলায় নেমেছে। ধর্ষণের অভিযোগ তোলা ওদের নতুন স্ট্র্যাটেজি। শুধু পুরুলিয়া নয়, বীরভূম, কোচবিহার, উত্তর ২৪ পরগণা, নদীয়া সর্বত্রই হচ্ছে।" তবে দলের এক জন প্রভাবশালী নেতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ওঠায় দলীয় স্তরে তারা তদন্ত করছেন বলে নকুলবাবু জানিয়েছেন।

মহিলাটি পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন, ধনু রজক তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক করে বিয়ে না করে দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন। তার নিজের কথায়, "যখন আমি বিয়ে করার জন্য চাপ দিলাম তখন আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। আমার মাকে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়।" অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য বান্দোয়ান থানার পুলিশও তার উপরে চাপ দিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন। দোষী পুলিশের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে আইন অমান্য হবে। প্রয়োজনে বান্দোয়ানে বনধ্ ডাকা হবে বলে এদিন এস ইউ সি নেতারা হুমকি দেন।

জেলার পুলিশ সুপার বিনীত গোয়েল বলেন, ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। কিন্তু এস ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক দাবী করেন, "অপরাধীকে আড়াল করার অপরাধে বান্দোয়ান থানার ও সি-কে বরখাস্ত করতে হবে।" এ-ব্যাপারে পুলিশ সুপার জানান, তদন্তে কোন পুলিশ কর্মী দোষী প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুরুষ শাসিত সমাজই দায়ী?

সে এক গ্রামের কন্যা। মোটামুটি সচ্ছল পবিবার, গাছগাছালি, সবুজ চরাচর, কাকচক্ষু পুকুরের জল আদিগন্ত আকাশে সাদা মেঘের ভেলা দেখতে দেখতে তার বড় হয়ে ওঠা। না, কন্যা সন্তান বলে অসন্তুষ্ট হয়নি আপনজনেরা তার জন্মলগ্নে। কিন্তু মেয়েকে মেয়ে করে তোলা তাদের মহান কর্তব্য যে।

চার বছর বয়সে হাডুডু খেলতে স্কিপিং কবতে পাড়ার অন্য মেয়েদের সঙ্গে ভিড়ে গেলে, ঠাকুমা সন্তর্পণে ডেকে আনেন তাকে। ছিঃ ছিঃ ওসব কি মেয়েরা খেলে? এসো, কত্তো পুতুল বানিয়ে দেব। তার ভাঙা ট্রাঙ্কে পুতুল জমতে থাকে রাশি রাশি — অসংখ্য। ঘরকন্না রান্নাবান্না ছেলে মেয়ে-বিয়ে থাওয়া কন্যের জগৎ ভবে ওঠে। কি খেয়ালে প্রতিবেশী বান্ধবীর কাছে গুটিখেলা শিখে এসে একদিন সেটির চর্চা করতেই ছুটে এলেন পিসিমা। ওমা, কি হবে গো, এসব অলক্ষুণে খেলা — হাত যে শক্ত হযে যাবে মেয়ে। মেয়ের গুটি খেলাও বন্ধ হল।

বাড়িতে বাবার বন্ধু সস্ত্রীক, সকন্যা এসেছেন। গল্প আড্ডা জমে উঠেছে। হাসি হল্লা হচ্ছে। গুরুজনদের নিষেধাজ্ঞা ভুলে কনেটি হেসে উঠল সজোরে। পরমুহূর্তে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রক্ত হিম হয়ে গেল। মুখ নামিয়ে পালানোর পথ পায় না। বাড়িতে ছোট্ট থেকে তাকে শেখানো হয়েছে, মেয়েদের জোরে কথা বলতে নেই, জোরে হাসতে নেই। তা অত্যন্ত অশালীন। একটা মেয়ের আচার আচরণই বলে দেয় সে বাড়ির কালচার কেমন।

কন্যে কিশোরী হল। স্কুলের পড়াশোনার চাইতে আগ্রহ জন্মেছে নভেল পড়ায় বেশি। অতএব লুকিয়ে লুকিয়ে রোমান্টিক গল্প উপন্যাস। দৃষ্টি এড়াল না গুরুজদের। শাসন তর্জন শুরু হল। বুঝিয়ে দেওয়া হল ভদ্র মেয়ের ওইসব হাবিজাবি প্রেমের গল্প গেলে না। স্কুলের পড়াশোনার বাইরে যেন মন না যায়। মাধ্যমিক পরীক্ষার কন্যে সবাইকে অবাক করে দিয়ে ৫টি লেটার সহ ফার্স্ট ডিভিশন পেল।

এবার কন্যের কল্পনা লাগামছাড়া হয়ে দূর আকাশে ডানা মেলল। স্বপ্ন দু'চোখে — অনেক পড়াশোনা — ভাল চাকুরি ......। গোপনে অলক্ষে অভিভাবকরা — তার শুভাকাঙ্খীরা ততক্ষণে ভেবে ফেলেছেন তার ভবিষ্যৎ। এক বিকেলে কনে দেখা আলোয় ধনী উচ্চপদস্থ চাকুরে পাত্র আর তার অভিভাবকরা পছন্দ করে গেলেন তাকে। একরাশ চোখের জলে স্বপ্নকে ভাসিয়ে দিয়ে কন্যা চলল ঘরকন্না করতে।

সে মেয়ে কি সুখী হতে পেরেছে? এ প্রশ্ন বাহুল্য। এই শ্রেণীর মানসিকতায় কন্যার মন সত্তা অস্তিত্বকে চীনে মেয়ের পায়ের মত ছেঁটে কেটে ভালমতো তৈরী করা হয়। ছোট্ট থেকে কন্যাকে পায়রা ধন, পুরুষ চিত্তহারী হিসেবে গড়ে তোলা হয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত লজ্জা, অতিরিক্ত নম্রতা, শারীরিক কোমলতায় তাকে লজ্জাবতী লতা দেখতে চান আপন পর সকলেই। কন্যা জন্মালে

পরিবারের সদস্যেরা অসন্তুষ্ট না হলেও, কন্যা মেয়েকে মানুষ করে, মোমের পুতুল করে, জি-হুজুর হ্যাঁ হুজুর করে বড় করে তোলার নামই মেয়ে মানুষ করা বলে তারা মনে করেন। সুখী নারী হবার এটিই একমাত্র পথ বলে জানেন। স্বামী গর্বে গর্বিতা, সন্তান ও সংসার প্রতিপালন একমাত্র ব্রত, শুধুমাত্র স্বামীর পরিজনদের হিতার্থে জীবনপণ করাই তো মেয়েদের জীবনের চরিতার্থতা। কন্যাকে ছোট থেকে সেই তালিম না দিলে চলবে কি করে?

মিডিস্কার্ট পরা মেকি স্মার্ট ওই কিশোরী টপ ব্লাউজে এমনতরো আবেশ করা কবিতা পংক্তি নিয়ে পেনসিল হিল পায়ে হেঁটে চলেছে রাজপথে। উন্নত গ্রীবা, চটুল চাহনি, ভ্রু-যুগল ডানা মেলা পাখি। হাই সোসাইটির সোসাইটি গার্ল যখন মা হয়, তাদের অনেকে সন্তান পালনের মতো জৈবপ্রবৃত্তি নিয়ে মেতে থাকাটা ন্যাস্টি ব্যাপার মনে করেন। নার্সের হাতে শৈশব কাটানো শিশুকন্যা বড় হয়ে ওঠে বৈভবের অপরিমিত প্রাচুর্য্যের মধ্যে। ভর্তি করা হয় ভাল স্কুলে। লেখাপড়ার চর্চা এখানে পুত্র কন্যার ক্ষেত্রে তুল্যমূল্য। মূল্যবান কন্যা তাই শহরের সবচেয়ে নামকরা স্কুলে পড়াশোনা করে। গাড়িতে যাতায়াত। প্রতি বিষয়েই গৃহশিক্ষক। দারুণ রেজাল্ট।

ধনী গৃহের স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাওয়া দাওয়া। সচেতনতার সতর্কতায় খেলাধূলা, পড়াশোনা, গানবাজনা, সাঁতার শেখা, ড্রাইভিং সবই নির্দিষ্ট নিয়মে কম্পিউটারের মতো হিসেবি ফর্মুলায় চলে। সর্ববিদ্যায় বিদূষী করে না তুললে সে স্টেটাস সিম্বল হবে কি করে? যথার্থ সোসাইটি গার্ল হতে গেলে তার ব্যক্তিত্ব যে বিরাট ফ্যাক্টর সেটি ভালই বোঝেন অভিভাবকেরা। তাই দারুণ ইংরেজী কালচার তার নিজস্ব। ধ্যান ধারণা চিন্তা ভাবনায় বিদেশী ধারাকে রপ্ত করে ফেলে সহজেই পারিবারিক ঐতিহ্য সহায়ক হওয়ায়। সবই হয়। কিন্তু সে যে মেয়ে এটাও সেই সঙ্গে অস্থিমজ্জায় গেঁথে থাকে তার। সব ব্যাপারে ডোন্ট পরোয়া ভাব, তার কাছে মেয়েলি ব্যাপার স্যাপার বিরক্তিজনক ছোট্ট থেকে ত্বকের পরিচর্যা সে শিখে যায়। দামি দামি স্কিন লোশন, হাজার রকমের লিপস্টিক, শ্যাম্পু অঢেল দাক্ষিণ্যে অভিভাবকরা জোগান দেন। সোৎসাহে ওই মেয়ে তা যথাযথ ব্যবহার করে। নিয়মিত হেলথ্ ক্লাব আর বিউটিপার্লার রুটিনে বাঁধা।

কিশোরী বয়সে পৌঁছে এই মেয়ে বুঝে যায় শরীর একটা সম্পদ। ছোট থেকে মা বা অন্যান্য কাছের মেয়েদের দেখে এ জ্ঞান তার জন্মে যায় যে শরীর প্রদর্শন একটা আর্ট। এদের বাবা-মা গর্ব করে বলেন, আমাদের মেয়েকে আমরা 'মেয়ে' করে মানুষ করিনি। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে গাঢ় কুরুচিকর লিপস্টিক রঞ্জিত ঠোঁট, দু কানে অদ্ভুত দর্শন গয়না কিম্ভুত পোশাক সজ্জিত এই বস্তুটি তাহলে কী? শরীর সম্পর্কে অতি সচেতন, অহংসর্বস্ব হৃদয়াবেগ বর্জিত স্বার্থপর ওই কন্যা মনুষ্যত্বের কোন সংজ্ঞা বহন করে?

মেয়ে তো 'মেয়ে' হয়ে জন্মায় না। তাকে পরিবার, সমাজ 'মেয়ে' করে তোলে। ছোটবেলা থেকেই তাকে মানুষ হিসেবে তৈরি করা হয় না। করা হয় মেয়ে হিসেবে। যাতে তাকে মেয়ে মানুষ হিসেবে চিনে নিতে কারও অসুবিধা না হয়। কন্যা জন্মালে যারা অসন্তুষ্ট হন, চরম অসুখী হন তাদের অপরাধ চোখে দেখা যায়। শিশু কন্যাকে যারা বৈষম্যমূলক ব্যবহারে বড় করে তোলেন তাদের অন্যায়ও ধরা পড়ে সাদা চোখে। কিন্তু মেয়েকে যারা আপাত আদরে ভরিয়ে দিয়েও, 'মানুষ' করে তুলতে ব্যর্থ হয় তাদের অজ্ঞ বলা উচিত, না অপরাধী বলা সঙ্গত? অধিকাংশ, এমনকি শিক্ষিত পরিবারেও কি এ দৃশ্য দেখা যায় না?

কন্যা সন্তানকে বড় করে তোলার পদ্ধতির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে নারীর পরাজয়ের বীজ।

শারীরিক শক্তিতে সে পিছিয়ে, তার জন্য দায়ী এই পদ্ধতি। মানসিক দিক দিয়ে সে কমজোরি, তার জন্যও দায়ী এই পদ্ধতি। শুধুমাত্র শরীরী মূল্যে অধিকাংশ নারীর মূল্যায়ণ হয় তার জন্য দায়ী ওই কন্যা বড় করার পদ্ধতি, মানসিকতা। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে হেরে গিয়েও পরাজয়ের লজ্জা নারীকে গ্রাস করে না। খাদক পুরুষের খাদ্য হয়েও সে ক্রুদ্ধ হয় না। বহু ক্ষেত্রে খাদ্য হিসেবে নিজেকে ব্যবহার করে আপাত জয়ের আনন্দ লাভ করার মতো ঘৃণ্যতম কাজেও সে পিছপা হয় না — এতসব সহনশীলতা তো এই সমাজেরই অবদান। সংসার অতি শৈশব থেকে কন্যার অস্থিমজ্জায় এসব ঢুকিয়ে দেয়। সংগোপনে। হয়তো বা অসচেতনভাবে। ,

নারীবাদীদের তবুও অভিযোগের শেষ নেই পুরুষদের বিরুদ্ধে। আসলে আধুনিকারা ভোগসর্বস্ব, স্বার্থপর জীবনদর্শনে বিশ্বাসীরা, অতৃপ্তি অশান্তিতে ভুগছেন। তাই পুরুষদের ঘাড়ে সব দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দায় এড়াতে চান। শুনুন এ-জাতীয় নারীবাদীদের কিছু কথা ঃ

> লঙ্কার রাজা রাবণকে পরাজিত করে ১৪ বছর বাদে স্ত্রী সীতাসহ রাজ্যে ফিরেছিলেন 'রামায়ণ' কাহিনীর নায়ক রাম। সেদিন রাজ্যবাসী সোৎসাহে অভিনন্দন জানিয়ে ছিল তাদের। কিন্তু রাজ্যভিষেকের প্রাথমিক উত্তেজনা থিতিয়ে যেতেই প্রজাসাধারণের মনে রাবণ গৃহে বন্দিনী সীতার 'সতীত্ব' নিয়ে প্রশ্ন এবং সন্দেহ দেখা দিল। প্রজাবৎসল রাম প্রজাদের মনোরজনার্থে তার বনবাস জীবনের ছায়াসঙ্গিনী অনুগতা স্ত্রী সীতাকে নির্বাসিত করলেন।

রামায়ণের এ গল্পের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণকায় প্রেসিডেন্ট নেলসম ম্যাণ্ডেলা এবং তার পূর্বতন স্ত্রী উইনির হয়তো কোন মিল নেই। দক্ষিণ অফ্রিকার প্রথম সাধারণ নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই নেলসন-উইনির বিয়ে ভেঙে গেছে — একথাও সত্য। তবু ২৭ বছর কারাবন্দী নেলসনের বিজয়ে সারা দক্ষিণ আফ্রিকা যখন বিজয় উল্লাসে মাতাল, তখন একবারের জন্যও উইনিকে সেখানে দেখা যায় নি।

অথচ একসময় নেলসনের পত্নী, অসাধারণ সুন্দরী এই কালোহীরেটিকে নিয়ে প্রচার মাধ্যম ছিল উচ্ছ্বসিত। উইনিকে বলা হত 'মাদার অফ্ সাউথ আফ্রিকা' — আফ্রিকান ন্যাশানাল কংগ্রেসের এই সদস্য তার স্বামীর তথা এ. এন. সি. নেতা জেলবন্দি নেলসন ম্যাণ্ডেলার মুক্তির আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

১৯৮৮-এর জুলাই মাসে লন্ডনের হাইড পার্কে নেলসন ম্যাণ্ডেলার মুক্তির দাবিতে আহুত জনসভায় নেলসনের সঙ্গে উইনির নামেও মুহুর্মুহু যে জয়ধ্বণি উঠেছিল — তা আজ ইতিহাস।

উইনির বিরুদ্ধে আজ খুন এবং অন্যকে প্রলুব্ধ করার মতো গুরুতর অভিযোগ। এসব অভিযোগের সত্যাসত্য বিচার করার সুযোগ আমাদের নেই। হতেই পারে যে উইনির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির প্রত্যেকটিই সঠিক।

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রচার মাধ্যমগুলি যে-ভাবে উইনি সম্পর্কে নীরবতা পালন করেছে, সেটা সত্যিই আশ্চর্যের। আর এখানেই প্রশ্ন জাগে, প্রচার মাধ্যমের এই 'বাকসংযম' কি স্বাভাবিক, না কি এর গভীরতর কোনও অর্থ আছে। কেননা দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা, আদর্শের প্রতি সততা বা কলঙ্কহীন রাজনৈতিক-ব্যক্তিগত জীবনই যদি প্রচারের শর্ত হত — তাহলে ক্ষমতাসীন ক'জনের কথ লোকে জানতে পারতো?

একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে নেলসন ম্যাণ্ডেলা তথা এ. এন. সি.-র সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রেই আন্তর্জাতিক স্তরে উইনির নাম উঠে আসে। তবে একথাও অনস্বীকার্য

পরবর্তীকালে এ. এন. সি.-কার্যাবলীতে ইউনির প্রভাহ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নির্বাচিত মন্ত্রী পরিষদে উইনির অন্তর্ভুক্তি সে সত্যেরই স্বীকরণ। উইনির দোষ গুণ বিচারের জায়গা এটা নয়, সে সুযোগও এখানে নেই। গুরুতর সব অভিযোগে অভিযুক্তা উইনিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে এ. এন. সি. এবং ব্যক্তিগতভাবে নেলসন ম্যাণ্ডেলা যেভাবে তার ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে তুললেন, তা নিঃসন্দেহে একটি সদর্থক নজির সৃষ্টি করল।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে তখনই, যখন মনে হয় যে 'নৈতিক অধঃপতনের' জন্য উইনির ওপর শাস্তির খাড়া নেমে এল, উইনির জায়গায় এ. এন. সি.-র অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হলে কি শাস্তির পরিমাণটা এরকমই হতো? একথা ঠিক যে এই মুহূর্তে এ প্রশ্নের কোনও জবাব নেই, আগামী দিনগুলিই তার উত্তর দেবে।

তবে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে একথা মনে হতেই পারে যে নারী না হয়ে পুরুষ হলে উইনি হয়তো এতটা কোণঠাসা হতেন না। আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুরুষ কর্তৃক নারী অবদমনের ধারাবাহিক ইতিহাস। পুরুষ প্রাধান্যের প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে আছে সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তরে। নারীর স্থান পুরুষের নীচে — পুরুষ-শাসিত সমাজের স্বতঃসিদ্ধ নিয়মই তাই। কেবল আমাদের দেশের মতো গরীব দেশ নয়, উন্নত দেশগুলির সমাজ কাঠামোর মূল সুরও এটাই।

দেশে দেশে যুগে যুগে এরই পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে। পুরুষশাসিত সমাজের পরিপূরক হিসেবেই গড়ে ওঠে তার সংস্কৃতি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সামাজিক মানুষ মাত্রেই সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে আচ্ছন্ন। যে সংস্কৃতির 'থিম মিউজিক' হল কিনা বিনা প্রশ্নে পুরুষের পায়ে নারীর আত্মনিবেদন। 'ছায়েবানুগতা' স্ত্রী আর সর্বসংহা মাতার সাংস্কৃতিক 'ঐতিহ্য' আজও নারীরা বহন করে চলেছে।

পুরুষের কাছেও নারীর মূল্য কখনও শয্যাসঙ্গিনী, কখনও বা সন্তানের মাতার 'গৌরবে'ই সাধারণভাবে সীমাবদ্ধ। বুদ্ধি, ক্ষমতা দক্ষতার প্রশ্নগুলি তাদের ক্ষেত্রে অবান্তর। ইংল্যাণ্ডেও এক সময় অলস, রুগ্ন এবং শিশুসুলভ সরল স্ত্রী অভিজাত পুরুষের অলঙ্কার হিসেবে গণ্য হত। অর্থ দিয়ে শক্তি দিয়েও যে সামাজিক মর্যাদা পাওয়া যায় না, স্ত্রীর 'চাইল্ড-লাইফ ইগনোরেন্স' তাকে সেই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করত।

সুতরাং বহমান সংস্কৃতিতে একজন নারীর পক্ষে সংসার সন্তানের গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর জীবনে নিজের কৃতিত্ব এবং দক্ষতা প্রমাণ করা, চ্যালেঞ্জ নেওয়া — এসবই কিছুটা 'অস্বাভাবিক' 'পুরুষোচিত'। নারীকে আগে প্রমাণ করতে হবে সে নিটোল একটি নারী, তার নারীত্ব নিয়ে কোনরকম প্রশ্ন করা চলবে না, গর-গেরস্থালির কাজ হবে নিখুঁত — এসব শর্ত ঠিকঠাক থাকেল, তবেই তার 'সেকেণ্ডারি' কাজগুলি মূল্যায়ণের মতো 'উদারতা' দেখাবে এ সমাজ। অন্যথায়, সে হবে ঠাট্টা বিদ্রুপের শিকার, অথবা ভোগ করবে ডাইনি-মৃত্যুর পরিণতি।

নারী যদি ঘর সংসারের থেকেও বৃহত্তর সমাজ জীবন অথবা কর্মক্ষেত্রকে বেশি গুরুত্ব দেয়, তাহলে তার পরিণতি কি হতে পারে শংকরের 'আশা-আকাঙ্খা'-র মতো উপন্যাস এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একাধিক সাহিত্যকৃতিতে তা ছড়িয়ে আছে। গুলজারের 'আঁধি' ছবির ব্যক্তিত্বময়ী সফল রাজনীতিকও শেষমেশ স্বামীর বুকে 'ভয়ভীতা কপোতী' হয়ে নারী জীবনের সার্থকতা অনুভব করে।

খনা-মিহিরের গল্প তো সবারই জানা। স্বামী এবং শ্বশুরের তুলনায় গণনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলে, খনা নিজেই তার জিব কেটে ফেলেছিল। কেননা সে নারী, পুরুষের চাইতে নারী কখনওই শ্রেষ্ঠ হতে পারে না — এ বিশ্বাস তার রক্তে প্রবাহিত।

অবশ্য ক্ষমতা আর অধিকারের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে খনা নিজেই নিজের জিব না কাটলে তো জোর করেই কেটে ফেলা হত, সেকথা বলাই বাহুল্য।)

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করেও যেখানে মহিলাদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা যায় নি, রাষ্ট্রযন্ত্রই সেখানে বিভিন্ন উপায়ে তাদের বিরোধিতায় নেমেছে।

প্রাচীনকালে ইউরোপে প্রসূতি এবং সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে গ্রামীণ অভিজ্ঞ ধাইদেরই ছিল আধিপত্য। 'ফর হার ওন গুড' বইয়ে বারবারা এরেনরেইচ বিগত দেড়শ বছরের ইতিহাস ঘেঁটে দেখিয়েছেন কিভাবে 'বিজ্ঞান' এবং 'পেশাগত দক্ষতা'-র অজুহাতে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান 'ধাইমা'-র সনাতন ভূমিকা থেকে মহিলাদের ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞান এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি থাবা বসিয়েছে মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে — সঙ্কুচিত করেছে তাদের কাজের জায়গা।

এভাবে কখনও বিজ্ঞান কখনও পুরুষের স্বার্থে বারে বারে খর্ব করা হয়েছে মেয়েদের ক্ষমতা। 'হিডেন ফ্রম হিসট্রি' বইয়ে শিলা বোরথম্ দেখিয়েছেন ১৬৩০ সালে ইংল্যাণ্ডের চরম বেকারিত্বের সময় অদক্ষ মুদ্রণ শিল্পে মহিলা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পুরুষরা আন্দোলন করেন, তার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মুদ্রণ শিল্প থেকে বাদ পড়েন মহিলারা।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে উলের ব্যবসার একটা বড় অংশ জুড়ে ছিলেন মহিলা শ্রমিকরা। কিন্তু শতাব্দী শেষ না হতেই তাদের কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে গেল — কারখানায় নয়, ঘরে বসে উল পাকানো বা কাটার কাজেই সীমিত হল তাদের দায়িত্ব। কারণ সে সময় ডাইং মেশিন এসে গেছে অতএব মেশিন চালানোর মতো 'দক্ষ' কাজ পেলেন পুরুষরা। এভাবে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় চিরাচরিত কাজের জায়গাগুলি থেকে বিতাড়িত হলেন মহিলারা। বেশিদূর যেতে হবে না, আমাদের দেশেও গ্রামে গঞ্জে ঢেঁকিপাট দিতেন মহিলারা, হাসকিং মেশিন চালু হওয়াতে তার দায়িত্ব গেল পুরুষদের।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়া সাংস্কৃতিক সামাজিক যেখানেই ক্ষমতা এবং দক্ষতার প্রশ্নে মহিলারা পুরুষদের প্রতিদ্বন্দী হয়ে উঠেছেন, সেখান থেকেই তাদের নির্বাসিত করা হয়েছে।

এই বাংলাদেশেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাড়িতে বাড়িতে বিভিন্ন ক্রিয়া-পার্বনে কীর্তন গান গেয়ে বেড়াতেন বৈষ্ণবীরা, অশ্রদ্ধা করে যাদের 'নেড়ী কবি' বলা হত। এদের নাচ গানের জনপ্রিয়তা নিম্নজাতির পুরুষদের গায়কদের রোজগারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ১৮২৮ সালে 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত ভবঘুরে মুচে ডোমের একটা চিঠি থেকে জানা যায় যে 'সদরে' অপিল করে এই সব মহিলাদের গান বন্ধ করে পুরুষ গায়কদের জীবিকার্জনের পথ নিষ্কন্টক করা হয়েছে। অর্থাৎ কেবল বিদেশী শাসকদের কাছ থেকে নয় 'স্বজাতের' পুরুষদের থেকেও বাধা পেতে হয়েছিল এই সব মহিলাদের।

একদিকে পুরুষাপেক্ষা হীনমন্যতার সাংস্কৃতিক 'ঐতিহ্য' অন্যদিকে সমাজের প্রবল বিরোধিতা — এ দু'য়ের বাঁধন কাটিয়ে একজন মহিলার পক্ষে নিজের ক্ষমতার পরিচয় রাখা সহজ

কথা নয়। 'নারীত্ব' টিকিয়ে রাখার দুর্বহ ভার বহনে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখা দিলেই সমাজ তাকে কোণঠাসা করেছে।

টমাস মানের কন্যা এলিজাবেথ মান একবার মানসিক সমস্যায় পড়ে এক মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যান। সুরকার হিসেবে খ্যাতিলাভ করা ছিল এলিজাবেথের স্বপ্ন। তার কথা শুনে চিকিৎসক তাকে হয় শিল্প অথবা একজন পরিপূর্ণ নারী হিসেবে গড়ে ওঠা — এ দু'য়ের মধ্যে একটি বেছে নিতে বললে রাগে এবং বিস্ময়ে এলিজাবেথ বলেছিলেন 'টসকানিনি বা বাখ্ বা আমার বাবাকে তো কেউ বলে না পরিপূর্ণ পুরুষ হতে গেলে শিল্প এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে যে কোন একটা তাদের বেছে নিতে হবে। আমার প্রতি এ অবিচার কেন?

পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রতি এ অবিচার সর্বত্র। পুরুষাধিপত্যের বিরুদ্ধে কোনও প্রশ্ন করা চলবে না।

রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং বিপ্লবোত্তর লেনিনের নেতৃত্বাধীন সরকারের একমাত্র মহিলা সদস্য আলেকজান্দ্রা কোলনতাই (১৮৭২-১৯৫২) ছিলেন একাধারে রাজনৈতিক নেত্রী এবং সাহিত্যিক। বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ায় 'দ্য সোশাল বেসিস অফ ইউমেনস্ কোশ্চেন'-এর মতো একাধিক বই লেখার অপরাধে তাকে আত্মগোপন করতে হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের দুনিয়া কাঁপানো সেই অক্টোবর বিপ্লবের কয়েক বছরের মধ্যেই তার 'দা গ্রেট লাভ' বা 'লাভ অফ ওয়ার্কার বিস্'-এর মতো বইকে পেটি-বুর্জোয়া সাহিত্যের তকমা মেরে নিষিদ্ধ করা হয়। 'দা গ্রেট লাভ'-এ কোলনতাই এবং লেনিনের মতো এত বড় একজন কমিউনিস্ট নেতাও যে মেয়েদের কাছ থেকে প্রশ্নহীন আনুগত্যই আশা করতেন, কোলনতাই-এর লেখায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। শেষমেশ ১৯২১ সালে 'নিউ ইকোনমিক পলিসি' সংক্রান্ত প্রশ্নে লেনিনের সঙ্গে মতভেদ হওয়াতে অস্বস্তিকর নানা প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচতেই বোধহয় 'সোভিয়েত ট্রেড ডেলিগেসনে'র একজন সদস্য হিসেবে তাকে সুদূর ওসলোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমৃত্যু সেখানেই ছিলেন কোলনতাই।

রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে মাত্র ২৬ হছর বয়সে স্বামী ভ্লাদিমির কোলনতাইকে ছেড়ে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হলেও তার সংসার জীবনের স্মৃতি হিসেবে আজীবন কোলনতাই স্বামীর পদবিই ব্যবহার করেছেন। স্বামী-সন্তান-সংসার সুখ আর স্বাধীনভাবে রাজনীতি করার 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন' প্রক্রিয়া যে মেয়েদের পক্ষে কত কঠিন জীবন দিয়ে বুঝেছিলেন কোলনতাই। 'লাভ অফ ওয়ার্কাস বিস' গল্পে নারী জীবনের সে যন্ত্রণার কথা ফুটে উঠেছে।

কেবল সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়, সত্তরের দশকে যে দেশ থেকে ভেসে আসা বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ মাতোয়ারা করে তুলেছিল এদেশের তরুণ প্রজন্মকে, যে দেশের চেয়ারম্যানকে নির্দ্বিদায় নিজেদের চেয়ারম্যান বলে মনে নিয়েছিল এদেশের যুবক-যুবতী — সেই 'লাল চিনে'-র কমিউনিস্ট শাসনেও মহিলাদের কোণঠাসা করার ঘটনা বিরল-দৃষ্ট নয়।

১৯৯১ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত চিনা লেখিকা উং চ্যাং-এর 'থ্রি ড্রটারস্ অফ চায়না : ওয়াইল্ড সোয়ান্স' নামের স্মৃতিকথামূলক উপন্যাসে বিপ্লবোত্তর চিন থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক আন্দোলন পর্যন্ত সময়ের নানা ঘটনার কথা বর্ণনা আছে।

উং চ্যাং চিনের রেড গার্ড দলের সদস্যা ছিলেন। কালচারাল রেভেলিউসনের পর ১৯৭৬

সালে চ্যাং ইংল্যাণ্ডে চলে যান। ৮০-র দশকে চিনে ফিরে বিস্তৃত গবেষণা করে নব্বুই-এর প্রথমে উপন্যাসটি প্রকাশ করেন।

উং চ্যাং-এর বাবা ছিলেন লং মার্চের সময়কার বীর নেতা। উং-এর বাবা মা দু'জনেই প্রাদেশিক স্তরে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। উপন্যাসে লেখিকার মা, ঠাকুমা এবং লেখিকার জীবন অভিজ্ঞতার বর্ণনায় সে কথা বলেছেন উং।

(পুরুষশাসিত সমাজ সংস্কৃতিতে পুরুষের স্বার্থরক্ষা করাই নারীর কাজ। ঘর গেরস্থালি সামলানোই তাদের মূল দায়িত্ব। সে কাজ ব্যহত হলেই বিপদ, 'পার্টি টু পার্টিসাপটা' — মার্কা স্ত্রীই হচ্ছে ইকনমিক। সাম্প্রতিককালে ফ্রান্সের এক ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রীর আত্মহত্যাা সমাজে নারীর মূল্য আসলে কী — সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। ফরাসী ভদ্রমহিলা মন্ত্রীসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন, দপ্তরের কাজে তার দিনের বেশিরভাগ সময়ই অতিবাহিত হত। সম্প্রতি ক্যাবিনেট পুনর্বিন্যাসের সময় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের কাছে তার স্বামী স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াই গৃহস্থালির কাজে স্ত্রী যথোপযুক্ত সময় দিতে পারছে না বলে আবেদন জানান। স্বামীর আবেদনের ভিত্তিতেই ক্যাবিনেট থেকে বাদ পড়েন মহিলা, হতাশা আর অপমানে আত্মহননের পথ বেছে নেন।

বিদেশের কথা বাদই দেওয়া গেল, আমাদের এই বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রশ্নে যেভাবে মহিলাদের দমিয়ে রাখা হয়েছে তার ইতিহাসও বড় কম নয়।

স্ত্রী শিক্ষার যুগ থেকেই শিক্ষায় নারীর অধিকার আর সীমা নিয়ে উঠেছে নানা বিতর্ক। ভুবনচন্দ্র বসুর মেয়ে চন্দ্রমুখী বসু যখন 'ডেরা স্কুল ফর নেটিভ ক্রিশ্চান গার্লস' থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন স্কুলের প্রিন্সিপাল মিস্টার হেবন ওয়েব্স্টার ড্কিশনারি এবং অন্যান্য কতগুলি বই কিনে দিয়ে তাকে পরীক্ষা দেবার সঙ্কল্প ছাড়তে বলেছিলেন। অবশেষে সিণ্ডিকেট সভার সিদ্ধান্তে ১৮৭৬ সালে চন্দ্রমুখী পরীক্ষা দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সিণ্ডিকেটের শর্ত অনুযায়ী চন্দ্রমুখীকে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরও সফল পরীক্ষার্থীর তালিকায় তার নাম ওঠেনি।

১৮৭৯ সালে বেথুন বিদ্যালয় থেকে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী যখন এনট্রান্স পাশ করেন, সে সময় সমাবর্তন উৎসবে উপাচার্য তার সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন বাংলা এবং ইতিহাসে তো বটেই এমনকি বিজ্ঞানের মতো বিষয়ে 'হুইচ ইজ নট ইউস্যুয়ালি কনসিডারড্ টু বি কনজেনিটাল টু দা ফিমেল ইনটেলেক্ট', তাতেও কাদম্বিনী পাশ করেছেন।

কিন্তু বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের মেধাবিনী ছাত্রী কাদম্বিনীর এই পুরুষোচিত বিদ্যাচর্চা ভালো চোখে দেখেননি অনেকেই। তাই ডাক্তার হবার শেষ পরীক্ষায় অন্যান্য সব বিষয়ে যথাযথ নম্বর পেলেও, জনৈক নারীশিক্ষাবিদ্বেষী বাঙালি পরীক্ষকের জন্য একটি বিষয়ে তিনি কম নম্বর পান, অল্পের জন্য এম. বি. ডিগ্রি তার হাতছাড়া হয়ে যায়। পরে অবশ্য ইংল্যাণ্ডে গিয়ে উপযুক্ত ডিগ্রি নিয়ে এসেছিলেন কাদম্বিনী।

(নানাভাবে নানা উপায়ে নারীর ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়েছে, তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার/কেন নাহি দিবে অধিকার? — এ প্রশ্ন যার তিনিও কিন্তু নিজের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর 'এ্যাম্বিশন'-কে ভালো চোখে দেখেননি, স্বর্ণকুমারীর 'এবিলিটি' সম্পর্কে তার

সন্দেহ ছিল। বন্ধু রোটেনস্টানকে লেখা চিঠিতে 'আনফরচুনেট ক্রিয়েচার' স্বর্ণকুমারী সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য বলাবাহুল্য ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। বিদেশের বাজারে স্বর্ণকুমারীর বই ভালোই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, 'কাহাকে' উপন্যাসটির একাধিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল।)

সংসার এবং সন্তান পালনই নারীর প্রাথমিক দায়িত্ব, সন্তানের প্রতি নারীর সদাসতর্ক লক্ষ্য থাকবে — এটিই 'স্বাভাবিক'। স্বর্ণকুমারী দেবীর কাছে স্বামী-সংসারের মতোই গুরুত্ব পেয়েছিল তার সাহিত্যজীবন। এজন্য সে সময় তো বটেই, এখনও তাঁকে 'অস্বাভাবিক' রমণী হিসেবেই বর্ণনা করা হয়। সম্প্রতি জনপ্রিয় একটি বাংলা সাপ্তাহিত পত্রিকায় জনপ্রিয় এক লেখক ও তাকে 'অদ্ভুত রমণী' বলে উল্লেখ করেন।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের এক সময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নটী বিনোদিনীকেও অপমান আর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে তারই চেষ্টায় গড়ে-ওঠা স্টার থিয়েটার ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। আজ থেকে একশ বছর আগে ব্যক্তিগত লাভালাভের কথা চিন্তা না করে অর্ধলক্ষ টাকার প্রলোভনকে হেলায় উড়িয়ে দিয়ে — নাটকের জন্য যে নারী তার প্রেমিকাকে বাধ্য করেছিল থিয়েটার হল তৈরী করতে, প্রতিদানে সে পেয়েছিল সহকর্মীদের অবজ্ঞা আর উপেক্ষা।

রাতের পর রাত জেগে ষ্টার থিয়েটারের কাজ দেখেছিলেন বিনোদিনী, এমনকি অনেক সময় ইট বালিও বয়েছেন। সে সময় সবাই তাকে আশ্বাস দিয়েছিল থিয়েটার হলটি বাংলার এক নম্বর অভিনেত্রী বিনোদিনীর নামেই নামাঙ্কিত হবে। নাম হবে বে-থিয়েটার। বলাবাহুল্য, তা হয় নি এবং রেজিস্ট্রেশনের পর বিনোদিনী সে কথা জানতে পেরেছিলেন। একে তো জন্ম পরিচয়ে বারাঙ্গনা, তায় মহিলা, তার অধীনে কাজ করতে 'আর্য তেজ ভরে দীপ্ত' বাঙালি পুরুষদের অভিমানে তো লাগতেই পারে।

অতএব চারদিক থেকে 'অষ্টবজ্র দিয়া' তাকে ধীরে ধীরে কোণঠাসা করে ফেলা হল। 'আমার কথায়' বিনোদিনী লিখেছেন 'আমি যাহাতে উক্ত থিয়েটারে বেতনভোগী অভিনেত্রী হইয়াও না থাকিতে পারি, তাহার জন্যও সকলে বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন' — এ চেষ্টা ফলবতী হয়েছিল। মাত্র ২২ বছর বয়সেই এই 'কুইন অফ দা বেঙ্গলি থিয়েটার'-কে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। বৃদ্ধ বয়সে তার অসহায় মৃত্যুর খবরটুকু প্রকাশ করার মতো বদান্যতা দেখায়নি কোন কাগজ। বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাময়ী লেখিকা আশালতা সিংহ (১৯১১-১৯৮৩)। সমাজ এবং পরিবার যাঁর ক্ষমতাকে গলা টিপে মেরেছিল। গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধে মানবিত সম্পর্ক, প্রেম, যৌনতা — ইত্যাদি নিয়ে যে ধরণের সাহসিক মন্তব্য করেছিলেন আশালতা — সময়, সমাজ এবং সর্বোপরি 'নারীত্বে'-র পক্ষে তা ছিল বিপজ্জনক। এই শক্তিময়ী লেখিকার কলম শেষমেশ তাই মোহনানন্দের জীবনগ্রন্থ রচনাতেই নিঃশেষিত হয়!

(পুরুষ-শাসিত এই তামাম পৃথিবীতে ক্ষমতা, অধিকার সবই পুরুষের একচেটিয়া। বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি — সবই ঘুরেফিরে ভাঙা রেকর্ডের মতো এ কথাই বলে যায় — পুরুষ হচ্ছে সর্বশক্তিমান, 'ঈশ্বরের' শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আর নারী হল তার পূজায় নিবেদিত অর্ঘ্য। সেজন্যই বোধহয় আলাউদ্দিন খাঁর কন্যা অন্নপূর্ণার নাম শোনা যায় না। মৃত্যুর পর 'অবিচ্যুয়ারি'তে সাত্রের সঙ্গিনী হিসেবেই কেবল সিমন দ্যা বোভোয়ার নাম উল্লিখিত হয়। এজন্যই বোধহয় জিউ পুরুষরা প্রভাতী প্রার্থনায় বলেন, 'থ্যাঙ্ক গড, আই ওয়াজ নট বরন্ এ্যাজ এ ওম্যান।'

এদেশে যখন পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ আর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ঢেউ লাগল, তারপর থেকে

'বৈজ্ঞানিক' ভাবেই নারী-পুরুষের চরিত্রের অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার কাজ শুরু হল। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় এ শতাব্দীর প্রথমদিকে 'নরনারীর মেধা কি সমান' প্রবন্ধে জনৈক লেখক 'বিজ্ঞানসম্মত' উপায়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে নরনারীর বুদ্ধির তারতম্য তাদের 'প্রকৃতিগত'।

পুরুষ হল 'মস্তক' — উন্নত, অরক্ষিত এবং 'মস্তিষ্ক' অর্থাৎ বুদ্ধির আধার। আর নারী হল 'বক্ষ' — সুরক্ষিত এবং আবেগ অনুভূতির আধার।

অর্থাৎ বুদ্ধি বা ক্ষমতার প্রশ্ন মহিলাদের ক্ষেত্রে অবান্তর। 'জেনানাপ্রথাই' তাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা।)

সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র — এ অসাম্যের অবসান কোথায়? সুলতানার স্বপ্ন (১৯০৮) গল্পে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সেজন্যই এক ইউটোপিয়ান 'নারীস্থানে'-র কল্পনা করেছিলেন, যেখানে অধিকার নেই, পাপ নেই কেননা নারীরাই সে দেশের পরিচালক। পুরুষেরা গৃহভ্যন্তরে 'মর্দানা'য় আবদ্ধ। 'যদবধি 'মর্দানা' প্রথা প্রচলিত হইয়াছে তদবধি এদেশে কোন প্রকার পাপ কিম্বা অপরাধ হয় নাই ...... নন্দনকাননতুল্য নারীস্থানে নারীর পূর্ণ আধিপত্য, যৎকালে পুরুষেরা মর্দানায় থাকিয়া রন্ধন করেন, শিশুদের খেলা দেন, এককথায় যাবতীয় গৃহকার্য করেন।' নারীর 'আপন ভাগ্য জয় করিবার' কি এটাই শেষ রাস্তা?

বেশ কিছু বছর আগে ঝরণা ধর, অপূর্ব সাহা, দীপান্বিতা রায় প্রভৃতি ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ ছিল। এরা ছিলেন যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। ঝরণা ধরের উপরোক্ত বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে কিছু বলব বলব করছিলাম তার আগেই কিন্তু অপূর্ব সাহা তার বক্তব্য শুরু করলেন। তার সুরে সুর মিলিয়েছিলেন দীপান্বিতা। চুপ চাপ শুনলাম।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের ছাত্রী অনিন্দিতার ইচ্ছে ছিল ট্রাক চালিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবে। হাইওয়ে দিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে যাবে তার গাড়ি। কিন্তু সেসব এখন স্বপ্ন। অ্যাক্সলেটর দাবানোর বদলে তাকেই দাবিয়ে দিয়েছে তার পরিবার। মেয়েদের কাজ ওটা নয়। ও কাজ ছেলেদের।

কাজের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যেকার এই যে ফারাক — তার সৃষ্টি আজ হঠাৎ নতুন করে হয়েছে এমন নয়। পুরুষাতান্ত্রিক সমাজের গোড়া থেকেই মেয়েদের দেখা হয়েছে আলাদা চোখে। পুরুষ কাজে বেরোবে ঘরের বাইরে আর মেয়েরা সামলাবে হেঁসেল। পুরুষের কাজটাই কাজ। বাকিদেরটা কর্তব্য। এই বাঁধনে একদা সমাজপতিরা যে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন — আজ কম্পিউটার টেকনোলজির যুগে এসে তারই পরিবর্তিত রূপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

যে ঐতিহ্য মৈত্রেয়ীকে বাকরুদ্ধ হতে বলা হয়েছিল, খণার জিব কাটা গিয়েছিল পুরুষ প্রাধান্যের জোরে — 'সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলছে', মাত্রার সামান্য হেরফের হয়েছে — এই যা। মেয়েরা এখন ঘরের বাইরের কাজের জগতে এসেছে ব্যাপকহারে। কিন্তু 'সংসার' নামের সীমাবদ্ধ বৃত্তের পরিধির বাইরে তার পেশাগত দক্ষতার বিকাশ ঘটেছে সামান্যই। তাকে বারে বারে ঠারেঠোরে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে শেষপর্যন্ত সে একজন মেয়ে। সামাজিক বিধান শিরোধার্য করাতেই তার মুক্তি।

তাই তিরিশ বছর আগে যে মহিলা উনুনের সামনে বসে ঝিঙে পোস্ত রাঁধতে রাঁধতে লাল হয়ে যেতেন, স্বামীর অন্তর্বাস খুঁজে দিতেন কর্তব্যপালনের খাতিরে, সূঁচসুতো দিয়ে নকশা ফুটিয়ে

লিখতেন — 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' — আজ তারই মেয়ে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এর সাজানো ঘরে বসে এক্সিকিউটিভ স্বামীর টাই-এর নট বেঁধে দেয়, ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে ফিরলে দু'মিনিটের মধ্যেই ধোঁয়া ওঠা নুডলস এনে সাজিয়ে ফেলে ডাইনিং টেবিলে। পেলমেটে কোন পর্দা ঝুললে ভালো দেখতে হবে সে ভাবনাও তার) অবশ্য এসব কাজে তাকে সব সময়ই সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছে মিডিয়া ও তার বিজ্ঞাপন।

দূরদর্শনের বিজ্ঞাপনে যেসব আধুনিকাদের দেখানো হয়, তাদের কাজ বলতে সেই স্নান করা, কাপড় কাচা, খাবার তৈরী করা এবং তা হাসিমুখে পরিবেশন করা। জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ এই সব কাজ করাতেই — তা বোঝাতে খুব যে একটা মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হচ্ছে না বিজ্ঞাপনদাতাদের। যেখানে ছেলের কাপড়ে কোন দাগ লাগলে ডিটারজেন্ট পাউডারের কৌটো হাতে মায়ের পাশে শিশুকন্যাকেই এসে দাঁড়াতে হয়। পরবর্তীদৃশ্যে সেই কাচা শার্ট পড়ে ছেলেটি ডিস্কো নাচে। মা-মেয়ে সেইদিকে হাসিমুখে তাকিয়েই থাকে। অর্থাৎ মায়ের এখনকার কাজটি যে ভবিষ্যতে মেয়েটিই করবে ইঙ্গিত দেওয়া হল একই সঙ্গে। আধিপত্যের ব্যাপারটা এরপরে আর কোথাও স্পষ্ট নেই।

অপর একটি সাবানের বিজ্ঞাপনে দেখানো হয় ফুটফুটে এক শিশুকন্যা মায়ের অনুকরণে সারা শরীরে তোয়ালে জড়িয়ে বাথটবের সামনে দাঁড়িয়ে সাবানকে অনুরোধ করছে 'মুঝে মাম্নি জ্যায়সা সুন্দর বনা দো'। যেন মেয়েটির কাজ হবে শুধুই মায়ের মতো সুন্দর হয়ে ওঠা।

(আসলে আমাদের সমাজ কাঠামোয় একটি মেয়েকে মায়ের মতোই গৃহকর্মনিপুণা আর একটি ছেলেকে বাবার মতোই ফিটফাট 'কাজের লোক' হয়ে উঠবার কথা শেখানো হয় ছেলেবেলা থেকেই — বললেন বিবেকানন্দ রোডের বাসিন্দা রাখী ভাদুড়ী। খুব ছোটবেলা থেকে পারিবারিক গন্ডিতেই এই পার্থক্যের বীজটা বোনা হয়ে যায়। একটি ছেলেকে যখন খেলনা কামান কিনে দেওয়া হয়, তার বোনকে দেওয়া হয় বারবি ডল। কোনটা পুরুষোচিত আর কোনটাই বা মেয়েলি, তার শিক্ষা শুরু হয় শিশুকাল থেকেই। যখন ছেলেটি ফুটবল খেলতে মাঠে যায়, সে সময় মেয়েটি লিপগ্লস বা নেলপালিশের শেষ করতেই ব্যস্ত থাকে।

আর এই ব্যস্ততার ছাপই গিয়ে পড়ে মেয়েদের ভবিষ্যৎ কাজের জগতে। অত্যন্ত সুকৌশলে পুরুষনিয়ন্ত্রিত সমাজ নারীকে নিজেদের মনোমত করে নেয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন এক দক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজের জগতে অধিকাংশ মেয়ের প্রতিষ্ঠা।

অবশ্য এই প্রক্রিয়াটা যে খুব সহজেই ঘটে যায় এমন নয়। নীতিশিক্ষার মোড়ক তৈরী করে তার মধ্যে ঢোকানো হয়েছে নানান বিধিনিষেধের খড়কুটো। — বললেন দীর্ঘদিনের বিজ্ঞাপন আন্দোলন কর্মী শেখর মুখার্জী। সেকারণে মেয়েদের রাত করে বাড়ি ফেরা বারণ। কাজকর্ম সারতে হবে দিনের আলো থাকতেই। যাতে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনতে না হয়।

বস্তুত নীতিশিক্ষার পাশাপাশি পারিবারিক জীবনে মেয়েদের ভবিষ্যৎ কাজ সম্পর্কে শিশুবয়স থেকেই শ্রম বিভাজনের একটা আলাদা ছক তৈরী করা হয়। এই ছক সাজানো হয় প্রচলিত সামাজিক বিধিবিধানের কথা চিন্তা করে। যেখানে পরিবর্তন নয়, পালন করাটাই গর্বের। তাই হাজারো ঝামেলা আছে জেনেও সংসার সম্বন্ধে মেয়েদের একটা মোহ তৈরী হয়। পালনের আগ্রহ থেকে যে মোহের সৃষ্টি। যে কর্তব্যপালনে শরৎচন্দ্রের নায়িকারা পাখা হাতে বসে চিরকাল নায়কের থালার মাছি তাড়ায়। আর রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীজাতিকে আখ্যা দেন 'সমাজের কেন্দ্রানুগ শক্তি।'

১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সারা ভারতে এই কেন্দ্রানুগ শক্তির পরিমাণ প্রতি সহস্র পুরুষ প্রতি ৯২৩ জন। আর এই বিপুল সংখ্যক ভারতীয় নারীরা ঘরে বা বাইরে কোনও না কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত।

কিন্তু ঘর আর বাইরের জগৎ — দু'জায়গাতেই রয়েছে বিভাজন আর শোষণের ইতিহাস। পুরুষেরা থলি ভর্তি করে বাজারে করে আনলেও রাঁধতে হবে মেয়েটিকেই। তার সিগারেট, মদ খাওয়া চলবে না। তাহলেই বাজে মেয়ের শিলমোহর সেঁটে দেওয়া হবে দু'দণ্ডের মধ্যে। এমনকি মহিলা বসেদেরও এর হাত থেকে নিস্তার নেই। বহু কুপ্রস্তাবে ভরে উঠবে লেটারবক্স।

একটি বাণিজ্যিক বাংলা সিনেমায় নায়িকার পেশা ছিল বেশ্যাবৃত্তি। অনেক ঘাটে জল গড়িয়ে যাওয়ার পর তার ইচ্ছে হল সে আবার সুস্থ জীবনে ফিরে যাবে। শেষ দৃশ্যে সে নায়ককে চিঠি লিখে জানিয়েছে, এমন জায়গায় যেতে চাই যেখানে মদ নেই, সিগারেট নেই। অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তিক সমার্থক হিসেবে সিগারেট ও মদ্যপানকে দেখানোব একটা ব্যাপার রইল। অথচ হামেশাই যেসব কেতাদার ও বড় চাকুরে পুরুষেরা সিগারেট বা মদ্যপান করছেন ক্লান্তি দূর করার জন্য বা টেনশন কাটানোর জন্য তাদের 'চরিত্র' নিয়ে কিন্তু সমাজে কোনও অভিযোগ নেই।

'পরমা' সিনেমায় বিবাহিত নায়িকার অন্য পুরুষের নায়িকার সঙ্গে বিবাহোত্তর সম্পর্ক তৈরির জন্য তাকে সামাজিক পরিস্থিতি অনুতপ্ত হতে বলছে, অপর্ণা সেন এমন দেখিয়েছিলেন। অথচ সেই মহিলারই স্বামী তার মহিলা সেক্রেটারির সঙ্গে আপত্তিকর সংসর্গ ঘটানোর প্রস্তাব কবছে এমনটাও দেখানো হয়েছে। ছবির মধ্যে নায়কের মন্তব্য মারফৎ অপর্ণা সেন দেখিয়েছিলেন পুরুষের এমত প্রস্তাব অস্বীকার করায় ওই সেক্রেটারিকে শুনতে হয় 'বিচ' বলে গালাগালি। আব ওই একই পুরুষ যখন জানতে পারেন তার স্ত্রীর 'অবৈধ সম্পর্ক' তখন স্ত্রী তার কাছ হোর।

সমাজকর্মী বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, "পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। তাই শিক্ষিত, চাকুরিজীবী ও অন্যান্য পেশায় যুক্ত মেয়েরাও কর্মক্ষেত্রে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার ঘটনাকে হজম করতে বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের ভালো কাজের ফল পেতে হয় উপরওয়ালাকে নানা উপায়ে খুশি করে। সেসব ক্ষেত্রে মেয়েদের কাজের মূল্যায়ণ তাদের যোগ্যতা দিয়ে হয় না। কাজের নিরাপত্তা, উন্নতি অনেকক্ষেত্রেই নির্ভর করে মনিবের ইচ্ছার উপর।

এমনই এক মনিবের বিরুদ্ধে যৌনলাঞ্ছনার অভিযোগ এনে আলোড়ন তুলেছিলেন অনিতা হিল। আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টে জর্জ বুশের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন বিচারক টমাস ক্লিয়ারেন্স। অনিতা একসময় তারই অধীনে আইনজ্ঞা ছিলেন। চাকরী করাকালীন কোনও অভিযোগ না তুলে কেন দশ বছর পর তা করা হলো এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে অনিতার সাফ জবাব ছিল, টমাসের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে তার স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়েছে, এমন একজন মানুষের — তা তিনি সাদা বা কালো যাই হোন না কেন — বিচারকের আসনে বসার অধিকার নেই।

কিন্তু এমন অভিযোগ তোলার উপযুক্ত সাহস অনেক মেয়ের মধ্যেই নেই। তাই আজ শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতেই চাকুরিরতা মেয়েদের মধ্যে অনেকেই যৌন লাঞ্ছনার শিকার।

যৌন লাঞ্ছনার পাশাপাশি মেয়েদের কাজের জগতে রয়েছে মেধার অস্বীকৃতি। নারীবাদীরা

বলেন, সত্যিকারের মেধার ভিত্তিতে কোনও মেয়ের উন্নতি হলে সেখানেও রেহাই নেই। অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেছে তার সমপর্যায়ে কর্মরত পুরুষ সহকর্মীদের বিরূপ মন্তব্য, অশালীন ব্যবহার — মেয়েটিকে ধীরে ধীরে হীনমন্যতার শিকার করে তুলেছে।

আর সমস্ত হীনমন্যতা কাটিয়ে যে মেয়েটি পুরুষদের পিছনে ফেলে অনেকগুলো হার্ডল পেরিয়ে যায়, তাকে নিয়েও সমালোচনার অন্ত নেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেসরকারী সংস্থার একজন উচ্চপদস্থ মহিলা কর্মী জানালেন, আড়ালে আবডালে সহকর্মীরা তার সমালোচনা করে বলে, যেহেতু তার কোনও সন্তান নেই তাই তার পক্ষে অফিসে উন্নতি করা সহজ হয়েছে। এভাবে পারিবারিক শূন্যস্থান পূরণেব পরিপূরক হিসেবে মেয়েটি সমস্ত যোগ্যতা ও সাফল্যকে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে যেসব মেয়েরা উচ্চপদস্থ নয়, — সাধারণ নারীশ্রমিক, তাদের উপর অবিচার তৈরী হয় একটু আলাদাভাবে। অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে অপেক্ষাকৃত কম মজুরীতে এইসব মেয়েদের খাটিয়ে নেওয়া হয় যথেচ্ছভাবে। এতকাল খনি ও বয়নশিল্পে এই লিঙ্গবৈষম্য সব থেকে বেশি ছিল। এখন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক ও কারিগরি শিল্প। মেয়েরা এসব শিল্পক্ষেত্রে প্রাথমিকপর্বে মালপত্র জড়ো করা ও বাঁধাছাঁদা করে। ফলে কম মজুরি পায়।

পুরুষ শ্রমিকদের বেলায় কিন্তু এই শ্রমবিভাজন নির্দিষ্ট করা নেই। তাকে সহজেই নজরদারি থেকে শুরু করে রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োগ করা হয়। এই নিয়োগ এক দিকে যেমন বেশি অর্থমূল্যের, অন্যদিকে খবরদারির অধিকারটাও অনেক বেশি থাকে।"

গবেষিকা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এই পুরুষনিয়ন্ত্রিত সমাজের চোখে একজন পুরুষশ্রমিক একটি নারী শ্রমিকের তুলনায় সব সময়েই উত্তমর্ণের মর্যাদা পায়। সমাজ নিয়ন্ত্রণে পুরুষ আধিপত্যের প্রতিফলনই যেন শ্রমের ক্ষেত্রে পড়ে।

এই আধিপত্যের আওতা থেকে আপাতভাবে মুক্ত রয়েছে শিক্ষকতা, নার্সিং, টাইপিস্ট প্রভৃতি জীবিকা। যেখানে শারীরিক দক্ষতা বা তেমন মননের প্রয়োজন নেই, কেবল মানবিক অনুভূতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে সম্বল করে জীবিকার রাস্তা খোলা হয়েছে।

সিঁথির একটি কম্পিউটার সেন্টারের কর্মী দীপা রায়চৌধুরীর এ-ব্যাপারে প্রবল আপত্তি। তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বলেন, মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘরের বাইরে যে ধরণের কাজ করতে সুযোগ পায় সে সব তো আসলে ঘরের কাজেরই প্রসারিত রূপ। স্কুলে ছাত্র পড়ান যে দিদিমনি, তিনিই ঘরে ফিরে এসে ছেলেকে শেখাতে শুরু করেন। আবার অসুস্থ রোগীকে ঘুম পাড়ান যে সেবিকা, তিনিই ঘরে ফিরে ছেলেকে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে বিছানায় শুইয়ে দেন। এই সেবা বা মমতাময়ী ভাবমূর্ত্তি থেকে মেয়েদের নিস্তার নেই।

এমনকি সেক্রেটারি হতে গেলে শুধুমাত্র শর্টহ্যান্ড, টাইপ জানা, ইংরাজীতে কথা বলা মেয়ে হলেই চলবে না, তাকে প্রথমত সুন্দরী হতে হবে, দ্বিতীয়ত কোমলপ্রাণা। বসের মাথা ধরলে টি-ব্যাগ জলে ভিজিয়ে পছন্দমতো চা তৈরী করতে জানতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ যাওয়ার আগে বসের দু'হাতে কোটের হাতা গলিয়ে দিতে জানতে হবে। যেহেতু তিনি কাজের মানুষ — তাই মাথা শান্ত রাখবার জন্য মাঝেমধ্যে রেস্তোরায় সঙ্গ দিতে হবে।

অবশ্য এ-সমস্তই অলিখিত শর্ত। ওপেন সিক্রেট। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও ঠিক যে সংসার

থেকে চাকরি করতে বেরিয়ে এসে মেয়েদের আবার সেই সাংসারিকতার ঘেরাটোপেই আটকে পড়তে হচ্ছে। উপযুক্ত স্বীকৃতি পাচ্ছে না তাদের মেধা ও মনন।

একই অবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও। ১৯৮৮ সালে তৈরি ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রণেকর সমীক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য সমস্ত শিল্পক্ষেত্রের চেয়ে যোগাযোগ শিল্পে মেয়েরা রয়েছে সবথেকে বেশি। সরকারী ক্ষেত্রে ১৫৫৩.৫ হাজার ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ৩৮৯.৫ হাজার নারীশ্রমিককে নিয়োগ করা হয়েছে।

কাগজ খুললেই দেখা যাবে রিসেপসনিস্ট পদে নিয়োগের বিজ্ঞাপনে কেবলমাত্র মহিলাদের প্রার্থী হিসেবে চাওয়া হয়েছে। সুন্দরী এবং সুকণ্ঠী মেয়েদের যেমন অফিসের অন্যান্য পুরুষ সহকর্মীরা পছন্দ করে, তেমনি তাদের উপস্থিতি অভ্যাগতদের তুষ্ট রাখবে — এমন ধারণা থেকেই এই নিয়োগ। এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের কোনও পেশাদারী দক্ষতায় পৌঁছনোর সুযোগ দেওয়া হয় না। বরং রবীন্দ্রনাথ কথিত 'স্ত্রীস্বভাব'ই যেন মেয়েদের কাজকর্মের একমাত্র শর্ত।

একথা স্বীকার করে দীপা জানালেন, এই যে ইদানিং কম্পিউটার শিল্পে ছোট বড়ো সমস্ত কোম্পানীতেই মেয়েদের এতো নিয়োগ — সেটা সম্ভব হচ্ছে মেয়েরা স্বভাবতই ধৈর্যশালিনী — তাই। এতো কম টাকায় স্ক্রীনের দিকে এতক্ষণ চেয়ে বসে থাকার মতো ছেলে কই? আর তাছাড়া ছেলেরা কম্পিউটারের উপর অধিপত্য বিস্তার করতে চায়। মেয়েরা চায় ধৈর্য ও মমতা দিয়ে পরিচ্ছন্নভাবে কাজটাকে শেষ করতে। এক্ষেত্রে দক্ষতা প্রয়োজন হলেও মূলত নারীচরিত্রের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলোকেই ব্যবহার করা হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন, 'নারী হবে সুন্দর, আর পুরুষ যথাযথ'। এই সৌন্দর্যের শর্ত তাকে পূরণ করতেই হবে। পুরুষের সে দায় নেই। কাজের ক্ষেত্রে জটিল কূটনৈতিক জটাজালের মধ্যে থেকেও তাকে সুন্দরী মোহময়ী হতে হবে, কেননা একজন নারীর পরিচয় প্রথমে নারী, শেষে নারী এবং তারপরেও নারী। কার্যক্ষেত্রে একজন মহিলার প্রশাসনিক দক্ষতা অথবা চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি তার আসল পরিচয় নয়, তিনি কতটা কোমল কতটা নমনীয় সেটাই প্রধান বিচার্য বিষয়।

আর কে না জানে, এদেশে নারীত্ব মানেই মাতৃত্ব। 'মেয়েরা মায়ের জাত'। কঠোরতা তাদের চরিত্রের স্বাভাবিক গুণ হতে পারে না, ভালবাসার স্বতোৎসার তাদের হৃদয়ে — এটাই সর্বজনগ্রাহ্য অভিমত।

তাই দশটার 'অফিস-টাইমে'-র বাসে লেডিস সিটে বসে থাকা কোনও অপরিচিতা অফিস যাত্রিনীর দিকে বাচ্চা এগিয়ে দিতে বাঁধে না কোনও পুরুষের। মেয়েরা যেহেতু মায়ের জাত ...... অতএব ৭/৮ ঘন্টা কোঁচকানো শাড়ি পরে অফিসে কাটানো সম্ভব কিনা, সে চিন্তা তো 'সেকেন্ডারি'। ছোটবেলায় বাংলা পরীক্ষার সেই অনিবার্য ব্যাখ্যা কি সহজে ভোলা যায় — বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'?

কিছুদিন আগে পর্যন্ত মেয়েদের অবস্থাটা ছিল এইরকম। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি নির্ভর কাজ তাদের অংশ গ্রহণের পথে বিস্তর বাধা ছিল। উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের হার যত বাড়ছে, চাকরীর বাজারে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর শিল্পক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও মেশিন বা যন্ত্রের ওপর মেয়েদের অধিকার সাধারণ সত্য নয়, অগ্রাধিকার অবশ্যই পুরুষের।

এসব বাধা সত্ত্বেও পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও আজ কম্পিউটার শিখছে। 'পার্সোনাল

কম্পিউটারে' কাজ করছে। এদিক দিয়েও নারী-পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য স্পষ্ট। ছেলেদের মধ্যে আশৈশব গড়ে ওঠা অধিকারবোধ, প্রভুত্ব- পরায়ণতার ছায়া মানবিক সম্পর্কের ওপর যেমন প্রভাব ফেলে, কর্মক্ষেত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। আমেরিকার একটি সংবাদ সাপ্তাহিকের সমীক্ষায় দেখা গেছে, বেশিরভাগ পুরুষেরা কেবলমাত্র কাজের সুবিধের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করে না, কম্পিউটারকে তারা হাতের মুঠোয় আনতে চায়। 'ম্যান এ্যান্ড দা মেশিন' এক হয়ে যায় — সব কিছুই থাকবে তাদের পদতলে, মনের ভেতরের উদগ্র বাসনা এটাই। অন্যদিকে মহিলারা অনেক বেশি মানবিক, অন্যের ওপর প্রভুত্ব না করেও কাজের সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মানসিকতা তাদের থাকে। কম্পিউটার তাই তাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে যায় না — কাজের সহায়ক হয়েই থাকে। মেয়েরা নিখুঁত ও সুন্দরভাবে কাজটি করে যায়। কিন্তু কাজের উপর কর্তৃত্বের ব্যাপারটা পুরুষদেরই একচেটিয়া।

এর কারণ হিসেবে পত্রিকাটি ছেলে ও মেয়েদের বেড়ে ওঠার সংস্কৃতিগত পার্থক্যকে চিহ্নিত করেছে। পাশ্চাত্যের তুলনা না আনলেও আমাদের দেশের হালও এই রকম। একটি মেয়ে — তিনি যতই উচ্চপদস্থ হোন না কেন, শেষ পর্যন্ত এটাও তাকে খেয়াল রাখতে হয় যে কর্মজীবনে তার স্ত্রীস্বভাবের ভাবমূর্তিতে কোথাও যেন ঘাটতি না থাকে। শুধু কর্মদক্ষতা নয়, সেই সঙ্গে লাবণ্য সম্পর্কেও একই সঙ্গে সচেতন থাকার জটিল অভ্যাস পালন করতে হচ্ছে মেয়েদের। কাজ কিম্বা জীবিকার সঙ্গে এই 'অদৃশ্য শর্ত' কর্মী মেয়েদের যেন অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে রেখেছে। এই শর্তকে নারীত্বের স্তোকবাক্যে সন্তুষ্ট রাখলেও তা আসলে অপমানেরই নামান্তর, কাজের ক্ষেত্রে নারী যে পুরুষের মতো ঝাড়া হাত পা নয় তা যেন ঘাড় ধরে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

আর এই দাসত্ব থেকে কেউ যদি ছিটকে বেরিয়ে যান — তাহলে তিনি ব্যতিক্রম। দু'একটি সন্তোষ যাদব অথবা সুদীপ্তা সেনগুপ্ত — যাঁরা হিমালয় টপকে যান, সুদূর আন্টারটিকায় পৌঁছে যান নিরাপত্তা অগ্রাহ্য করে।

কিন্তু ব্যতিক্রম তো দু'পাঁচজনই। এদের বাইরে যে বিরাট নারীসমাজ — নারীত্ব বিতরণ ছাড়া তাদের কাজটা তাহলে কি?

এ প্রসঙ্গে সবাই যে একই মতে বিশ্বাসী এমনটা নয়। গড়িয়াহাট মোড়ে ডাব বিক্রি করেন বারাসতের কালিদাসী। কাটারি দিয়ে ডাবের মুখ আলগা করতে করতে তিনি বলেন, "বাড়িতে গিয়া ভাত রান্না করুম।" সংসারধর্মেই তিনি সীমাবদ্ধ রাখতে চান নিজেকে। জীবিকার সঙ্গে এ-ব্যাপারে তাকে একটা সমঝোতায় আসতে হয়েছে।

আবার নারীবাদী মহিলা রাখী ভাদুড়ী প্রশ্ন তোলেন — ছেলেরাই বা কুটনো কুটবে না কেন?

এটা সত্যি যে ফ্ল্যাটবাড়ির ডাইনিং স্পেস থেকে অজগ্রামের মাটির দাওয়া — সংসারে মেয়েদের উপস্থিতি সত্ত্বেও যেখানেই ছেলেদের হাতে রান্নাঘরের সম্পূর্ণ বা আংশিক দায়িত্ব পড়ে সেখানেই অনর্থ। সেখানেই সেখানেই অস্বস্তি বা মিটিমিটি হাসি। সমাজ সংসার এই দৃশ্য কিছুতেই মেনে নিতে চায় না যে শক্তসমর্থ যুবক উবু হয়ে মা অথবা স্ত্রীর পাশে বসে অবসর সময়ে আলু পটলের খোসা ছাড়াচ্ছে। তাই গ্রামীণ সমাজে তৈরী হয়েছে 'কুমড়ো দেওর' শব্দটি। নিষ্কর্মা দেওরটির উপরই রয়েছে কুমড়ো কাটার ভার। রান্নাবান্না যেন নিষ্কর্মারই কাজ।

এই না-কাজ শুধুমাত্র মেয়েদের। মেয়েরা যেন দশভূজা। তাকে রাঁধতে হবে, আবার চুলও বাঁধতে হবে।

একারণেই একজন সফল চিত্র পরিচালিকাকে ক্লান্ত অবস্থায় বলতে শোনা যায়, আমার একজন স্ত্রী প্রয়োজন। অজান্তেই তিনি নিজেকে একজন পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে বসেন। ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরে যে মেয়েটির পরিচর্যায় আবার নতুন কাজের কথা ভাবতে পারবেন।

কমলকুমার মজুমদারের 'মল্লিকাবাহার' গল্পের মল্লিকা সারাদিন অফিসে গলদঘর্ম হওয়া আর পারিবারিক সুখাশ্রয়ের অভাবে শেষ পর্যন্ত সমকামে আশ্রয় নিয়েছিল, কাজের ক্ষেত্রে মেয়েরা যদি সীমাবদ্ধতার ঘেরাটোপে শেষপর্যন্ত আটকে থাকেই — তাহলে অবরুদ্ধ আবেগ নিঃসরণের জন্য অভিমানী নারীর ভবিতব্য মল্লিকার মতো কিনা কে বলতে পারে? যে পুরুষাঙ্গের প্রয়োগ অস্ত্রের মতো — তা ছিনিয়ে নেবার ঘটনা কিন্তু ইতিমধ্যেই আমেরিকায় শুরু হয়ে গিয়েছে।"

কিন্তু, এই পুরুষাঙ্গ ছিনিয়ে নেওয়ার প্রয়াস কি প্রকৃতি বিরুদ্ধ নয়? মুষ্টিমেয় গুটিকয়েক নারীত্ববাদীদের অস্বাভাবিক ক্রিয়াপদ্ধতি বা স্বভাববৈকল্য দিয়ে নারী সমাজকে বিচার করা কি যুক্তি সঙ্গত।

কোমলপ্রাণা, সেবাপরায়ণ, সংসারপ্রাণা নারীদের প্রতি প্রগতিশীলা নারীবাদীরা আক্রমণ শানালেও নারীর নারীত্ব, মাতৃত্ব, ত্যাগ, তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণাবলীর প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করলেও, নারীর যা আদিমতম স্বভাব তা'ত আর মিথ্যা হয়ে যায় না।

যারা প্রগতিশীল, পুরুষদের আধিপত্য মেনে নিতে চান না বলে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন না, তারা পোষ্যপুত্র বা অবৈধ সন্তানদের (সমাজের চোখে) জননী হবার জন্য হা পিত্যেস করেন। স্নেহ, মমতা দিয়ে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে সেই সন্তান মানুষ করে তোলার মধ্যে আপন জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান। সুতরাং এটাই কি প্রমাণিত হয় না যে মাতৃত্ব এবং নারীত্বই এক জন মেয়ের প্রথম ও প্রধান আদিমতম পরিচয়।

নারী নির্যাতনের মূল অপরাধী মেয়েরাই

এক সময় রথীন রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল খুব। এদিক সেদিক ঘুরতে যেতাম একসঙ্গে। সুখ দুঃখের গল্প হতো। গুমড়ে থাকা মনটা শান্ত হতো। এক দিন সেই রথীন বলেছিল তার মায়ের কথা — 'ভাবতে পারবে না পরমেশ, ভাবতে পারবে না। মা-রাও যে কি স্বার্থান্ধ, ঈর্ষান্ধ এবং হিংসের জ্বালায় অস্থিরচিত্ত হয়ে নিজের সন্তানের পর্যন্ত কি ক্ষতি করতে পাবে তা বলে বোঝাতে পারব না।

— কি ব্যাপার মাতৃ জাতির প্রতি এত উষ্মা!

— আমিও'ত ভুক্তভোগী, তাই।

— কি রকম?

— জান আমার বউ এখন আমার সঙ্গে থাকে না। বাপের বাড়ি চলে গেছে।

— নিজেদের মধ্যে মান অভিমানের পালা চলছে। অভিমান ভাঙলে ঠিক চলে আসবে।

— না, ও আর আসবে না।

— এতো ভেঙে পড়ছো কেন?

— মা যখন ছেলের সর্বনাশ ঘটায়, তখন কে কি করতে পারে?

— মা'র ঘাড়ে সব দোষ চাপাচ্ছ, কি করেছেন তিনি? হয়তো পুত্রবধূর ওপর খারাপ ব্যবহার করেছেন .....

— না তা নয়, পরমেশ। খারাপ ব্যবহার'ত করেছেনই। খারাপ ব্যবহার করতেন বিয়ের পর থেকেই। আমি আমার ভালবাসা দিয়ে তার মনের ক্ষোভ মেটাতাম। কিন্তু, একদিন আমার যৌবনের এক প্রেমিকার চিঠি তার হাতে এসে পড়লো। এক লাইন দু'লাইনের চিঠি নয়। বেশ বড়। প্রেমিকা নিজেকে যেন উজাড় করে দিতে চেয়েছিল সেই চিঠিতে।

— তা, তুমি সেই মেয়েকেই'ত বিয়ে করলে পারতে। অন্য জায়গায় গেলে কেন?

— সেই চিঠি আমি পাই নি। পেলে হয়'ত জীবনটাই অন্য রকম হতো।

— তাহলে বৌ সেই চিঠি পেল কোত্থেকে?

— আমার সদাশয়া চিন্ময়ী জননী স্বহস্তে পুত্রবধূকে অর্পণ করেছিলেন সেই চিঠি।

— বলো কি! এমন সর্বনাশ'ত শত্রুও করে না।

— তাহলে আর বলছিলাম কি! আমি কি শুধু শুধু মা'র বিরুদ্ধে কামান দাগছি?

— চিঠিখানা মাসীমার হাতেই পড়েছিল। উনি তা তোমাকে না দিয়ে বেশ যত্ন করে সংরক্ষণ করেছিলেন ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু এ-শত্রুতা কেন? আপন সন্তানের এ-সর্বনাশ কেন?

— আমি মা'র বড় ছেলে। ছোট বেলা থেকেই মা ছাড়া অন্য কাউকে চিনতাম না। মা যে-ভাবে চালাতেন, সেই ভাবে চলতাম। যা বলতেন, তাই শুনতাম। মা'ত বলতেন তোর মতো ছেলে পেয়েছি আমার সাত জন্মের পূণ্যির ফল।

— তুমি কি এক সন্তান, মানে ভাই বোন আর নেই?
— বোন নেই। ছোট দু'ভাই আছে। মার সঙ্গে অতোটা সম্পর্ক নেই ওদের।
— চাকরী করে?
— হুঁ, বিয়ে করেছে। যে যার সংসার নিয়ে থাকে। বলতে গেলে চাকরীর সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ে।
— মা থাকেন তোমার সঙ্গে?
— হ্যাঁ, আমি বিয়ে করেছি চাকরী হওয়ার বারো বছর পর। তাও মা'র ইচ্ছের বিরুদ্ধে। আমার চাকরী হবার পর বাবা মারা গেলেন। মা আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। মাইনে যা পেতাম সব তুলে দিতাম মার হাতে। হাত খরচা যা লাগে গুণে গুণে মা-ই দিতেন। নিজের জন্য একটি পয়সাও মাইনে থেকে আলাদা করে রাখতাম না।
— ঐ গোণাগুন্তি টাকা নিয়েই বান্ধবীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে?
— হ্যাঁ, কি করে জানলে বান্ধবীদের কথা?
— মা'র প্রতি যার বেশি দুর্বলতা, মাতৃজাতির প্রতি তার দুর্বলতা'ত থাকবেই।
— একদম খাঁটি কথা বলেছ।
— তাছাড়া, ঐ যে চিঠির কথা বললে। তা তোমার সমর্পিতা বান্ধবীটির নাম কি?
— অন্তরা, অন্তরা মুখার্জী।
— এখন দেখা হয় না?
— হয়, তবে ও সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তাছাড়া ও'ত ভাবে ও আমার উপেক্ষিতা। আসলে কি জান, আমি বৌকে খুব ভালবাসি। অন্য মেয়ে টানতে পারে না।
— বৌ চলে গেছে, মাসীমা নিশ্চয় দারুণ খুশী।
— হ্যাঁ, তা আর বলতে!
— বৌকে নিয়ে আসার কথা বলেন না?
— না, মুখেও আনেন না। বৌ'এর সঙ্গে কোনো দিনই ভালো ব্যবহার করেননি। তার চোখে আমার সব চেয়ে বড় অপরাধ আমি বৌকে খুব ভালবাসি।
— আচ্ছা, বিয়ের পর মাইনের টাকাগুলো কার হাতে দিতে?
— প্রথম কয়েক মাস মায়ের হাতেই দিতাম। তার পরে বৌ-এর হাতে।
— আর সেই থেকেই যত গোল।
— কি আশ্চর্য, সব ঠিক ঠিক ধরতে পার তুমি।

শাশুড়ির জন্য পুত্রবধূরা ঘরছাড়া হয় এ-রকম ঘটনা শুনি। সঙ্গে অবিবাহিতা ননদ বা ননদরা থাকলে'ত কথাই নেই। আমার সামনের বাড়িতে এক অল্প বয়স্কা সধবা মহিলা কাজ করেন। উচ্চবিত্তর সাহেবী কায়দায় অভ্যস্তদের ভাষায় গভর্নেস। ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকুরে। মেয়েটি স্কুল-টীচার। তিন-চার বছরের একটি বাচ্চা। তাকে দেখা শোনা করার জন্য মহিলাকে রাখা। বেশ সম্ভ্রমশীলা, দেখতে শুনতে বেশ ভালো, ভদ্রস্থ। বাচ্চাটার মা'র থেকেও দেখতে ভালো। শুনেছি তার এক ছেলে আছে। ক্লাস নাইনে পড়ে।

সকাল সাতটায় ঢোকেন। মাঝে মধ্যে দেখি, যেন শিশিরসিক্ত তরতাজা এক স্থলপদ্ম। যখন সন্ধ্যে সাতটায় চলে যান তখন অস্তমিত সূর্যের মতো তার রূপ। এহেন দুর্লভ রমণীরত্নকে হেলায় হারাতে চায় কোনো পুরুষ!

কিন্তু, মহিলার স্বামী তাকে ত্যাগ করেছে মাতৃদেবীর আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে। প্রজানুরঞ্জক রামের মতো মহান সন্তান।

তাই, মহাশ্বেতাদেবীর মতো বিদগ্ধ মহিলা এবং প্রতিথযশা লেখিকার অভিমত ঃ

'নারী নির্যাতনে মূল অপরাধী মেয়েরাই'

"প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে ভারতে একটি নারী ধর্ষিতা হয়; প্রতি দু'ঘন্টায় পণের জন্য একটি বধূকে হত্যা করা হয়; প্রতি তেতাল্লিশ মিনিটে একজন মেয়ে হয় অপহৃতা, নিগৃহীতা হয় এক নারী প্রতি ছাব্বিশ মিনিটে, প্রতি তেত্রিশ মিনিটে একজন হয় নিপীড়িতা আর প্রতি বাহান্ন মিনিটে একটি ইভটিজিং ঘটে।" এটা ন্যাশনাল ক্রাইম রিসার্চ ব্যুরোর ১৯৯১-এর রিপোর্ট। সংখ্যাতীত ধর্ষণ, অপহরণ ও নিগ্রহের খবর পুলিশ অবধি যায় না। অতএব তা ধরা হয় নি। তুলনামূলকভাবে নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতায় মহারাষ্ট্র প্রথমে, পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয়। এ রিপোর্ট ১-১২-৯২।

এ'ত পরিসংখ্যান। ভারতীয় সমাজে নারীকে কি চোখে দেখা হয়, জি টি.ভি. এক অনুষ্ঠানে তা বুঝিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ দেখে ফেলেছিলাম সেটা। এ-লেখা যারা পড়ছেন, তারাও অনেকে দেখেছেন। অনেক স্থানীয় সমাজ প্রতিনিধি পুরুষ এক গোলটেবিল বৈঠকে এই রিপোর্ট নিয়ে অত্যন্ত অশ্লীল হাসির হররা তুলেছে। "যে বধূ ধর্ষিতা হল, সেই কি ছেষট্টি মিনিট বাদে নিহত হয়? যাকে নিগ্রহ করা হয়, তাকেই কি আটাশ মিনিট বাদে ধর্ষণ করা হয়?" এমতো এক অশ্লীল বৈঠকের শেষে আলোচনাকারীরা রায় দিলেন, মেয়েরা যদি ঘরে থেকে ছেলেমেয়ে পালন, স্বামীসেবা, রান্নাবান্না করে দিন কাটায়, তাহলে এমনভাবে মানুষের চোখেও পড়ে না এবং ধর্ষিতা ইত্যাদি হয় না।

এমন প্রোগ্রামের পিছনে যে মানসিকতা তা নিশ্চয় সমাজের সকল মানুষের নয়। তবে অধিকাংশ মানুষেরই, আর তার মধ্যে নারীরাও আছেন। বধূহত্যাগুলির পেছনে শাশুড়ি ও ননদের ভূমিকা তো অনেক কেসেই প্রমাণিত। আমি বলব, অন্যত্র এবং এ রাজ্যে, নারী নিগ্রহের ঘটনা যে বাড়ছে, তার পিছনে সমাজ মানসিকতার ভূমিকাও বিশাল। একজন আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকাশ্য রাজপথে মারধোর করে কাপড় খুলে নেওয়া এজন্যই চলে, যে বহু পুরুষ ও রমণী দাঁড়িয়ে সেটা দেখেন। সেদিন যতজন উপস্থিত ছিলেন তারা একজোট হয়ে ওই কয়েক জন অপরাধীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতেন, পড়েননি। যদি বলা হয়, তাদের খুঁটির জোর অনেক, তবু বলব সেটাই শেষ কথা নয়। গণধোলাইয়ে ডাকাতদের মেরে ফেলার কথা হরদম পড়া যায়। ডাকাত মারার সময়ে মানুষের ক্রোধ হিসাবের অঙ্ক মেপে চলে না। ডাকাতিকে সমাজ হত্যা অযোগ্য অপরাধ মনে করে।

নারী নিগ্রহ, বা ধর্ষণ, বা বধূহত্যা ক্ষেত্রে মানুষের ক্রোধ কখনও হিসাবের অঙ্ক ছাড়ায় না। এজন্য ছাড়ায় না, যে ওগুলিকে হয়তো বড় অপরাধ বলে মনে করা হয় না। এতেই বোঝা যায় যে সমাজ মানসে নারীর জন্য প্রকৃত শ্রদ্ধাবোধ নেই। সমাজ মানসিকতা নির্বীর্য নপুংসক হয়ে গেছে। এবং এর দাম শেষ অবধি, অত্যাচারের শিকার যারা, তাদেরই দিতে হয়। নেহারবানুর ক্ষেত্রে, ফুটপাথবাসিনী অন্য নেহারবানুদের জীবিকার্জন কঠিন হয়েছিল। "নেহারবানুকে নিয়ে হইচই হয়েছে, অতএব তোমাদের কাজ দেব না", এটাই ছিল ওই মেয়েদের কাজ যারা দিতেন তাদের যুক্তি। নেহারবানু চাকরি পেয়েছে, অন্যরা কী করছে? ঠিক এক অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি

ঘটে সর্বত্র। যে পাড়ায় এরা বসবাস করেন সে পাড়া, এদের সন্তানদের স্কুল, স্থানীয় দোকানপাট, চেনা মানুষজন, সকলের কাছেই এই সব অত্যাচারের শিকাররা অপ্রিয় হয়ে যান। এদের সন্তানদের শৈশব হারিয়ে যায়। সমাজমানসিকতার ক্ষমতা হীনতা এদেরকেই পরোক্ষে অপরাধী বলে রায় দেয়। আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অঞ্জলি রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। তবু তাদের প্রকৃত, বাস্তব অভিজ্ঞতা এরকমই হবে বলে মনে করি। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত "সত্যলোক" (২৫/০২/৯৪) লিখেছেন বৈদ্যবাটি পৌরসভার কোনও ওয়ার্ডে এক ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের উপর সমাজবিরোধীরা হামলা করছে, ও বাড়ির কিশোরী মেয়েটিকে নিয়ে যেতে চায় বলে। এ সংবাদ সত্য হলে ভয়ঙ্কর। অসত্য হলে আরও ভয়ঙ্কর। সেক্ষেত্রে পরিবারটি বিপন্ন হবে।

রাজ্যে নারী নিগ্রহের ঘটনা বাড়ছে। হাওড়া জেলার মানশ্রী গ্রামে "পীরা" নামে এক নারী সংগঠন নির্যাতিতা, পরিত্যক্তা মেয়েদের সমাজ আর্থিক পুনর্বাসনের কাজ করে চলেছে দীর্ঘদিন। তারা ওখানে সর্বদা যাদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে, তারা কিন্তু শাসকদলের রাজনীতি করে না, বিরোধী দলের রাজনীতি করে। "পীরা"র মেয়ে কর্মীদের লাঞ্ছনা ও সন্ত্রাসের ঘটনা নিয়ে রাজনীতিকদের সোচ্চার হতে দেখিনি। নারীকে নির্যাতনের হাত থেকে যারা বাঁচাচ্ছেন সেই নারীরাই নির্যাতনের শিকার। একে সমাজ মানসিকতায় চূড়ান্ত অবক্ষয় ছাড়া কি বলব?

আবার এটা সার্বিক রাজনীতির ব্যর্থতাও বটে। একে তো নব্বই শতাংশ দাঁড়িয়ে দেখে নারীর নিগ্রহ। রাজনীতিক লোকরা তো একেবারে মানবনীতি ও নিরপেক্ষতা বর্জিত। কোন ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করব, কোন ক্ষেত্রের প্রতিবাদ করব না, তাতেও হিসাবের অঙ্ক। মিডিয়া হইচই করে। তার দরকার তো আছেই। সাধারণ মানুষ দুটো জিনিস চায়, আমার যা অভিজ্ঞাতা। (১) মিডিয়া খবরটি বের করুক এবং (২) পুলিশ অ্যাকশন নিক। — যা ভাবা দরকার, তাহ'ল নারী নির্যাতন-ধর্ষণ-নিগ্রহ-বধূহত্যা, ইত্যাদি ইত্যাদির একাংশ আমরা জানতে পারি। বাকিটা জানতে পারি না। লজ্জা, সন্ত্রাস, পরিবারের অনিচ্ছা, সমাজের টিটকারি, এসব কারণে থানা অবধি খবর পৌঁছায় না। আর, থানা জানলেই যে প্রতিকার করবে, সে ভরসাও তো সর্বদা থাকে না। একমাত্র বধূহত্যা ক্ষেত্রে এখন পুলিশ কিছু সক্রিয়, ধর্ষণ ক্ষেত্রেও সম্ভবত আইনকানুন কিছুটা সংস্কারিত হয়েছে।

আবার ফিরে যাচ্ছি সমাজমানসিকতায়। ভারতীয় সমাজে নারী বিষয়ে বিরোধী মানসিকতা কোন চূড়ান্ত অন্ধকারে পৌঁছেছে তা বুঝিয়ে দেবে উত্তরপ্রদেশের দুটি ঘটনা। "টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া" ২৪/০১/৯৪ ও ১৪/০২/৯৪ এলাহাবাদ ও মোরাদাবাদ জেলার দুটি ঘটনা লিখেছেন। দুটি ক্ষেত্রেই একটি করে হরিজন মেয়েকে উলঙ্গ করে জমিমালিকরা গ্রামবাসীদের সামনে তাদের এক ঘন্টা ধরে ঘুরিয়েছে। এ ঘটনা অন্য এক জাতপাত দীর্ণ রাজ্যে ঘটেছে? ঘটেছে নিশ্চয়। এখানেও লক্ষ্যণীয়, দুই ক্ষেত্রেই যুবকরা বলেছে, তারা দাড়িয়ে দেখছিল। রমণীটিকে রক্ষা করার সাহস তারা পায়নি, ভয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এই 'ভয়' তো আজ একটা নিদারুণ সত্য। কিন্তু মনে যদি তেমন ঘা লাগে, তখন মানুষ তো ভয়ভীতি ভুলে পবিত্র ক্রোধে জ্বলেও ওঠে। তার দৃষ্টান্ত কি নেই? একদা প্রচন্ড বলবান হেমেন মন্ডলকে দমন করেছিল সেইসব মানুষই, যারা তাকে ভয় পেত। তারপর একদিন ভয় পেতে ভুলে গিয়েছিল। পবিত্র ক্রোধের আগুন ভয়কে আহুতি দিয়ে জ্বলে উঠেছিল।

কয়েক বছরে মানুষ ক্রুদ্ধ হতেও ভুলে গেল। তাহলে অঙ্কটা দাঁড়াল কেমন? মা-বোন-বউ-মেয়ে, যে কোন নারীর নিগ্রহ মানুষ দাঁড়িয়ে দেখবে। নিগৃহীতা রমণীকে রক্ষা করবে না সমাজ।

সমাজের বিবেক মরে গেছে বা ধুঁকছে। দোষ দেবার সময়ে আমরা চেঁচাব, পুলিশ কী করছিল?

বাকি থাকল পুলিশ। কিন্তু 'পুলিশ' শব্দেও তো আমাদের প্রচন্ড অ্যালার্জী। যে অ্যালার্জী নিঃসন্দেহে পুলিশেরই তৈরী। পুলিশকে আমূলে খারিজ নয় করেই দেয়া গেল। তাহলে নিগ্রহকারীদের ব্যবস্থা কে করবে?

নারী নির্যাতন ও নিগ্রহ এরাজ্যে যথেষ্টা হচ্ছে, ১৯৯১ সালের রিপোর্টেই তা বলা হয়েছে। 'আজকাল' (১৫/০৩/৯৪)-এর প্রথম পাতাতে একটি সংবাদ বেরিয়েছে। ধর্ষিতা রমণী গ্রাম প্রধানের কাছে যান। গ্রাম প্রধান বলেন থানায় যেতে। ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ থানাও লেখে না এবং মহিলাকে গ্রাম প্রধানের কাছেই যেতে বলে। অর্থাৎ ধর্ষণকারী এক 'ডন'। ডনের বা ডনদের ভয়ে সমাজবাসী নির্বীর্য দর্শক হয়ে থাকবে, পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশও ভয় পাবে, তাহলে এর প্রতিকার কোথায়? দায়ী করবেন কাকে?

রাজ্য সরকারকে?

পুলিশকে?

সেটাই কি শেষ সত্য? আমরা নিজেরা দায়ী নই? আমরা, যারা আলপনার নিগ্রহ দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, অথচ তাঁকে বাঁচাতে ছুটে যাইনি?

আমি বলব আমরা মূল অপরাধী। সমাজসেবী মানুষ যদি সমাজবিবেক, মানবিকতা, সব বিসর্জন দিয়ে বসে থাকে তবে নারীনিগ্রহ বাড়বেই। প্রাচীন মূল্যবোধ যাদের ছিল তাদের প্রজন্ম বিগত। এই মুহূর্তে তরুণ প্রজন্মের এক বিশাল অংশ লুম্পেন মানসিকতায় আচ্ছন্ন। হিন্দি সিনেমা, দূরদর্শনের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সবই বুঝিয়ে দিচ্ছে নারী ভোগ্য, নারী পণ্য, নারীর কোন মূল্য নেই। নিগ্রহ বাড়বে।

প্রতিকার পর্ব সূচিত করতে সক্ষম জাগ্রত জনমত। "এরকম তো চলছে, চলবেও" বলে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে একতরফা গাল দিয়ে চলাতে আমি বিশ্বাসী নই। নারী নিগ্রহের সব রকম ব্যাপারই কোন না কোন পুলিশি আইন মতে দণ্ডযোগ্য অপরাধ। জাগ্রত জনমতই পারে পুলিশকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে।

আর পারে মৃতপ্রায় সমাজবিবেককে জাগাতে। পাড়ায় পাড়ায় তরুণ প্রজন্মের একাংশও কি সেদিনের উল্টোডাঙার মানুষদের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে জনমত সংগঠিত করতে পারেন না?

পারা দরকার, খুব দরকার। কেন না নারী নির্যাতন প্রায় প্রত্যহের সংবাদ হয়ে উঠেছে। আসুন, আমরা ক্রুদ্ধ হতে শিখি ও শেখাই। অপরাধীদের শাস্তি হয়, সেটা দেখি। আর, যারা নিগ্রহের শিকার, আমাদের আচরণে তাদের যেন মনে না হয় তারা একঘরে হয়ে আছেন। লুম্পেনদের ভয় পেয়ে বাঁচা কি প্রকৃত অর্থে বাঁচা। এ কেমন বাংলা নতুন শতাব্দী? নারীর সম্মান রক্ষায় সমাজ না এগোলে নিগ্রহকারীরা দমিত হবে না। (চতুষ্পর্ণী, বর্তমান, ১৯৯৪)

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নথি অনুযায়ী বেড়ে চলেছে নারী অপরাধীর সংখ্যা

'মাগো কিছু আছে মা' — ভোরবেলা ঘুম ভেঙে বা দুপুরের কাছাকাছি এই ডাক কলকাতার রাস্তায় আজ আর তেমন শোনা যায় না। তবে কি কলকাতার ফুটপাতবাসী দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমে গিয়েছে? কিন্তু পরিসংখ্যান বলে গত ১০ বছরে কলকাতার ফুটপাত, মাঠ-ময়দান আর

বস্তিতে লোকের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের কথাই বিশেষভাবে বলা হল কেননা, এই শ্রেণীর লোকেরাই সমাজে নিম্নবিত্ত বা গরীব বলে পরিচিত। ভারতের বর্তমান বেকার সমস্যার যে পরিস্থিতি তাতে গ্রাম থেকে শহরে এসে প্রায় অশিক্ষিত নারীও কিভাবে জীবিকার সন্ধান করে নিচ্ছেন এটা সত্যিই আশ্চর্য্যের বিষয়। দেখা যায় গ্রাম থেকে আসা ২০ থেকে ৪০ বছরের মহিলারাই দিনের শেষে বাড়ি ফিরে বেশিরভাগ সময়েই নিজেকে সাকার বলে দাবি করেন। প্রতি বছর ৮ মার্চ শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা নয়, মহিলাদের প্রকৃত অসুবিধাগুলি বন্ধ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

বুর্‍্যো অব ইউনিয়নের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নথি অনুযায়ী ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে নারী অপরাধীর সংখ্যা প্রায় ২৫.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অপরাধগুলির মধ্যে দেহব্যবসা থেকে শুরু করে পকেটমারি, ছিনতাই, রাহাজানিতে সাহায্য, এমনকি খুনের ঘটনাতেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ সংখ্যাও কম নয়। দেখা গেছে অনেক স্বামীরা স্ত্রীদের এই সব কাজ জোর করে এগিয়ে দেয়। সংসারের আর্থিক সচ্ছলতা আনতে স্ত্রীদের দিয়ে যে কোনও অপরাধমূলক কাজ করাতে তারা পেছপা হয় না।

নারীদের অপরাধ-প্রবণতা বৃদ্ধির দায় সমাজ অস্বীকার করতে পারে না। একজন নারীকে অপরাধী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ আরম্ভ হয় তার জন্মমুহূর্ত থেকে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়েকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করা হয়, তার মূল্য এই সংসারে খুবই কম। তার জন্ম হয়েছে কোনও পুরুষের ক্রীতদাসী হয়ে থাকার জন্য। ছোট্ট মেয়েটার মনে এই ধরণের কথা ঢুকিয়ে দিতে শুধু পুরুষরাই নয়, মেয়েটির মা-ও মোটেই কম যান না। এরপরই আসে শাশুড়ি গঞ্জনা, আর স্বামীর অত্যাচার। অর্থ রোজগারের অন্য পথ না পেয়ে মেয়েরা বেছে নেয় এই ধরণের অপরাধের পথ। দেখা গেছে নারী অপরাধীদের মধ্যে প্রায় ৯৮ শতাংশের মাসিক আয় ১৮০০ টাকার মধ্যে।

প্রতিহিংসা ও ঘৃণা বাদ দিলে অন্তত ৫০ শতাংশ নারী অপরাধ করে পেটের তাগিদে। তবে সামাজিক দিক থেকে নারীদের শত্রু হিসেবে পুরুষকে চিহ্নিত করা হলেও দেখা গেছে বাস্তবক্ষেত্রে নারীকে অপরাধপ্রবণ করে নারী নিজে। চাকরি দেওয়ার নাম করে গ্রামের মেয়েদের শহরের পতিতালয়ের খোঁজ দেয় তারাই। পাড়ার কোনও এক বিশ্বস্ত দিদির হাত ধরেই এই মেয়েরা একদিন হাজির হয় পকেটমারদের ডেরায়। অন্ধকারের জগতের হাতছানি তাকে ভুলিয়ে দেয় সমস্ত নৈতিকতাবোধ। পুলিশের মতে, যতক্ষণ না প্রতিটি থানায় নারী পুলিশের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে ততদিন মহিলা অপরাধীদের নিরস্ত করা খুবই কঠিন। তাই এরা একদিকে যেমন অত্যন্ত সহজেই সবজির কুঁড়ির নিচে মাদকদ্রব্য, বিদেশী জিনিস নিয়ে সীমান্ত পার করে পাঠিয়ে দেয় বিদেশে। কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গেল নিজেদের বৈভব বাড়াতেই পতিতালয়ের মাসিরা সাধারণ সরল গ্রাম্য মেয়েদের এখানে টেনে আনতে দ্বিধা করে না।

১৯৯৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কলকাতার মোট ৪১২টি পতিতালয়ে মোট ৬, ৬৯৮ জন মহিলার কথা বাদ দিলে শুধুমাত্র ২০ জন ড্রাগ পাচারকারী এবং ২৭ জন মহিলা পকেটমার গ্রেপ্তার হয়েছে। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কাউকেই আটকে রাখা সম্ভব হয়নি।

মহিলা অপরাধীদের চিহ্নিত করে তাদের জেলে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলেই কিন্তু অপরাধ-প্রবণতা কমিয়ে আনা সম্ভব নয়। দরকার সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি। শুধুমাত্র উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ৮ মার্চ দিনটাকে পালন করলে আন্তর্জাতিক নারীদিবসের চিন্তাধারা

র‍্যাগিং-এ মেয়েরাও পিছিয়ে নেই

ছেলেদের সঙ্গে সমানতালে পা ফেলতে গিয়ে, ছেলেদের অন্ধ অনুকরণ করছে, র‍্যাগিং-এর মতো অসুস্থ অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এ সম্বন্ধে মাধুরি দাশগুপ্তের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল ঃ

এবছর খড়াপুর আই আই টি-তে ছেলেদের হোস্টেলে র‍্যাগিং-এর ফলে সন্দীপ সিংহরায়ের শোচনীয় অবস্থা নিয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার আলোচনা, মন্তব্য, বিধানসভায় হইচই সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। র‍্যাগিং শুধু ছেলেদের হস্টেলেই সীমাবদ্ধ নয়, আজকাল মেয়েদের হস্টেলেও যথেষ্ট হচ্ছে। গত ১৯ আগষ্ট কলেজে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর দিনেই বি ই কলেজ, হাওড়ায় মেয়েদের হস্টেলে র‍্যাগিং-এর কথাও দৈনিত পত্রিকায় বেরিয়েছে, তবে তা জনসাধারণের তেমন নজর কাড়েনি। মেয়েদের হস্টেলে ঐদিন রাতে চোদ্দ জন ছেলে ঢুকে পড়ে এবং নতুন ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা হয। অনেকে বলেন ওটা ও ব্যাপার নয়, জিনিসপত্র চুরির অভিপ্রায় ছিল। ঐ চোদ্দ জন ছেলের মধ্যে দশজন ঐ কলেজের ছাত্র, বাকিরা স্থানীয় সমাজবিরোধী। যেহেতু মেয়েদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ ছিল তাই ব্যাপারটা মানসিক র‍্যাগিং।

তাছাড়া শ্লীলতাহানি হলে নিজের সম্মান বাঁচাতে মেয়েরা সহজে মুখ খোলে না; চেপেই থাকে এবং সহ্য করে।

বি ই কলেজে মেয়েদের হোস্টেলে এই র‍্যাগিং বহুদিন থেকে চলে আসছে। ১৯৫৮ সালের কথা। যখন প্রথম ব্যাচ মেয়েরা ওখানে পড়তে ঢুকল, তখন কোন হস্টেল তৈরী হয় নি। প্রফেসরদের বাড়ির এলাকায় একটি বাড়িতে মেয়েদের থাকার জায়গা হল এবং খাবার আসত ছেলেদের হস্টেল থেকে 'বয়' মারফত। ছেলেরা ঐ 'বয়'-কে খাবার সমেত আটকে রাখত। তাদের দাবী মেয়েদের তাদের সঙ্গে খেতে হবে তাদের হস্টেলে। প্রথম ব্যাচের অল্প দু'একটি মেয়ে তারা বাইরে এলেই 'ইভ টিজিং' শুরু হয়ে যেত; তার একটা নমুনা তুলে ধরলাম — 'এই যে এখন আমাদের দিকে তাকানো হচ্ছে না। জানো। আমরা পাস করে চাকরি পাবই; আর তখন তোমাদেরই বাবা আমাদের পায়ে তেল দেবে এমন সুপাত্রের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে। তখন আমরাও দর দেখিয়ে ঘুরিয়ে ছাড়ব। তার চেয়ে এখন থেকে আলাপ করলে ভবিষ্যতের মাটি নরম হবে।" এমন ভবিষ্যৎবাণীতে মেয়েটি তো আরও কুঁকড়ে গেল। এই ধরণের বহু মন্তব্য ও অশ্লীল কু দৃষ্টির র‍্যাগিং এড়াতে মেয়েটি ঐ কলেজ ছেড়ে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হল। এর পরের ঘটনা ঐ কলেজ ক্যাম্পাসে বিদিশা ভট্টাচার্যে আত্মহত্যা ও পুকুর থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার, এর কারণ জানাজানি হয়নি।

তেত্রিশ বছর আগে সামাজিক পটভূমিকায় ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা বরদাস্ত হত না। কলেজে তার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। ছেলেরা ছেলে বন্ধু, মেয়েরা মেয়ে বন্ধু নিয়েই ঘুরত। যদি কোন ছেলে কোন মেয়ের সঙ্গে পরপর কয়েকদিন কথা বলত বা হাসাহাসি করত, সকলেই চোখ টিপত 'ওরা প্রেমে পড়েছে'। কাজেই বন্ধুদের মন্তব্য ও লোকজনের পরিহাস এবং শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয়ে মেয়েরা বেশ গুরুগম্ভীর ভঙ্গিমা নিয়ে কো-এডুকেশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করত। আজ এতদিন পরে সমাজ দ্রুতগতিতে 'নারীমুক্তির' পথে অবাধে এগিয়ে চলেছে,

ছেলেমেয়ের মেলামেশা সহজ হয়ে গেছে। তাই বলে এই নয় যে 'শ্লীলতা' কথাটি উঠে গেছে। ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্বেরও একটা সীমা আছে যেটা ছাড়ালেই শ্লীলতাহানি কথাটি এসে যাচ্ছে। শ্লীলতাহানিতে একটি মেয়ে দুর্বিষহ মানসিক কষ্টের শিকার হয় তাকে মানসিক র‍্যাগিং বলা যায়।

র‍্যাগিং এর মত বর্বর আনন্দ ফুলের মত সুন্দর কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিশোর-কিশোরী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং সে প্রসঙ্গ ঢেউ-এর মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সংক্রামক ব্যাধির রূপ নিচ্ছে। প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয় বা কলেজ যেখানে দূরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানেই নতুন ছাত্র-ছাত্রী ঢুকলেই পুরাতনরা তাদের র‍্যাগিং করে আনন্দ উপভোগের চেষ্টা করছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। তার ওপর যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কো-এডুকেশন বা সহশিক্ষার হয়, সেখানে একটি মেয়েকে দু-তরফা র‍্যাগিং ভোগ করতে হয়। একটি যেখানে সে থাকে অর্থাৎ হস্টেলের মধ্যে সিনিয়ার মেয়েদের কাছ থেকে এবং দ্বিতীয়টি প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গনে সিনিয়র ছাত্রদের কাছ থেকে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের র‍্যাগিংটি অনেক সময়ে কদর্য রূপ নেয়। সিনিয়র ছেলেরা নতুন মেয়েদের ছেড়ে কথা বলে না। কলেজ প্রাঙ্গনে ঐসব দাদাদের নতুন ছাত্রীদের প্রতি শ্যেন দৃষ্টি কোন মেয়েটিকে কীভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কার সঙ্গে কীভাবে আলাপ করবে, কাকে কীভাবে প্যাঁচে ফলেবে সবই পূর্বপরিকল্পিত। সুযোগ পেলেই ডেকে আলাপ জোড়ে, 'কি নাম, কোথা থেকে এসেছ, কি সিনেমা দেখেছ? ...... ইত্যাদি করতে করতে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে, কারো সঙ্গে প্রেম করেছ? কোন বয় ফ্রেন্ড আছে? আমি কি তোমার বন্ধু হতে পারি? প্রেমিক হতে পারি? আর যদি তুমি বাগদত্তা হও, তাহলে ছেড়ে দেব।' রক্ষণশীল ঘরের মেয়েটি বাবা-মা অভিভাবকের অঙ্গনে ঘেরা পরিবেশ থেকে, সদ্য মুক্ত হয়ে এসে এই কথাগুলি শুনে ভালো মনে নিতে পারে না। অস্বস্তিতে ভোগে, লজ্জায় লাল হয়। তাই দেখে আরও রঙ চড়িয়ে দাদাটি বলে 'কলেজ জীবনই তো 'লাইফ এনজয়' করার সময়। এই সময় যদি তোমার বয়ফ্রেন্ড না থাকে পড়াশুনা একঘেঁয়ে লাগবে। তোমাকে কে নোট জোগাড় করে দেবে? কে টিফিন কিনে এনে দেবে? কে তোমার জন্য করবে অন্য ফাইফরমাশ কাজ?' সহ অবস্থানের এই সব প্রয়োজনীয় ফর্মুলার উপদেশ রক্ষণশীল বাড়ির মেয়ে ভাবে 'শ্লীলতাহানি' কেন না বাড়ির থেকে আসার সময়ে বাবা-মা বলে দিয়েছেন ঠিক বিপরীত কথা অর্থাৎ কোন ছেলের সঙ্গে মিশবে না; পাস করে বাড়ি ফিরলেই সম্বন্ধ করে স্বজাতে বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। তবে একথা সত্যি ওই কিশোরী বা যুবক-যুবতীর মধ্যে 'ইয়ার্কি', 'ফাজলামি', 'প্রেম নিবেদন' ইত্যাদি ছাড়া খারাপ কিছু শোনা যায় নি। এগুলোকে 'ইভ টিজিং' বলব না মানসিক র‍্যাগিং।

মেয়েরা তাদের হস্টেলে র‍্যাগিং কেন করে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয় নতুন মেয়েরা মা-বাবা পরিজন পরিবার ছেড়ে তাদের সঙ্গে বাস করতে আসছে। এখানে তাদের বাজিয়ে দেখে নিতেই এই র‍্যাগিং। নতুনদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে একটু পরিহাস করাটাকে কি র‍্যাগিং বলা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ শান্তিনিকেতনে মেয়েদের হস্টেলে কলাভবনের নতুন ছাত্রীদের পুরাতন ছাত্রীরা বলল 'তোমরা আঁকতে এসেছ, এখানে দু'জনে বস, একজন আর একজনের মুখে ওপর রঙ দিয়ে ছবি আঁক। রঙ-তুলির বন্দোবস্ত আগে থেকেই করাই ছিল। আঁকা শেষ হলে দিদিরা জল দিয়ে তাদের মুখ ধুইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার করে দিল। তারপর চলল আলাপ পরিচয়, কে কোথা থেকে এসেছে। এই র‍্যাগিং সুসভ্য পরিহাস।

কিন্তু অন্যান্য মেয়েদের হোস্টেলে যেসব খবর পাওয়া গেছে সেখানে বড়দিদিরা নতুনদের যে র‍্যাগিং করে তা মূলতঃ কর্তৃত্ব করার লোভে অথবা নিজের ক্ষুদ্রস্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্যকে বশ করার জন্য। নতুন মেয়েদের একটু কষ্ট দিলেই তবেই তো তারা বড় দিদিদের ভয় করে বশ্যতা স্বীকার করবে এবং তখন তাকে দিয়ে নানা ফরমাশ খাটানো সহজ হবে। নতুবা গোড়ায় 'সমান অধিকার' দিলে নতুনরা এসে পুরাতন আবাসিকদের মাথায় চড়ে বসে থাকবে। এই মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিকে একটি মেয়েদের হস্টেলে র‍্যাগিং-এর সময় পুরাতন দিদিরা নতুন মেয়েদের কয়েকজনকে ধরে লম্বা করিডরে দাঁড় করাল; শেষে হুকুম হল তুমি ঘরের ওপ্রান্তে চলে যাও এবং নাক ঘষে ঘষে ওখান থেকে এখানে এসে আমার পা ছোঁও।' ঐ করতে তার নাকের ডগা ছড়ে গেল, রক্ত পড়তে লাগল। তখন অবশ্য ডেটল দেওয়া হল। আর একজনকে হুকুম করা হল 'তুমি এক পায়ে দাঁড়িয়ে নাচতে থাক, থামতে পারবে না আমরা না বলা পর্যন্ত।' তৃতীয়জনকে হুকুম হল 'নিচের থেকে এক বড় বালতি জল কানায় কানায় ভর্তি করে তিনতলায় নিয়ে এস; পথে এক ফোঁটা জল পড়লে মার খাবে।' ইত্যাদি বহু হুকুমনামা চলতে থাকে। দিদিদের এই সব জোর দেখে বাছাধনরা মুখটি খুলতে সাহস করবে না। এরপর ওদের দিয়ে নোট টোকানো, ফরমাশ খাটানো সহজ হবে। নতুবা পরীক্ষার সময় ওসব কাজগুলো কাকে দিয়ে করাবে। হস্টেলে ফরমাশ খাটতে 'কাজের মেয়ে' তো পাওয়া যায় না। এ বছর যে নতুন মেয়ে র‍্যাগিং-এর প্যাঁচে পড়ল, পরের বছর সেও নতুন মেয়েকে ঐভাবে র‍্যাগিং করে প্রতিশোধ নিল। এইভাবে র‍্যাগিং পরম্পরা চলতে লাগল। ব্যাপারটা ঠিক 'বউ যখন শাশুড়ি, সবকিছু শোধ নেয়' এর মতো।

র‍্যাগিং-এর কারণ বহুবিধ এবং তার মনস্তত্ত্ব নিয়ে বেশ গবেষণা দরকার। অচেনা পরিবেশ, অনাত্মীয়দেব সঙ্গে বাস করতে প্রায় একই বয়সের কতকগুলি মেয়ের বা ছেলের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এই সব প্রবৃত্তি (Instinct) সক্রিয় হয়ে উঠছে। ছেলেরা দুর্দান্ত বেশি হওয়ার 'প্রতি কথায় ঘুষি' তাদের যৌবনের ধর্ম। তাই ব্যাপারটা গড়িয়ে সন্দীপ সিংহ রায়ের মত অবস্থা হয়। মেয়েরা স্বভাবে কিছুটা নরম হওয়ায় নিজেদের মধ্যে ঘরের পটভূমিকায় মা-মেয়েতে, বোনে বোনে অথবা শাশুড়ি বৌ-এ দ্বন্দ এবং বাইরের পরিবেশে আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হস্টেলে পুরাতন ছাত্রীদের নতুনদের ওপর অত্যাচার মিট্‌মিটে শয়তানি চালে ধিকিধিকি চলে। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারের একটি নমুনা র‍্যাগিং। গোটা সমাজেই র‍্যাগিং-এর শিকার হয়ে মেয়েরা র‍্যাগ করে কোন লজ্জায়?

নারী নিগ্রহের জন্য নারীরাও দায়ী এ-কথাটি বোঝাবার জন্য কয়েকটি ঘটনার কথা বলছি ঃ

দৃশ্য - ১

উস্তি থানার বঁইবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা কলেজ ছাত্রী পাপিয়া সরকারের খুনের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশ তাঁর খুড়তুতো বোনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম মীনাক্ষী সরকার (২১)। ডায়মন্ডহারবার ফকিরচাঁদ কলেজের বি. এ. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী মীনাক্ষীকে রবিবার আদালতে হাজির করা হয়। ডায়মন্ডহারবার মহকুমা আদালতের বিচারক তাকে ১২ দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

এদিকে খুনের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে স্থানীয় এক ব্যবসায়ী যুবককে পুলিশ খুঁজছে।

পুলিশের বক্তব্য, মীনাক্ষী ও ওই যুবক পাপিয়ার খুনের ঘটনায় জড়িত। গত ২১ জানুয়ারি সকালে গ্রামের বুড়িরপুকুরের ধারে পাপিয়ার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা নিয়ে মীনাক্ষীর বাড়ির লোকজনের আপত্তি ছিল। পাপিয়াও এই বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে বোনকে সতর্ক করেছিল। বাড়ির লোকজনকে বিষয়টি জানিয়ে দেবে বলে তাকে ভয়ও দেখিয়েছিল পাপিয়া।

জেরার মুখে মীনাক্ষী পুলিশকে জানিয়েছে, এরপরে ওই যুবকের সঙ্গে শলা পরামর্শ করে বোন পাপিয়াকে 'উচিত শিক্ষা' দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। গত ২০ জানুয়ারী ঠাকুরপুকুরে পাপিয়ার কলেজে যায় সে। কলেজ শেষে বোনের সঙ্গেই বাড়ি ফেরার জন্য বাসে চাপে মীনাক্ষী। ওই বাসেই চড়ে ওই যুবকও। সন্ধ্যায় উস্তিতে নেমে কথা বলার অছিলায় পাপিয়াকে নিয়ে বঁইচবেড়িয়া গ্রামেরই এক নির্জন জায়গায় যায় তারা।

পুলিশ জানিয়েছে, সেখানে পাপিয়াকে তাদের সম্পর্কের বিষয়চি নিয়ে চুপচাপ থাকার জন্য নানাভাবে হুমকি ও ধমক দেওয়া হয়। ওই সময়েই কথাবার্তার মাঝে ওই যুবক ক্ষুর চালিয়ে দেয় পাপিয়ার শরীরে। আহত পাপিয়ার হাত, পা চেপে ধরে মীনাক্ষী। ওই যুবক এবার পাপিয়ার গলায় ক্ষুর চালায়।

'অপারেশন' সেরে মাঠের রাস্তা ধরে বাড়ি ফেরার পথে গ্রামেরই এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে যায় মীনাক্ষীর। সেই ব্যক্তির সূত্র ধরেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। (বর্তমান, ২৮.০১.০৩)

দৃশ্য - ২

স্বামীকে খুন কবে নিজেদের ঘরের মাটি খুঁড়ে পুতে রেখেছিলেন এক গৃহবধূ। পরে ছেলের কাছে এই ঘটনার কথা কবুল করেন। ছেলেই মাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই ঘটনাটি ঘটেছে আগরতলা শহরের পশ্চিম থানা এলাকায়।

পুলিশ জানায়, জয়নগর এলাকার বড়াবড়ি পুকুরের বাসিন্দা কল্পনা দত্ত স্বামী গৌরাঙ্গচন্দ্র দত্তকে (৪৯) খুন করেন। মৃতদেহ যাতে পচন ধরে গন্ধ পা বের হয়, তার জন্য পেট চিরে নাড়িভুড়ি বের করে নেন। নাড়িভুড়ি নদীতে ভাসিয়ে দেন।

এর পরে স্বামীর দেহ টুকরো টুকরো করে পলিথিনের ঝোলায় পুরে ঘরের মেঝের মাটি খুঁড়ে পুঁতে দেন। তার ছেলে সজল দত্ত থাকেন কৈলাশহরে, রাজ্য পুলিশের কর্মী। সজল বাড়িতে এসে বাবার খোঁজ করলে কল্পনা জানান তিনি কাজে অন্যত্র গিয়েছেন। এই কথায় ছেলের কোন সন্দেহ হয় নি। কয়েকদিন পরে কল্পনা ছেলের সঙ্গে কৈলাশহরে চলে যান। মৃত ব্যক্তি ছিলেন রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী। (আনন্দবাজার, ২৮.০৩.০৩)

দৃশ্য - ৩

নারী স্বাধীনতার নামে আজকাল নারীরা অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছেন। এর ফলে সংসার ভাঙছে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধ চলছে। খুনোখুনি হচ্ছে। এ-প্রসঙ্গে একটি চিঠি এবং তার উত্তরের কথা বলি। পড়েছিলাম আনন্দবাজারে। উত্তর দিয়েছিলেন ঋতা ভিমানী (আনন্দবাজার ১২.০৮.০৩)। পড়লাম ১৮ বছরের বৌদি এবং ২১ বছরের দেওরের একই সঙ্গে আত্মহত্যা।

বৌদির বিয়ের এক বছরের মধ্যেই। কয়েকদিন আগে এ-ধরণের আরও একটি ঘটনার কথা পড়েছিলাম।

প্রশ্ন ঃ বেশ অল্প বয়সে আমার বিয়ে হয়। স্বামী বয়সে অনেক বড়। সব সময়ই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এই সময় আমার এক দেওর বেশ বন্ধু হয়ে ওঠে। আমরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি চলে আসি। থিয়েটার, নাটক সব জায়গাতেই এক সঙ্গে যেতাম। এ নিয়ে বাড়ির কোনও বাধা পাইনি। নিজেদের অজান্তেই মন দেওয়া-নেওয়া হয়ে যায়। কিন্তু এই ভাবে তো আর চলবে না। শ্বশুরবাড়ির সকলে পাত্রী দেখার কথা বলছে। আমি মানতে পারছি না আমার দেওরের বিয়ে করার ইচ্ছে নেই, মাঝে মাঝে মধ্যে বলে সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে যেতে। কিন্তু সমাজ তো মানবে না। তা ছাড়া আমি স্বামীকেও ভালবাসি।

মানসী মিত্র

উত্তর ঃ স্বামীকে যখন ভালবাসেন, পালিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ঠান্ডা মাথায় দেওরের জন্য পাত্রী দেখার কাজে নেমে পড়ুন। মন সায় না দিলে অন্য ভাবে ব্যস্ত থাকুন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করুন। ওর সঙ্গে সময় কাটানোর আর দরকার নেই। স্বামীর বদলির চাকরী হলে অন্য কোন শহরে চলে যেতে পারেন কিছুদিনের জন্য। মোটকথা দূরত্ব তৈরি করুন। আশা করবেন না যে প্রত্যেকটা মূহুর্ত ও আপনাকে নিয়ে সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যাবে। ওকেও শ্বশুরবাড়ির আর পাঁচ জনের মতো ভাবুন। তবে হ্যাঁ আমার কথাগুলো মানা শক্ত। ধীরে ধীরে প্রস্তুতি নিন। তাছাড়া দেওরের বিয়ে হওয়া মানেই তো পর হয়ে যাওয়া নয়। দেওর-বউদির বন্ধুত্ব থেকেই যায়। সেটাকে বেশি ঢিলেঢালা না দেখালেই হল। দেওর বিয়ে করলে নতুন বউ আসবে ঠিকই। কিন্তু তাতে বউদির প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে না। বউদি তো বউদিই।

স্ত্রীদের অবৈধ সম্পর্কের জেরে যে কতো হতভাগ্য স্বামীকে অকালে জীবন দিতে হচ্ছে তার কি কোন হিসেব আছে? বালিগঞ্জে কুণাল বসুর নিশংস হত্যা এর প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। মেয়েরা এবং নারীরা ক্ষণিকের আনন্দরসে মজতে, একটু উষ্ণ উত্তজনায় মজতে গিয়ে গোটা পরিবার পর্যন্ত শেষ করে দিচ্ছে। সুদীপ্তা পাল কী পাশবিক মানসিকতাসম্পন্ন! ঠার্কুরমা, ঠাকুরদা, বাবা, মা ভাই সবাইকে শেষ করে দিল প্রৌঢ় গৃহশিক্ষকের প্রেমে হাবুডুবু খেতে গিয়ে। কিশোরী মেয়েরাও এত বিপজ্জনক মারাত্মক ভাবে স্বার্থপর হয়ে উঠতে পারে! বেহালার অক্সিটাউনের ঘটনা বোধহয় এরসঙ্গে তুলনীয়।

দৃশ্য - ৪

বেহালার অক্সিটাউন হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত গৃহশিক্ষক লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী পাল পরিবারকে দেখে নেবেন বলে শাসিয়েছিলেন। মঙ্গলবার এই মামলায় সাক্ষ্য দিতে উঠে নিহত গৃহকর্তা বিদ্যুৎ পালের ভাইঝি পলি ঘোষাল এই অভিযোগ করেন। পলিদেবী বলেন, তার খুড়তুতো বোন সোহিনী লক্ষ্মীনারায়ণবাবুকে চাপ দিচ্ছিল ওকে বিয়ে করার জন্য। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই গৃহশিক্ষক সোহিনীদের দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। সাক্ষী আদালতকে বলেন, তার কাকা বিদ্যুৎ পালের বাড়িতেই তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তীকে প্রথম দেখেন।

'৯৯-এর জুনে বেহালার অক্সিটাউনে বিদ্যুৎ পালের বাড়িতে গৃহকর্তা বিদ্যুৎবাবু, তার স্ত্রী মঞ্জুলিকা এবং দুই মেয়ে সোহিনী ও ত্রিপর্ণার মৃতদেহ পাওয়া যায়। ঘটনায় জড়িত অভিযোগে

পালবাড়ির গৃহশিক্ষক লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ঠিক সময়ে দিতে না পারায় লক্ষ্মীনারায়ণবাবু জামিন পান।

প্রথম দিনের সাক্ষী ছিলেন পাল পরিবারের গৃহকর্তা বিদ্যুৎবাবুর ভাইঝি পলি ওরফে চামেলি ঘোষাল। কাঠগড়ায় দাঁড়ানো দুই অভিযুক্তকে দেখিয়ে সরকারি আইনজীবী স্বপন চক্রবর্ত্তী জানতে চান, 'এদের কাউকে আপনি চেনেন?' অন্যতম অভিযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তীকে আঙুল দেখিয়ে সনাক্ত করে সাক্ষী বলেন, "ওকে আমার কাকা বিদ্যুৎ পালের বাড়িতে তার মেয়ে সোহিনীকে পড়াতে দেখেছি। উনি সোহিনীর গৃহশিক্ষক ছিলেন।"

সরকারি আইনজীবীর প্রশ্নের জবাবে সাক্ষী আদালতকে জানানা, "১৯৯৯ সালের ১৪ জুন সকালে আমার শ্বশুরবাড়িতে আমার ছোট বোন শ্যামলী তিন জনকে নিয়ে আসে। ওরা অক্সিটাউন থেকে এসেছেন বলে আমাকে জানান। ওদের কাছেই জানতে পারি, কাকার বাড়ি তালাবন্ধ। ভিরত থেকে পচা গন্ধ বার হচ্ছে। শুনে আমি আর শ্যামলী অক্সিটাউনে ছুটে যাই। কিছু পরে পুলিশ আসে। কাকার বাড়ির দরজার তালা ভাঙে। আমরা ভিতরে ঢুকি। বারান্দার গ্রিলের দরজাতেও তালা দেওয়া ছিল। গেটের সামনে ১১ জুন আর ১২ জুনের দু'টি ইংরাজী দৈনিক এবং ১২ জুনের একটা বাংলা সংবাদপত্র পড়ে ছিল। পুলিশ সেগুলো তুলে নেয়।"

তার পর কী হল? সাক্ষী বলেন, "গ্রিলের দরজার লালা ভেঙে পুলিশ ড্রয়িং রুমে ঢোকে। ঘরটা ছিল অন্ধকার। পুলিশ অফিসার টর্চ জ্বালান। আমাকে ও শ্যামলীকে ভিতরে ডেকে নেন। আমরা দেখি কাকার মৃতদেহ। গলা কাটা, হাত দু'টো সামনে নিয়ে বাঁধা। এই অবস্থায় উনি সোফার উপরে বসা অবস্থায় ছিলেন। চোখে চশমাটাও ছিল। গলায় একটা দড়ির ফাঁস লাগানো ছিল।" সাক্ষী বলেন "এর পরে খাবার ঘুরে ঢুকে কাকিমা মঞ্জুলিকা পালের মৃতদেহ দেখতে পাই। তারও গলায় কাটা জখম, সামনে হাত দু'টো বাঁধা। ওই অবস্থায় খাবার টেবিলের পাশে পড়ে ছিলেন। এর পরে আমরা ঢুকি শোবার ঘরে। সেখানে দেখি কাকার দুই মেয়ের মৃতদেহ। ওদেরও গলায় কাটা দাগ। দু'জনেরই হাত সামনে বাঁধা। দু'জনেরই মুখে কাপড় গোঁজা। ওই অবস্থায় ওরা খাটের উপর পড়ে ছিল।"

সাক্ষী পলিদেবী জানান, এই ঘটনার দু'সপ্তাহ আগে তিনি কাকার বাড়িতে গিয়েছিলেন। তিনি এ-ও বলেন — সে দিন তার কাকার ছোট মেয়ে ত্রিপর্ণা একা বাড়িতে ছিল। তার মুখ ছিল ভার। কারণ জানতে চাইলে ত্রিপর্ণা তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে কী বলেছিল ত্রিপর্ণা? সাক্ষী বলেন, "ত্রিপর্ণা আমায় কাঁদতে কাঁদতে বলল, ওর দিদি সোহিনীর জীবন নষ্ট করে দিয়েছে গৃহশিক্ষক। সোহিনীকে গর্ভপাত করাতে তারা বাধ্য হয়েছে। সোহিনীর বিয়ের প্রস্তাব লক্ষ্মীনারায়ণ ফিরিয়ে দেন। উল্টে শাসিয়ে বলেন, বাড়াবাড়ি করলে ভাল হবে না।"

দৃশ্য - ৫

গোটা গ্রাম শোকস্তব্ধ। বিকট শব্দে মাইক বাজানোর প্রতিবাদ করায় যুবকদের প্রহারে মন্মথ সর্দারের মৃত্যুতে গ্রামের মানুষের মন ভাল নেই। তাঁরা যেমন আফসোস করছেন, তেমনই ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। তাঁদের অভিযোগ, বিকট শব্দে মাইক বাজানোর প্রতিবাদ করায় প্রথমে মন্মথবাবুকে অল্প মারধর করা হয়েছিল। পরে আবার প্রতিবাদ করায় তুলে নিয়ে গিয়ে বেদম পেটানো হয়। পুলিশ সুপার বি এন রমেশ অবশ্য বলেন, মাইক নয়, মন্মথবাবু প্রতিবাদ জানান

তার দুই পুত্রবধূর সঙ্গে গ্রামের কিছু যুবকের অবৈধ সম্পক স্থাপনের বিরুদ্ধে। মন্মথবাবু খুনের পরে তাঁর দুই পুত্রবধূ সুষমা ও কাকলিকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। তাদের ভাসুর কৃষ্ণ সর্দারের অভিযোগেই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। দুই বধূর গ্রেফতারে গ্রামবাসীরা ও বৃদ্ধের আত্মীয়েরা বিস্মিত। বুড়ো শিবমন্দিরের পুরোহিত প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিকট শব্দে মাইক বাজানোর ব্যাপারে বহুবার থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু পুলিশ উদাসীন। তাই এত বড় ঘটনার পরে ব্যর্থতা ঢাকতেই পুলিশ দুই বধূকে গ্রেফতার করেছে।"

গ্রামবাসীরা জানান, একদল যুবক সামান্য পূজোপার্বণ উপলক্ষে বিকট শব্দে মাইক বাজিয়ে অশ্লীল নাচগান চালায়। কিছু বলতে গেলেই অপমানিত, লাঞ্ছিত হতে হয়। গৃহবধূ পারুল বৈরাগ্য বলেন, "আমার বড় ছেলে বি এ পরীক্ষা দেবে। মাইকের শব্দে লেখাপড়া করতে না পেরে অন্যত্র চলে গিয়েছে। আমার স্বামী এই ব্যাপারে বলতে গিয়ে ওই যুবকদের হাতে নিগৃহীত হন।" গ্রামবাসী ধনঞ্জয় সাহা বলেন, "ওই ছেলেরা জোর করে মোটা টাকা চাঁদা তুলত। সেই টাকায় চলত নাচগান, মেয়েদের উদ্দেশ্যে টিটকিরি।"

পুলিশ মন্মথবাবুর দুই পুত্রবধূকে গ্রেফতার করল কেন? মন্মথবাবুর স্ত্রী আমোদিনীদেবী বলেন, "বাড়িতে কখনও দুই বউয়ের খারাপ আচরণ দেখিনি। তবে ওরা শনিমন্দিরে আড্ডা দিত, একদল যুবকের সঙ্গে কথা বলত। উনি রেগে যেতেন। বৌদের সঙ্গে খিটিমিটি লাগত।" দুই বধূর ভাসুর কৃষ্ণ সর্দারের স্ত্রী সন্ধ্যাদেবী বলেন, "ওরা যদি খারাপ কিছু করত, তাহলে সকলের আগে আমি টের পেতাম।" মন্মথবাবুর ছোট মেয়ে আদরের বিয়ে হয়েছে একই গ্রামে। তিনিও বৌদিদের নামে কখনও কোনও 'খারাপ কথা' শোনেননি। বড় মেয়ে খুদু রায় বলেন, "পুলিশ বলছে, খুনের ষড়যন্ত্রে সুষমা ও কাকলি জড়িত। কিন্তু সে-রাতে ওরাই এসে খবর দেয়, বাবাকে পাঁচটি ছেলে তুলে নিয়ে গিয়েছে।"

আমোদিনীদেবী বলেন, "রাতে প্রচন্ড শব্দে মাইক বাজছিল। রবিবার শনিমন্দির থেকে এক যুবক আমাদের বাড়িতে এসে জল চায়। আমার স্বামী রেগে যান। উনি মন্দিরে গিয়ে চিৎকার শুরু করেন। ওরা ওকে মারধর করে। ফিরে এসে উঠোনেই শুয়ে ছিলেন। ঘরে আসতে বলায় রাগ করে মন্দিরে চলে যান।" গ্রামবাসী পীযুষকান্তি দাস বলেন, "মাইক বাজানোটা ওই বৃদ্ধকে মারধরের চক্রান্ত। কারণ, আগেও ওই যুবকদের নানা কুকর্মের প্রতিবাদ করেছিলেন মন্মথবাবু।" পুলিশ সুপার বলেন, "সবিস্তার রিপোর্ট চেয়েছি, এই ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতেও বলেছি। দোষীদের ছাড়া হবে না।" (আনন্দবাজার, ১৫.০১.০৩)

দৃশ্য - ৬

রামকৃষ্ণপল্লীর বাসিন্দা গৃহবধূ সুভদ্রা মণ্ডল মেয়ের পড়াশোনা নিয়ে এতটাই উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। মেয়ের লেখাপড়ার দিকে নজর দিতে পারবেন না, এই ভেবে সাত মাস আগে ছেলে হওয়ায় তিনি রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করেন। শুক্রবার সুভদ্রা দেবীর দাদা অশোক সরকার এ কথা জানান।

বোন ও ভাগ্নেভাগ্নীর এহেন মৃত্যুতে দিশেহারা অশোকবাবু বলেন, "বহু বার বোঝানো সত্ত্বেও মেয়ের লেখাপড়া নিয়ে ভীতি কাটিয়ে উঠতে পারেননি সুভদ্রা।" সেই লেখাপড়া নিয়েই উত্তেজনার বশে বৃহস্পতিবার সকালে ১১ বছরের মেয়ে অনন্যাকে গলায় ওড়নার ফাঁস জড়িয়ে

খুন করে ফেলেন সুভদ্রা দেবী। একই সঙ্গে মৃত্যু হয় সাত মাসের ছেলে বিট্টুর। পুলিশের অনুমান, মেয়ের দিকে তেড়ে যাওয়ার সময় ক্ষিপ্ত সুভদ্রা দেবী নিজের গায়ের কাঁথা ঝটকা মেরে সরিয়ে দেন। বিট্টু তখন বিছানায় ঘুমিয়ে ছিল। মায়ের কাঁথা এসে পড়ে ওই শিশুর মুখে। সেই কাঁথা চাপা পড়েই বিট্টুর মৃত্যু হয়।

ছেলেমেয়ের মৃত্যুর অনুতাপে দগ্ধ সুভদ্রা দেবী এর পরে আত্মঘাতী হন। পুলিশ জানায় ওই ঘর থেকে একটি 'সুইসাইড নোট' পাওয়া যায়। তাতেই ওই গৃহবধূর ছেলেমেয়ের মৃত্যুর কারণ নির্দিষ্ট ভাবে লিখে গিয়েছেন। পুলিশ সুপার বি এন রমেশ জানান, "ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে এক জন ডি এস পি-কে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুভদ্রা দেবীর স্বামী শিবপ্রসাদ মণ্ডলকে জেরা করা হয়েছে। তাকে শহর ছাড়তেও নিষেধ করা হয়েছে।" সুভদ্রাদেবীর চিকিৎসক ও বাড়ির কাজের লোককেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে পুলিশ সুপার জানান। তবে, সুভদ্রা দেবীর বাপের বাড়ির লোকজন শিবপ্রসাদবাবুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের করেননি। মৃত গৃহবধূর দাদা অশোকবাবু বলেন, "আমরা বোন-ভগ্নিপতির মধ্যে কোনও অশান্তি ছিল বলে জানি না।"

পুলিশ জানায়, মেয়ের গলায় ওড়না জড়িয়ে যখন হ্যাঁচকা টান মারেন সুভদ্রা দেবী তখন অনন্যা ছবি আঁকছিল। দমবন্ধ হয়ে সেখানেই মৃত্যু হয় তার। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে তদন্তকারী পুলিশের অনুমান, মেয়েকে নেতিয়ে পড়তে দেখে সুভদ্র দেবী সেই মুহূর্তে চেষ্টা করেন অনন্যাকে বাঁচাতে। কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গিয়েছে। মেয়ের মৃত্যুতে হতবাক সুভদ্রা দেবী এর পর নিজের ঘরে ছুটে আসেন। কিন্তু তখনও তিনি জানতেন না সেখানেও আর এক সন্তান মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পুলিশের অনুমান, কয়েক মিনিটের তফাতে ছেলেমেয়ের মৃত্যুতে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পান সুভদ্রা দেবী।

পুলিশ জানায়, গোটা ঘটনাটি ঘটে সকাল ১১টা থেকে সাড়ে ১১টার মধ্যে। সেই সময়ে শিবপ্রসাদবাবু বাড়িতে ছিলেন না। তিনি মশাগ্রামের সাচড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। স্কুলের কাজে ওই দিন তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন। সুভদ্রা দেবীর দাদা বলেন, "বেলা ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে আমাদের আরামবাগের বাড়িতে বোন টেলিফোন করেছিল। তখন ও কিছু বলেনি। তবে গলাটা ধরা ধরা ছিল। বলেছিল শরীরটা খারাপ।" এর পর দাদার সঙ্গে আরও দু-একটা কথা বলে টেলিফোন ছেড়ে দিয়েছিলেন সুভদ্রা দেবী।

দৃশ্য - ৭

মুর্শিদাবাদে ধৃত আই এস আই চক্রের 'মক্ষীরাণী' ছিল ইসমাত আরা বিশ্বাস ওরফে এলি। তারা জানান, সুন্দরী এই মহিলা তার সৌন্দর্য ও প্রখর বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অফিসারের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলত। এই মহিলা অত্যন্ত কঠোর ও চাপা স্বভাবের। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে টানা জেরা করেও সহজে সে মুখ খুলছে না। অথচ এই মহিলাই এই চক্রের একজন সক্রিয় সদস্য ছিল। পুলিশ ও গোয়েন্দারা এ খবর জানিয়েছেন।

এই মহিলা সম্পর্কে জলঙ্গীর দুর্লভের পাড়ার বাসিন্দারাও জানান, অত্যন্ত স্মার্ট। এর ঠাটবাটের বহর ছিল খুব। বাইরের বিভিন্ন লোকের সঙ্গে তার ওঠাবসা ছিল। খুব অল্প বয়সেই তার সঙ্গে জিয়াউদ্দিনের ঘর ছেড়ে জলঙ্গীর সরকারপাড়ার একটি ছেলের সঙ্গেও সে থাকত।

জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে আবার ঘর বাঁধার পর তারা বহরমপুরে গোরাবাজারে এক বাড়িতে

ভাড়া ছিল। বহরমপুরে তারা এক সময়ের প্রতিবেশীরা জানান, এই মহিলা ছিল খুব চাপা স্বভাবের। খুব বেশি কথা বলত না। তবে বাইরের লোক প্রচুর আসত তাদের বাড়িতে। বেশ কয়েক বার এই জেলার দুই তিন জন পুলিশ অফিসার ও জওয়ানদের এই বাড়িতে আসতে দেখেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, এই মহিলা একবার অভিনেত্রী হওয়ার পথেও পা বাড়িয়েছিল। কলকাতার নামী এক নায়কের সঙ্গে দুইবার সে দেখা করে। এই মহিলা প্রচন্ড উচ্চাকাঙ্খী। জলঙ্গী এলাকার এক অল্প বয়সী পীরের ওপরও এর 'নজর' পড়ে। সেই পীরকে নিয়ে সামান্য গোলমালও হয় তাদের গ্রুপের মধ্যে। স্মাগলিং বা চরবৃত্তির কাজে এই ধরণের মহিলাদের একটা বাড়তি সুবিধা থাকে। জিয়াউদ্দিন তার স্ত্রীকে ভালভাবেই সে কাজে লাগাত। বি এস এফের এক অফিসারের সঙ্গে এই মহিলার ভাল সম্পর্ক ছিল। সেই অফিসার এখন আর এই জেলায় থাকেন না। পুলিশ জানিয়েছে, জিয়াউদ্দিনের অবর্তমানে সে দক্ষতার সঙ্গে সব কাজ পরিচালনা করত। তাদের কোড ল্যাঙ্গুয়েজও সে রপ্ত করে নিয়েছিল। এরা কোনও তথ্য হাতে পেলে আই এস আই এজেন্ট বাংলাদেশের আমিরকে জানাত। বিভিন্ন অফিসারের ফোন নম্বর ও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ এই মহিলাই করত। (বর্তমান, ২১.১১.০২)

দৃশ্য - ৮

পাত্র মন্ত্রীর ছেলে এবং বড় ব্যবসায়ী এই পরিচয় দিয়ে মিথ্যা গল্প ফেঁদে এক যুবতীকে তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার অভিযোগে কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম শালিনী জৈন। পুলিশ জানায়, পিকিং সিং নেগি নামে যে যুবকের সঙ্গে ওই যুবতীর বিয়ে হয় তার খোঁজে তল্লাশি চলছে। আদালত ধৃতকে পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়।

দৃশ্য - ৯

গাড়ি ছিনতাইয়ের অভিযোগে বর্ধমান, হাওড়া থেকে দুই মহিলা সহ আট জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার সকালে হুগলি জেলার শ্রীরামপুর থানার পুলিশ বর্ধমানে এসে ছিনতাই হওয়া গাড়ি নিয়ে গিয়েছে। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার নিরুপম সোম জানিয়েছেন ধৃত আটজনের বাড়ি বিহারে। পুলিশ জানায়, ৬ মার্চ সকালে হাওড়ার গোলাবাড়ি থেকে দুই ব্যক্তি একটি গাড়ি ভাড়া করে তার চালক দেবেন্দ্র দুবেকে জানায় তারা দক্ষিণেশ্বর ও তারকেশ্বরে পুজো দিতে যাবে। দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার সময় রাস্তা থেকে এক জন মহিলাকে ওই দু'জন গাড়িতে তোলে। দক্ষিণেশ্বর থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার রাস্তায় বৈদ্যবাটির চাঁপসাড়া গ্রামের কাছে দেবেন্দ্রের গলায় ক্ষুর চালিয়ে তাকে গাড়ি থেকে ফেলে দিয়ে গাড়ি নিয়ে তিন জনে চম্পট দেয়।

পর দিন বর্ধমানে লোকো আমবাগান এলাকায় গাড়ি পড়ে থাকতে দেখা যায়। দুষ্কৃতীরা গাড়ি সেখানে রেখে আশেপাশে লুকিয়ে ছিল। পুলিশ ওই গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে। ইতিমধ্যে আহত চালকশ্রীরামপুর থানায় গিয়ে গাড়ি ছিনতাইয়ের অভিযোগ করেন। তার কাছে দুষ্কৃতীদলের বিবরণ শুনে পুলিশ বর্ধমানে খবর পাঠায়। (আনন্দবাজার, ১২.০৩.০৩)

দৃশ্য - ১০

গ্রাম্য কুসংস্কারের বলি হল এক চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। সিদ্ধিলাভের জন্য এক স্বঘোষিত

মহিলা তান্ত্রিক অনিমা হালদার নামে ওই ছোট্ট মেয়েটিকে পুকুরের জলে ডুবিয়ে মেরেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের দহরপুর গ্রামে। মঙ্গলবার এই ঘটনায় গোটা দহরপুর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ লিপিকা মাঝি নামে ওই মহিলা তান্ত্রিককে গ্রেফতার করেছে।

একুশ শতকেও মানুষের মন থেকে যে কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস ইত্যাদি দূর হয় নি তা আরও একবার প্রমাণিত হল। আবারও বলি হল এক বালিকা। লিপিকার বাড়ি দহরপুরে। ওই মহিলা দীর্ঘদিন ধরেই নিজেকে তন্ত্রসাধিকা বলে পরিচয় দিতেন। প্রতিদিন দুবেলা ঘটা করে পূজো অর্চনাও করতেন তিনি। কপালে সিঁদুরের টকটকে লাল টিপ পরে থাকতেন। স্বল্প শিক্ষিতা গ্রাম্য এই মাঝবয়সী মহিলার কিছু স্তাবকও ছিল। তারা মাঝে মাঝেই এই 'গুরুমা'-র কৃপাধন্য হওয়ার জন্য ফলমূল, মোটা প্রণামী নিয়ে আসতেন। ওসব নির্বিকার চিত্তে গ্রহণও করতেন লিপিকা। এভাবেই তার নিত্যপূজা, যাগযজ্ঞাদি চলছিল দিনের পর দিন। প্রতি শনি, মঙ্গলবার ভক্তদের 'বাণী'ও দিতেন তিনি। ভক্তদের ভবসাগরে ভেসে যাওয়ার উদাত্ত আহ্বানও থাকত সেই বাণীতে।

পাড়া প্রতিবেশীরাও লিপিকার দাপটে সিটিয়ে থাকতেন ভয়ে। সরলপ্রাণ গ্রাম্য মানুষগুলির ভয়, পাছে তন্ত্রমন্ত্র, ঝাঁড়ফুক করে কারও কোন ক্ষতি করে দেন তিনি। পাড়া প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, তাদের ওপর রীতিমতো অত্যাচার চালাতেন ওই মহিলা। তাবিজ, কবজ, বশীকরণ মন্ত্র দেওয়ার নাম করে মোটা টাকা আদায়ও করতেন তিনি।

ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার সকালে। লিপিকার পাড়াতেই থাকত অনিমা হালদার নামে বছর বারোর মেয়েটি। শান্ত ভীরু স্বভাবের অনিমা গ্রামেরই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত। লিপিকা অনেকদিন ধরেই অনিমার ওপর 'নজর' দিয়েছিলেন। কিন্তু সে কথা কেউ জানতে পারেননি। এমনকি অনিমার বাব-মাও না। তাই মঙ্গলবার সকালে যখন লিপিকা অনিমাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান তখনও কেউ কিছু সন্দেহ করেনি। কিন্তু খানিক পরে যখন অনিমাকে খুঁজতে থাকেন তার মা-বাবা, তখন সবাই চেপে ধরেন লিপিকাকে। প্রথমে এ বিষয়ে তিনি না জানার ভান করেন। পরে লোকজনের চাপে তিনি সব কথা স্বীকার করেন। এরপর পাশের একটি পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয় অনিমার মৃতদেহ। পরে পুলিশের কাছে লিপিকা স্বীকার করেন, সিদ্ধিলাভের জন্যই তিনি এ-কাজ করেছেন। (প্রতিদিন ২২.০১.০৩)

দৃশ্য - ১১

কলকাতায় এমন কিছু কিছু স্কুল আছে (বেশির ভাগই অবাঙ্গালী) যেখানে মডেলিং-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, বাছা বাছা মডেল তৈরী করে প্রতিযোগিতায় পাঠানো হয়। সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছে আমার এক ভাইঝি। ও ধরণের স্কুল বা কলেজ থেকে মডেল তৈরী করে প্রতিযোগিতায় পাঠানো হয় বলে তার অনুযোগ শুনেছিলাম এক দিন। ছাপোষা বাঙালী ঘরের মেয়েরাও আজকাল মডেলিং-এর নেশায় আচ্ছন্ন। এদের অনেকেই আবার সুস্মিতা সেন বা বিপাশা বসু হতে চায়। এ-সুযোগে স্বার্থান্বেষী পুরুষরা মেয়েদের সেক্স-সিম্বল দেহগুলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলে সহজলভ্য ভোগ্যপণ্যর মতো, যথেচ্ছ ব্যবহার করে চলচ্চিত্রে, ব্যবসায়ী জগতে। নারী আগ্রহী হয়ে, অত্যুৎসাহিতায় ঝাঁপ দেয় নারী নির্যাতন যজ্ঞে। ফিল্ম সমালোচক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষাতেই বলি ঃ

এত শরীর। রাখব কোথায়? এ তো দেখছি, আদেখলার ঘটি হল, জল খেতে খেতে প্রাণ গেল। বিপাশা বসু আর জন আব্রাহামের মতো একজোড়া হিট-হট শরীর যখন পেয়েছি, তা সর্বক্ষণ না দেখিয়ে থাকি কি করে, এই হল 'ত্রয়ী'-র বক্তব্য। 'ত্রয়ী' বলতে গল্পের লেখক মহেশ ভাট, প্রযোজক পূজা ভাট, পরিচালক অমিত সাক্সেনা।

বিপাশা সম্পর্কে 'জিসম্' এর দুটি পুরুষ চরিত্রের বক্তব্য ঃ এ জিনিস সারা দেশে আর একটিও নেই। বিপাশা সত্যিই শরীরের এক দুর্লভ প্রদর্শনী। প্রসারিত প্রদর্শনশালাও বলা যায়। 'জিসম্'-এর আক্ষরিক অর্থ যে শরীর-শরীর-শরীর, সারাক্ষণ সেই মন্ত্র জপ করে চলেছে ছবিটি। এ-ছবি শরীরের জপমালা। একটা গল্প অবিশ্যি আছে। সে-কাহিনী এই জপমালার অদৃশ্য সুতো।

এতদিনে একটা ঠিক ঠিক ইউনিসেক্স ছবি বটে তৈরি হল এ দেশে। বেশিরভাগ তথাকথিত প্রাপ্তবয়স্ক ছবিই তো পুরুষদের জন্য বলে মনে হয়। কারণ, এসব ছবিতে পুরুষেরা সব যত বেশি জামাকাপড় পরে থাকে, মেয়েরা ঠিক ততটাই কম। 'জিসম্'-এর যৌন বাটনা ফিফটি-ফিফটি ভাগ করে দিয়েছেন পরিচালক। একদিকে জন আব্রাহাম, অন্যদিকে বিপাশা বসু, যেন শহরের টারজেন জেন। শহর বলতে পণ্ডিচেরি। সমস্ত পন্ডিচেরিকেই ছবিতে নিয়ে আসাটা মাস্টারস্ট্রোক। পণ্ডিচেবি বলতে একটা পূণ্য-পূণ্য ভাব হৃদি উজ্জ্বল করে ভেসে ওঠে তো। এ ছবির একটা বড় গুণ বিপাশা আর জনের পুণ্যির শরীর। অফুরন্ত প্রদর্শন। কোনও পাপবোধ নেই, কিন্তু কিন্তু নেই। এবং শরীর ঢাকার অহেতুক খরচ নেই, অন্তত আপাতভাবে।

তবে বিপাশার প্রতিটি পোশাকে এমনভাবে, এতটাই সেক্সক্লুসিভলি কাটা-ছাঁটা, এমনই কৌশলে বিন্যস্ত, যে এ সব পোশাকি নিরাবরণ যে কোনও দর্জির কাম্য নয়। প্রতিটি পোশাকের সীমান্ত সেলাই বিপজ্জনক পাহাড়ি পথের রাস্তার মতো। সব উঁচু-নিচু পেরিয়ে, উপত্যকা আর খাদের পাশ দিয়ে, কি সাবলীল এবং নির্ভর সব ইশারা। বেশিরভাগ পোশাকেই কোনও বোতাম নেই। কিংবা থাকলেও, আছে আমাদের কানের সেই পেশির মতো, যা আমরা নাড়াতে ভুলে গেছি অনভ্যাসের ফলে।

অধিকাংশ পোশাকের খোলা-পরা শুধু কয়েকটি অপলকা ফিতে নির্ভব। আর বিপাশা একেবারেই পছন্দ করেন না ফিতের আটসাঁট ব্যবহার।

বিপাশা বিবাহিত মেয়ে। জন এখনও কুমার। ওঁদের শরীর যেন কামনার 'জাকুসি'। জনের ডাকে বিপাশা প্রায় এক কথায় রাজি। পরিচালক কাজে লাগিয়েছেন বিপাশার অন্তহীন পা, উৎসাহী উরু, উর্বর উপত্যকার মতো পিঠ এবং নাভির গূঢ়ার্থ। চট করে বাঙালি মেয়ের শরীর এমন মন্দ্রিত উচ্চস্বরে কথা বলে না। বিপাশা অবশ্যই অনন্যা। একটি অত্যন্ত শীলিত শিল্পিত প্রেম দৃশ্যের কথাই ধরা যাক। বিপাশার চোখ বেঁধে দিলেন জন। চিৎ হয়ে শুয়ে মুক্তনাভি বিপাশা। চূড়ান্ত ইঙ্গিত পর্যন্ত বোতামছুট তার জামা। জনের হাতে বরফ ভর্তি হুইস্কি গ্লাস। বরফের ছ্যাঁকা দিচ্ছেন জন বিপাশার শরীরে, ফোঁটা ফোঁটা বরফ জল ফেলছেন তার নাভিতে। শিউরে শিউরে উঠছেন বিপাশা।

শিউরে উঠি আমরাও ছবির শেষের দিকে। শরীরের ছ্যাঁকায় নয়। কাটাকাটি ছেঁড়াছেঁড়ির রক্ত দেখে। 'জিসম্' শরীরের গল্প নয়। আসলে শরীরের ধ্বংসের গল্প। সব্বাই মরছেন — বিপাশার বর, বিপাশা নিজে এবং জন। রক্ত দেখাতে টোম্যাটো সসের স্রোত বয়ে গেছে। ছবির শেষ দৃশ্য ঃ জনের শরীর ক্ষতবিক্ষত। টোম্যাটো সস গড়িয়ে পড়ছে শরীরের সব ছেঁদা দিয়ে। জন

একটি সিগারেট ধরালেন। সেটিও টোম্যাটো সসে নেতিয়ে পড়েছে। তাকালেন শেষ বারের মতো পণ্ডিচেরির সমুদ্রে সূর্যোদয়ের দিকে। টুকটুকে লাল সূর্য। যেন গা চুঁইয়ে পড়বে এখুনি কোনও কসমিক টোম্যাটো সস।

দৃশ্য - ১২

সতীনের সঙ্গে ঝামেলার প্রতিশোধ নিতে বাপের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের স্বামীকে খুন করার অভিযোগ উঠল এক মহিলার বিরুদ্ধে। ওই মহিলা এবং তার বাপের বাড়ির লোকজন ফেরার। পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ডহারবার এলাকার লক্ষ্মীপুর গ্রামে।

ওই মহিলার স্বামীর নাম সাহাজুল পাইক (৩০)। তাকে শ্বাসরোধ করে মারা হয় বলে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে মনে করছে। সকালে সাহাজুলের মৃতদেহ পুলিশ তার শ্বশুর বাড়ির দরজা ভেঙে উদ্ধার করে। পুলিশের অনুমান শুক্রবার গভীর রাতে সাহাজুলের গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করা হয়। শরীরের আর কোথাও আঘাতের চিহ্ন ছিল না।

ডায়মন্ডহারবার ষাট মিনসা গ্রামে বাড়ি সাহাজুলের। পেশায় রঙের মিস্ত্রি। দু'দুটি বিয়ে করেছিল সে। প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে নিজের বাড়িতে থাকত সাহাজুল। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী থাকত পাশের গ্রাম লক্ষ্মীপুরে তার বাপের বাড়িতে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে পার্ক সার্কাসের একটি বাড়িতে রঙের কাজ করতে যায় সাহাজুল। রাত হয়ে যাওয়ায় শ্বশুরবাড়িতে থেকে যায়। দ্বিতীয় পক্ষের একটি ছেলেও সঙ্গে ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, প্রথম পক্ষের স্ত্রী এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মধ্যে প্রায়শই গণ্ডগোল লেগে থাকত। তারই জেরে এই খুনের ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে।

গ্রামের লোকজন সাহাজুলের শ্বশুরবাড়ির দরজা বাইরে থেকে বন্ধ দেখতে পায়। তারাই পুলিষে খবর দেন। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঢোকে। সাহাজুলের মৃতদেহ খাটের নিচ থেকে পুলিশ উদ্ধার করে। বাড়িটিতে আর কেউ ছিল না। সাহাজুলের স্ত্রী ও ছেলে সহ সকলেই পলাতক।

দৃশ্য - ১৩

ছেলের শিক্ষকের সঙ্গে একরাত গাদিয়াড়ার হোটেলে থাকার কথা জানাজানি হওয়াতেই সম্ভবত মুর্শিদা তার স্বামী ইলিয়াসকে খুন করিয়েছে বলে পুলিশের অনুমান। উলুবেড়িয়ার শ্যামপুরের চাঁদপুরে শনিবার রাতে নিজের ঘরেতেই রহস্যজনকভাবে খুন হন ইলিয়াস হোসেন (৪০)। নিহত ইলিয়াসের স্ত্রী মুর্শিদা অসংলগ্ন কথা বলায়, তাকে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর পাশাপাশি পুলিশ ওই রহস্যজনক খুনের ঘটনার তদন্তে নেমেছে। হাওড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) লক্ষ্মীনারায়ণ মীনা জানান, মুর্শিদা তার স্বামীর খুনের ঘটনা সম্পর্কে নানা রকম গল্প ফাঁদলেও, আসলে এই খুনের ঘটনার সঙ্গে মুর্শিদা যে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তার বেশ কিছু প্রমাণ আমরা হাতে পেয়েছি।

শ্যামপুরের চাঁদপুর গ্রামে দর্জির কাজ করতো ইলিয়াস হোসেন। ইলিয়াসের ছেলেকে বেশ কয়েকমাস ধরে বাড়িতে পড়াতে আসতেন আলতাবুর নামে এক যুবক। আলতাবুরের বাড়ি চাঁদপুরেই বলে পুলিশ জানিয়েছে। ছেলেকে পড়ানোর সময় সুদর্শন আলতাবুরের প্রতি আকৃষ্ট

হয় মুর্শিদা। দুজনের মেলা মেশা শুরু হয়। গ্রামের মানুষের মধ্যেও এ ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যায়।

পুলিশের কথায় ৮ মাস আগে গ্রামের লোকেরা মুর্শিদাকে এ ব্যাপারে সাবধানও করে দেয়। ওই যুবক এবং মুর্শিদাকে ডেকে গ্রামের লোকেরা সাবধান করে, তারা যেন মেলামেশা না করে। কিন্তু বলে দেওয়ার পরও শোনেনি মুর্শিদা ও আলতাবুর। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ছেলের শিক্ষকের ঘনিষ্ঠতার কথা ইলিয়াসও জানতে পারে। শুরু হয় সংসারে অশান্তি। স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্য শুরু হয় মুর্শিদার। এরপর শনিবার ইলিয়াস খুন হয়। এই খুনের ঘটনার কথা পুলিশকে জানাতে গিয়ে নানা রকম গল্প ফেঁদেছে মুর্শিদা, পুলিশের বক্তব্য। একদিকে আলতাবুর পলাতক, অন্যদিকে মুর্শিদার অসংলগ্ন কথাবার্তা। কিন্তু পুলিশ দুজনের অবৈধ সম্পর্কের চাক্ষুষ কোন প্রমাণ পাচ্ছিল না।

কিন্তু ও দিন রাতে পুলিশ গোপন সোর্স মারফৎ জানতে পারে, খুনের ঘটনার চারদিন আগে গাদিয়াড়ার একটি হোটেলে রাত কাটিয়েছিল আলতাবুর ও মুর্শিদা। এখবর জানিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লক্ষ্মীনারায়ণ মীনা বলেন, এই খবর পাওয়ার পরই আমরা গাদিয়াড়ার বিভিন্ন হোটেলে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছি। অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের কথায় ইলিয়াসের খুনের ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে যে আলতাবুর ও মুর্শিদা যুক্ত এ-বিষয়ে পুলিশ নিশ্চিত। তদন্তও পুরোদমে চলছে। দু-একদিনের মধ্যেই এই খুনের রহস্য উন্মোচিত হবে। এ ঘটনায় শ্যামপুর এলাকায় চাঞ্চল্য রয়েছে। (প্রতিদিন, ২১.০৩.০৩)

পুরুষদের উপর অত্যাচার বন্ধে উদ্যোগী পুলিশ

আজকের সংবাদপত্রেও (১৪.০৮.০৩) পড়লাম বধূকর্তৃক স্বামী খুনের ঘটনা।

'পুরুষ শাসিত সমাজ'-এর সংজ্ঞাটা বোধহয় বদলে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের কোপেই হোক কিংবা নারীদের অবাধ স্বাধীনতার চাপেই হোক — এই সমাজে কিন্তু নীরবে নিঃশব্দে বেড়েই চলেছে পুরুষ নির্যাতনের ঘটনা। এই নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। তবে সল্টলেকে স্ত্রীর হাতে স্বামী নির্যাতনের ঘটনা এতটাই ক্রমবর্ধমান যে শেষমেশ পুলিশকেই হাল ধরতে হল।

নারী নির্যাতন রুখতে পুলিশের বিশেষ বাহিনী 'সেতু' যেমন কাজ করছে ঠিক তেমনি স্ত্রীর হাতে স্বামীদের লাঞ্ছনা আটকাতে পুলিশ গড়ে তুলল 'সোপান'। সব কিছু ঠিকঠাক চললে চলতি মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে 'সোপান' আনুষ্ঠানিকভাবে মাঠে নামবে।

শুধু সল্টলেকে নয়, লেকটাউন, রাজারহাট, দমদম, দক্ষিণ দমদমের বিভিন্ন এলাকায় স্বামী লাঞ্ছনার উপর কড়া নজর রাখবে 'সোপান'। তবে আইন দাওয়াইকে দূরে সরিয়ে রেখে 'সোপান' কাজ চালাবে। সে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকাকে নিয়ে 'কাউন্সেলিং' এর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে পুলিশ। 'কাউন্সেলিং'-এ কাজ না হলে আইনি দাওয়াইকে শেষ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবে পুলিশের এই বিশেষ 'সেল'।

'সোপান' নিয়ন্ত্রণ করবেন সল্টলেক এস ডি পি ও সুজয় চন্দ। এছাড়া 'সোপান' পরিচালনার একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে রয়েছেন সল্টলেক মহকুমা শাসক বৈদ্যনাথ মণ্ডল এবং সমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সল্টলেক) অজয় চন্দ জানান, 'সোপান'-এর কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একজন মহিলা পুলিশ ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা হবে।

তিনিই 'কাউন্সেলিং'-এর পুরো ব্যাপারটা দেখবেন। কোনও সমস্যার সৃষ্টি হলে সোপানের পরিচালন কমিটি মেটাবে।" আইনি দাওয়াই-এর ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত নেবে এই পরিচালন কমিটি। মাসখানেক আগে সমাজে নারী নির্যাতন বন্ধে পুরুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পুলিশ 'সেতু' গঠন করে। 'সেতু'-এর কাজ ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে। এই মুহূর্তে তেমন কোন সাড়া না ফেললেও 'সেতু' অনেকটাই এগিয়ে দেবে।

সল্টলেক ও তার সংলগ্ন এলাকায় নারী নির্যাতনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পুরুষ নির্যাতন। বাড়ছে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ। দু'পক্ষের এই সমান্তরাল নির্যাতনের জেরে ক্রমেই বাড়ছে আত্মহত্যার ঘটনা। বেশ কয়েকটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত করতে গিয়েই স্বামী-স্ত্রীর কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকার মানসিক মিল না হওয়ার কারণই অনেকাংশে দায়ী বলে পুলিশ মনে করছে। সে ক্ষেত্রে 'সোপান' ও 'সেতু' যৌথভাবে কাজ করলে সমাজের এই সংকট অনেকটাই মিটবে বলে পুলিশ মনে করছে।

সল্টলেকের ডি এ ব্লকের এক আবাসিক (নাম গোপন করা হল) দীর্ঘদিন ধরেই নিজের স্ত্রীর হাতে নির্যাতিত হচ্ছিলেন। শেষমেশ তিনি পুলিশের হস্তক্ষেপ চাইতে বাধ্য হন। শুধু এই আবাসিক নয়, সল্টলেকের বিভিন্ন ব্লক থেকে স্ত্রী অথবা প্রেমিকা কিংবা অন্য কোনও মহিলার নির্যাতনের হাত থেকেই রেহাই পেতে ভুরি ভুরি অভিযোগ এসেছে পুলিশের কাছে। প্রতিটি অভিযোগ আইনি পথে সমাধান করা সম্ভব নয়। অভিযোগগুলির একমাত্র সমাধান উভয় পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া।

এই বোঝাপড়ার জন্যই উভয় পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসবে 'সোপান'। আলোচনার বিষয়বস্তু, কিংবা অভিযোগকারীর নাম ঠিকানা সবকিছুই 'সোপান'-এর পক্ষে গোপন রাখা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। 'সোপান' আলোচনার জন্য কখনও স্থানীয় থানা আবার কখনও অভিযোগকারীর নিজের বাড়িকে বেছে নেবে।

টোপ হিসেবে নারীর যৌনতা

নারীর যৌন-ক্ষমতার প্রভাব অপরিসীম। এ-ক্ষমতার কাছে পর্যদস্ত হয়েই ভারতীয় নেতৃত্ব সেদিন ভারত বিভাগে সায় দিয়েছিল। মাউন্টব্যাটেন লেডি মাউন্টব্যাটেনকে এগিয়ে দিয়েছিলেন নেহেরুকে প্রভাবিত করতে। আজাদ লিখে গেছেন, 'She admired her husband greatly and, in many cases, tried to interpret his thought to those who not at first agreed with it." তার প্রধান কাজ ছিল স্বামীর বিরোধীদের আস্তে আস্তে বাগে আনা। বিপত্নীক নেহেরুর নিঃসঙ্গতা পূর্ণ করেছিলেন এডুইনা মাউন্টব্যাটেন। এ-মহিলা নেহেরুকে প্রভাবিত করেছিলেন নানা ভাবে। কলিন্স ল্যাপিয়ের তার 'Freedom at Midnight' গ্রন্থে লিখেছিলেন ঃ

'Often over tea, a stroll in the Mughal Gardens or a swim in the viceregal pool, she had been able to charm Neheru out of his gloom, redress a situation and subtly encourage her husband's effort.

একজন নারীই এভাবে নির্ধারিত করেছিলেন এক হতভাগ্য জাতির নিয়তিকে। (উৎস 'বর্তমান', ১৮.০৮.০৩ — নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত)।

শিক্ষাজগতে, পত্র পত্রিকার জগতে, অফিসে, আদালতে, মাঠে-ময়দানে নারীরা এভাবেই টোপ ফেলে চলেছেন, এ-যুগে আরও বেশি মাত্রায়।

নারীই নারী নির্যাতন বন্ধ করতে পারে

যখন নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় হয় তখন সমাজ জীবনে নেমে আসে নানান বিপর্যয়। আর সেই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে হলে সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে হয়। নারী নির্যাতন, বধূহত্যা, ধর্ষণ সেই অবক্ষয়ের একটি দিক। দেশে দেশে যুগে যুগে নাবী হয়েছে পণ্য, নির্যাতিত। সেই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণেও আমরা দেখেছি নারীকে নির্যাতিত হতে। শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধের কয়েক ছত্র এখানে তুলে ধরা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

'মণি-মাণিক্য' মহামূল্য বস্তু, কেন না তাহা দুষ্প্রাপ্য! এই হিসাবে নারীর মূল্য বেশি নয়, কারণ সংসারে ইনি দুষ্প্রাপ্য নহেন। জল জিনিসটি নিত্য-প্রয়োজনীয়, অথচ ইহার দাম নাই। কিন্তু যদি কখন ওইটির একান্ত অভাব হয়, তখন রাজাধিরাজও বোধ করি এক ফোঁটার জন্য মুকুটের শ্রেষ্ঠ রত্নটি খুলিয়া দিতে ইতস্তত করেন না। তেমনি ঈশ্বর না করুন, যদি কোনওদিন সংসারে নারী বিরল হইয়া উঠেন, সেইদিনই ইহার যথার্থ মূল্য কত, সে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে — আজ নহে! আজ ইনি সুলভ।'

সুতরাং, আমাদের সমাজ-সংসারে নারী চিরদিনই অবহেলিত ছিল। এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শুধু নারী নয়, পুরুষও নির্যাতিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অবশ্য নারী শিকাব হযেছে পুরুষের আদিম প্রবৃত্তির কাছে, যা কোনও সভ্য সমাজ মেনে নিতে পারে না।

প্রাচীনকালে নারী নির্যাতন ছিল আরও ভয়াবহ। ইতিহাসই তার সাক্ষী দেয। দেবদাসী, সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিধবা — এগুলি তার জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে আছে। পাঞ্জাবের কাংড়া পার্বত্য অঞ্চলে প্রতি বছর একটি প্রাচীন দেবদারু গাছের কাছে একটি কুমারী মেয়েকে বলি দেওয়া হতো। নগ্নদেহ কুমারীকে শস্যখেতে নিয়ে হত্যা করলে খেতের উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়। কুমারীকন্যাব আত্মহুতি শুকনো পুকুরকে জলে পূর্ণ করে — এমন বিশ্বাসও প্রচলিত ছিল পাঠানকোটের কাছে চম্পাবতী শহরে। মিশরে নীলনদের জল যাতে বাড়ে, সেই কামনা করে প্রতি বছর একটি কুমারী মেয়েকে নীলনদের জলে নিক্ষেপ করা হতো। প্রাচীন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কুমারী বলি দেওয়ার প্রচলন ছিল। দুর্ভিক্ষ বা মহামারীতে এথেন্সের জনগণও এক দেববাণীর আদেশে কুমারী বলি দিত। অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীবা কুমারী মেয়েকে জীবন্ত পুঁতে ফেলে দিত মৃত্তিকাদেবীকে প্রসন্ন করার জন্য। চীনের প্রাচীন এবং পবিত্র শহর 'পিকিং'-এর ঘন্টা নির্মাণের পেছনেও আছে কুমারীকন্যার আত্মাহুতি। এরকম হাজার উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে, যা পড়লে সভ্য সমাজের মানুষ আতঙ্কিত ও শিহরিত হবে। আধুনিক সভ্য শিক্ষিত সমাজেও নারী নির্যাতন সংগঠিত হচ্ছে সকলের চোখের সামনে, এটা কম দুঃখের কথা নয়। যদি কিছু বিপথ চালিত সমাজবিরোধীরাই এই জঘন্যতম কাজের অংশীদার। সেই সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনও বিভ্রান্ত অথবা নিরপেক্ষ নয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন না এলে এর পর থেকে মুক্তি নেই। আমরা যদি সকলে সচেতন এবং সংগঠিত হতে পারি তবে কিছুদিনের জন্য হলেও নারী নির্যাতন রোধ করা সম্ভব হতে পারে, এ দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের আছে। সতীদাহ, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ একসময়ে আমাদের সমাজপতিদের অঙ্গুলী নির্দেশে পরিচালিত হতো। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মানুষও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন আর আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন এই অশুভশক্তির বিরুদ্ধে। কিন্তু, সমূলে কি

উচ্ছেদ করতে পেরেছেন? নইলে বিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় এসেও নারীদের এখনও নিরাপত্তার কথা ভাবতে হয়। যখন সারা পৃথিবীতে নারীবর্ষ পালন করা হচ্ছে — তখন আমাদের দেশে সমানে চলছে নারী নির্যাতন, নারী নিধন। এই অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় যেখানে আকাশছোঁয়া বেকারি, কলকারখানা বন্ধ, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উর্ধ্বগামী দাম, সংসারের দারিদ্র, এর থেকে আজকের যুবসমাজ হতাশাগ্রস্ত। আর এই হতাশাই আনে বিভ্রান্তি, বিকৃত রুচি। এখান থেকেই সে হয় সমাজবিরোধী। তখন এদেরই শিকার হয় মানুষ।

আমাদের প্রচারমাধ্যমগুলো আরও ইন্ধন জোগায় সহযোগিতা করে এদের খারাপ পথে ঠেলে দিতে। নারী নির্যাতন বন্ধ করতে সবাব আগে মেয়েদেরই এগিয়ে আসতে হবে। চাল চলনে, পোশাকআশাকে শালীনতা বজায় রাখতে হবে। স্বনির্ভর হতে হবে শিক্ষায়-দীক্ষায় এবং অর্থনৈতিকভাবে। সরকার ও পুলিস প্রশাসনকে হ'তে হবে সৎ ও নিরপেক্ষ। পাশাপাশি শিক্ষিত, সচেতন মানবদরদী মানুষকে পেশীশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তবেই বধূহত্যা, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন — এগুলো বন্ধ করার পথ তৈবি হবে।

পুরুষ নারীর পার্থক্য

নারীবাদীদের এ-সব কথা মেনে নিয়েও বলতে হয় একটি মেয়ে এবং একটি ছেলের মধ্যে দৈহিক এবং মানসিক ফারাক রয়েছেই। খুব ছোট কাল থেকে বালক বালিকার চাল চলন গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে যে কেউ এ-পার্থক্যটুকু ধরতে পারবেন। সফিউন্নেসা 'পরিবার ও সমাজই কন্যাকে 'মেয়ে' করে তোলে' এ-কথাটি না বলে যদি বলতেন ভোগপ্রধান সমাজব্যবস্থা পণ্য-সংস্কৃতিক ধারক বাহক বা এক একটি জীবন্ত বিজ্ঞাপন সামগ্রী হিসেবে গড়ে তোলে, তাহলেই ভাল করতেন। নারী-পুরুষ সমান সমান, এ-কথাটি বলা যত সহজ, বাস্তবটা কিন্তু ততটা সহজ নয়। কাকলি চক্রবর্ত্তীর অভিজ্ঞতা এরকমই ঃ

এই সমাজে কন্যার জন্য বাড়তি দায়িত্ব থেকেই যায়

পরিবারগুলোতে এখন লেখাপড়া শেখানো, পোশাক পরিচ্ছদ, খাওয়া দাওয়া ইত্যাদিতে ছেলেমেয়ের মধ্যে সত্যিই কোনও তারতম্য করা হয় না। ক'টি সন্তানের জন্ম দেবে তা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে কিন্তু তা সন্তানের সেক্স দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না। অর্থাৎ যারা একটিমাত্র সন্তান চান তাদের ক্ষেত্রে সেই সন্তান পুত্র হোক বা কন্যা হোক একটিতে সীমাবদ্ধ থাকে। আর যাঁরা দুটি সন্তানের জনক জননী হবেন বলে স্থির করেন, তাহলে তাদের দুটি সন্তানই যদি পুত্র হয় বা দুটি সন্তানই কন্যা তবু তারা তৃতীয় সন্তানের দিকে পা বাড়ান না।

এখন সন্তানের রূপটাও বাবা মায়ের কাছে তেমন ফ্যাক্টর নয়। কালো মেয়ের মা-বাবা মেয়ের বিয়ে কিভাবে হবে এচিন্তায় আর অযথা মাথা ঘামান না। বরং ছেলে-মেয়েকে কিভাবে পড়াশোনা শিখিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া যায় সেদিকেই লক্ষ্য দেন।

এর ব্যতিক্রম নেই তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী মহিলাও পুত্রসন্তান পেলে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করেন এমন নজির যেমন আছে তেমনি সমাজে বিদ্রোহী, প্রগতিশীল মানুষও কালো বাচ্চাকে হেয় করছেন এমন দৃষ্টান্তও কম নেই। আবার ইন্টালেকচুয়াল ঠাকুর্দার মুখ থেকে প্রথমে পৌত্রী ও পরে পৌত্র জন্মালে অবলীলায় বেরিয়ে আসে 'দিস টাইম ইট ইজ' অ্যাসেট, নট লায়াবিলিটি।'

এবং এক কন্যা সন্তানের জননীকে শুভানুধ্যায়ীরা বারেবারেই মনে করিয়ে নিতে থাকেন 'একটা বাচ্চা ভাল না তোমার আর একটা বাচ্চা হওয়া উচিত।' আমাদের চারপাশের একপুত্র সন্তানের জননীকে এতটাই এই উপদেশ শুনতে হয় না।

এতকিছু তর্ক বিতর্কের পরেও ধরে নিচ্ছি আমাদের মধ্যে একমাত্র সন্তান কন্যা হলেও তার আদরে, যত্নে, শিক্ষায় দীক্ষায়, সম্পত্তি প্রাপ্তিতে কোনও রকম তারতম্য করা হয় না। তবু একটা আলোচনা থেকেই যায়। কন্যা সন্তান কি বাবা মায়ের বাড়তি দায়িত্ব নয়।

একটি দৃশ্য ঃ মেয়ের বয়স ১৬, মায়ের ৩৮। পরীক্ষার আগে মেয়ে বাড়ি থেকে দূরে কোথাও পড়তে যায়। প্রতিদিন সন্ধ্যে সাতটা আটটা নাগাদ মা তাকে অফিস ফেরত বাড়ি নিয়ে আসেন। সেদিন ফিরতে রাত সাড়ে দশটা বেজে যাবে। বাবা বলছেন 'অত রাতে তোমরা একা একা ফিরো না বরং মামা বাড়িতে থেকে যেও।'

মেয়ের বিস্ময় 'একা কোথায়'? মা-ইতো আছে।' মা যে তাকে নিরাপত্তা দেবার জন্য যথেষ্ট নয়, মায়ের নিজের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারাও যে ক্ষেত্র বিশেষে সম্ভব নয়, অভিভাবিকা হয়েও মায়ের এই অসহায়তা কি মেয়েকে বোঝানো সম্ভব?

দৃশ্য দুই ঃ সেই একই মা এবং মেয়ে। বাসে প্রচণ্ড ভীড়। মেয়ে ক্রমাগত বলছে এখঅনে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। আমাকে তোমার জায়গায় দাঁড়াতে দাও তুমি এখানে এসো।' মেয়েকে বাঁচানোর জন্য মা অবশ্যই জায়গা অদল বদল করেন। কিন্তু সেখানে সমস্যার সমাধান হয় না, মা একই লোভের, লালসার শিকার হন। তফাত একটাই এই শিকার হওয়াটা মা সোচ্চারে ঘোষণা করতে পারেন না কারণ (১) মেয়ের কাছে ছোট হয়ে যাবার ভয় (২) সোচ্চার হলে যদি উল্টে শুনতে হয় কে ওসব করবে মাসীমা?' এর চেয়ে লজ্জার কিছু নেই, অতএব নিজের সম্মান নিয়ে নীরবে অত্যাচার সহ্য করা।

এই অসহায়তা, যারা ঠিক এই সমস্যায় না পড়েছেন হয়তো বুঝতে পারবেন না। এসব ক্ষেত্রে মা হয়তো দু'একবার ভেবেও ফেলেন মেয়ে না হয়ে ছেলে হলেই বোধহয় ভাল ছিল।

শুধু এদেশে নয় বিদেশে সেটেল করা বহু মানুষও এই সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেন না। ফিজিক্সের অধ্যাপক মহিম সেন বহু বছর আমেরিকায় বাস করে মেয়ে কিশোরী হতেই বিদেশের বিলাস বৈভব তুচ্ছ করে দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল হলেন এবং ফিরেও এলেন। 'ফিরে এলেন কেন?' উত্তরে বলেন, 'মেয়ে বড় হচ্ছে, ওই পরিবেশে মেয়ে মানুষ করা যায় না। মেয়েকে দুধের সঙ্গে বার্থ কন্ট্রোল ট্যাবলেট খাইয়ে ডেটিং-এ পাঠানো, তা সাহিত্যে পড়তেই ভাল। নিজের সন্তানের জন্য প্রযোজ্য নয়। আমার মেয়েটা যদি ছেলে হত তাহলে হয়তো এ সিদ্ধান্ত নিতাম না।'

একই আড্ডায় বসেছিলেন আরেক অধ্যাপক। বয়স বছর পঞ্চান্ন। তার একমাত্র সন্তান কন্যাটি অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধু মা-বাবা নয় দেশেরও মুখ উজ্জ্বল করেছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম 'আপনার নিশ্চয় কখনও মনে হয় না সন্তানটি পুত্র হলে আরও ভাল হত?' একটু সময় চুপ করে থেকে বললেন, 'সত্যি বলতে, আমি নিজে যখন যুবক ছিলাম তখন কখনও মনে হয় নি একথা। ইদানীং বুড়ো হচ্ছি তো, তাই এক আধবার যে মনে হচ্ছে না তা নয়। না, মেয়ে বা ছেলে রোজগার করে আমাদের ভরণ পোষণ করবে এই চিন্তা মাথায় রেখে আজকাল কেউই বোধহয় সন্তান মানুষ করি না, তবে কি, ইদানিং মাঝে মাঝে মনে হয় চারপাশের আক্রমণোদ্যত সমাজে ছেলে অনেক শক্তিশালী। মেয়ে যৌবনে পৌঁছয় মানে আরও ভালনারেবেল হয়ে যায়। ওর একদিন ফিরতে একটু রাত হলে ভীষণ চিন্তা হয়। সত্যিই বিপদে পড়লে বুড়ো বয়সে আমাকেই ছুটতে হবে ওকে বাঁচাতে।'

বাবা মায়ের কাছে কন্যা সন্তান পালনের এই বাড়তি দায়িত্ব আদি অনন্তকাল থেকে চলে আসছে এবং আরও অনন্তকাল হয়তো চলবেও, এর জন্য দায়ী সমাজ, দায়ী পরিবেশ, পরিস্থিতি। আজকের প্রজন্মের কন্যা সন্তানরা নিজেদের সম্পর্কে কিভাবে সেটা আলোচনা করেই এই প্রবন্ধের ইতি টানছি।

বছর কুড়ি আগে একটি ২২ বছরের সদ্যযুবতী মেয়ে নিজের বিয়ের দিন বাবার কষ্ট দেখে মনে মনে ভেবেছিল, 'ইস্ আমি যদি ছেলে হতাম তাহলে এখনই পরের বাড়ি যেতে হত না, চাকরি করে বাবার পাশে দাঁড়াতে পারতাম। (পরবর্তী কালে সে চাকরি করেছে কিন্তু বাবা তা দেখার জন্য আর বেঁচে থাকেননি। তাই বাবার পাশে দাঁড়াতে পারে কি পারে না তাও মেয়েটির জানা হয় নি।) যাই হোক আজ চল্লিশে পৌঁছে সেই মেয়ে তার একমাত্র সন্তান সপ্তদশীকন্যাকে জিজ্ঞেস করে, 'তোর কি মনে হয়, আজকের বাবা-মা পুত্রসন্তান এবং কন্যা সন্তানকে আলাদা করে দেখে? মেয়ের উত্তর, 'না, সেভাবে দেখে না। সেভাবে তফাত করে কিন্তু তোমাদের সময় দেখা হয় নি। তবে তোমরা দেখতে কি-না তার পরীক্ষাও হয় নি। কারণ আমি একা, আমার কোনও ভাই বা দাদা নেই।'

মায়ের প্রশ্ন, 'তুই মেয়ে, তোর কি কখনও মনে হয় ছেলে হলে ভাল হ'ত, ওদের অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা?' মেয়ের উত্তর 'কখনও মনে হয় নি, কোনও ছেলের থেকে আমি কোনও অংশে কম সুযোগ পাই না। শুধু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে না পারলে একটু বকুনি খাই যেটা হয়তো আমার ভাইকে খেতে হত না। সেজন্য আমার কোনও আফশোস নেই। কারণ সেজন্য দায়টা আমার নয় সমাজের। যে লোকগুলোর ছ'মাসের শিশুকন্যা দেখলেও বেপ করার প্রবৃত্তি জন্মায় দোষটা তাদের। কন্যাসন্তানদের নয়।

মহিলাদের মস্তিষ্কই বেশি উন্নত

বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর এক তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। তারা বলেছেন মানুষের মস্তিষ্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা যেটা, অর্থাৎ মেন্টাল প্রসেসিং হয় যেখানে সবচেষে বেশি — সেই স্থানটা পুরুষদের চেয়ে মহিলাদেরই বেশি ঘন সন্নিবিষ্ট। কানাডার বিজ্ঞানীদের একটি দল সম্প্রতি ব্রিটেনের 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকাকে তাদের এই আবিষ্কারের কাহিনী শুনিয়েছে।

কানাডার ওন্টারিওতে অবস্থিত ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির ডক্টর সান্দ্রা উইটেলসন দেখেছেন, মানুষের মস্তিষ্কের যে অংশটা জাজমেন্ট বা বিচার-বিবেচনা, পারসোনালিটি বা ব্যক্তিত্ব, প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা তৈরী করি এবং ওয়াকিং মেমারি বা কার্যক্ষেত্রে স্মৃতি ধারণের জন্য দায়ী, সেই অংশের কোষ সমূহের ঘনত্ব বা প্রতি একক আয়তনে উপস্থিত কোষের পরিমাণে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। আমেরিকার সান দিয়েগোতে অবস্থিত সোসাইটি ফর নিউরো সায়েন্সের এক সম্মেলনে ২০ জন পুরুষ ও নারীর ওপর বিজ্ঞানীদের এই সংক্রান্ত গবেষণার বিস্তারিত যে ফলাফল তারা প্রকাশ করেছেন তাতে পরিষ্কার করেই জানানো হয়েছে যে ফ্রনটাল লোব বা মস্তিষ্কের সম্মুখ অংশ যেটা, নারীর মস্তিষ্কের সেই অংশের কোষসমূহের ঘনত্ব পুরুষদের চেয়েও শতকরা ১৫ ভাগ বেশি। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এর ফলে নারীর মস্তিষ্কের সম্মুখ অংশের সঙ্গে মস্তিষ্কের অন্যান অংশের যোগাযোগ স্বাভাবিকভাবেই পুরুষদের চেয়েও হয় বেশি।

মেয়েদের থেকে ছেলেদের মধ্যে আচরণগত সমস্যা বেশি

'দ্য ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমী অব পেডিয়াট্রিক'-এর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে ৩ থেকে ৬ বছর বয়স্ক শিশুদের ২২ শতাংশই আচার-আচরণগত সমস্যায় ভুগছে। মেয়েদের তুলনায়

ছেলেদের মধ্যে এই সমস্যা বেশি বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। মেয়েদের মধ্যে ভয়জনিত প্রতিক্রিয়া এবং অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সমস্যা সাধারণত বেশি দেখা গেছে। ৬ মাসের বেশি সময় ধরে নয়াদিল্লির লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজের সাইকিয়াট্রি এবং পেডিয়াট্রিক্স বিভাগের ডাঃ শশী রাই এবং তার সতীর্থরা এই গবেষণা চালান।

গবেষণার জন্য ২০০ শিশুকে বেছে নেওয়া হয়। এদের মধ্যে ১১৫ জন ছিল ছেলে। আর্থ সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে এদের নির্বাচিত করা হয়।

গবেষকরা দেখেন, মেয়েদের মধ্যে মেজাজ হারানো, মাবামারি করা, কামড়ানো, ভাঙচুর করার ইচ্ছা, মানিয়ে নেবার সমস্যা ভীষণ। এর থেকেই তারা বেশি স্পর্শকাতর হয়, ভয় পায়। ভয় পেয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত কবে, অভিযোগ তোলে, সর্বোপরি অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়।

মেয়েদের ক্ষেত্রে পরিবারের বড় মেয়ে এই সমস্যায় আক্রান্ত। ৬০ শতাংশ মেয়েদের মধ্যে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে। ছেলেদেব ক্ষেত্রে পরিবারের দ্বিতীয় জাতকের মধ্যে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে।

মেয়েরা বেশিদিন বাঁচে

নারী-পুরষের রেষারেষি সেই আদিমকাল থেকে। নারী চায সব ব্যাপারে পুরুষকে হারিয়ে দিতে। বর্তমানকালে নারী প্রায় পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে? শুধুমাত্র দৈহিক বল পুরুষদের নারী থেকে একটু এগিয়ে রেখেছে। অবশ্য একটা ব্যাপারে নারীরা সবসময় পুরুষদের পরাজিত করে এসেছে। তা হল, নারীদের আয়ুষ্কাল পুরুষদের থেকে বেশি। আগে অধিকাংশ নারীর মৃত্যুর কারণ ছিল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সন্তান প্রসব। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে সন্তান প্রসবকালে নারীর মৃত্যু প্রায় বিরল। অধুনা এক সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে কোনও বয়ঃসীমায় নারীদের আয়ু পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি।

কেন এই তারতম্য? মেয়েরা কি ছেলেদের থেকে শারিরীকভাবে বেশি সফল? নাকি, মেয়েদের প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি? এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক অজানা তথ্যের উদঘাটন করেছেন। শুধু মানুষের ক্ষেত্রে নয়, জন্তু জানোয়ারের ক্ষেত্রেও পুরুষদের বেশিদিন বেঁচে থাকাটা একটা সমস্যা। স্তন্যপায়ী জীব, পাখী, এমনকি মাছেদের মধ্যে দেখা গেছে মেয়েদের প্রাধান্য।

মানুষের ক্ষেত্রে, অধিক বয়স্ক মহিলাদের চেয়ে, অধিক বয়স্ক পুরুষদের ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে ক্যানসাব, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বেশি হয়।

মানুষের ক্ষেত্রে, অধিক বয়স্ক মহিলাদের চেয়ে, অধিক বয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে ক্যানসার ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বেশি হয়।

মানুষের জন্মের শুরু থেকেই, অর্থাৎ গর্ভাধারে ভ্রূণ অবস্থা থেকেই দেখা যায় নারীর প্রাধান্য। যদিও প্রতি একটি মায়ের ক্ষেত্রে ১.২ পুরুষের ভ্রূণ (মেয়েদের তুলনায় বেশি) গর্ভসঞ্চার হয়, কিন্তু সন্তান জন্মাবার (ছেলে অথবা মেয়ের) সম্ভাবনা সমান সমান। অর্থাৎ বেশি ভ্রূণ তৈরী হলেও সম্পূর্ণ রূপ নেয় মাত্র কয়েকটি। আসলে এর এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। মানুষ সন্তানের

মধ্যে দিয়ে বজায় রাখে তার বংশধারা। এই সন্তান সৃষ্টির পিছনে আছে নারী ও পুরুষের শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর মিলন। এই জননকোষগুলি ক্রোমোজোম দ্বারা গঠিত এবং এই দুই-এর ক্ষেত্রেই এক্স (X) ক্রোমোজোমটির গুরুত্ব খুব বেশি। নারীদের সেক্স ক্রোমোজোমে পুরুষদের ক্রোমোজোমের থেকে সামান্য তফাৎ আছে। নারীদের দুটি এক্স (X) ক্রোমোজোম এবং পুরুষদের একটি এক্স (X) ও একটি ওয়াই (Y)।

যদি এক্স ক্রোমোজোমে কোন গন্ডগোল থাকে, নারীদের বেলা, তা অন্যটির দ্বারা অনেকটা শুধরে যায়। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে তা সবসময় সম্ভব হয় না। কিছু কিছু রোগ যেমন, হিমোফিলিয়া (রক্ত বন্ধ না হওয়া) যা এক্স ক্রোমোজোমের গন্ডগোলের জন্য হয়, দেখা গেছে পুরুষদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি হয়।

শুধুমাত্র সেক্স ক্রোমোজোমে নারী ও পুরুষের তফাৎ তা নয়, সেক্স হরমোনের ক্ষেত্রেও তফাৎ দেখা গেছে। নর্থ ক্যারোলিনার দু'জন বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করেছেন, পুরুষের হৃদরোগের জন্য দায়ী তাদের সেক্স ক্রোমোজোম। যেমন টেস্টোটেরন। এই সফল হরমোন, লো ডেনসিটি, লিপ্রোপ্রেটিন বা এল ডি এল (দূষিত কোলোস্টেরল) রক্তের চাপ বাড়িয়ে দেয়। ফলে হার্ট অ্যাটাক হয়। এবং এই সম্ভাবনা পুরুষদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি।

অন্যদিকে নারীদের ক্ষেত্রে তাদের সেক্স হরমোন (যেমন অস্টোজেন) রক্তে হাইডেনসিটি লিপ্রোপ্রোটিন বা এইচ ডি এল (শুদ্ধ কোলোস্টেরল) বাড়াতে সাহায্য করে — যা দৈহিক জরুরী অবস্থায় পুষ্টি ও শক্তি যোগায়।

শুধুমাত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দিক দিয়ে নয়, পুরুষদের অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ হল তাদের চারিত্রিক গঠন। অধিকাংশ পুরুষ উদ্ধত জীবন যাপন করেন। অতিরিক্ত ধূমপান বা মদ্যপান ছাড়া দেখা গেছে এরা একদম শরীর সম্পর্কে সচেতন নয়। এরা জীবনের ঝুঁকি নিতে ভালবাসেন ও আনন্দ পান। নিজেদের মধ্যে মারামারি, যুদ্ধ, আত্মহত্যা, দুর্ঘটনায় এদের মৃত্যুর হার অনেক বেশি। এ-যুগে তথাকথিত বিপ্লবী বা উগ্রপন্থী এবং অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত যুবকরা অথবা সমাজ শত্রুরা যখন তখন মারা যাচ্ছে। গোষ্ঠীদ্বন্দে প্রাণ হারাচ্ছে। এভাবে কয়টা মেয়ে বা নারী প্রান দেয়? হ্যাঁ, কিশোরী-যুবতীরা প্রাণ দেয় গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, পুরুষের এই উদ্ধত ভাবের কারণ হল নিজের পৌরষত্ব প্রকাশ করার চেষ্টা। এই ভাব নারীদের আকর্ষণ করে। এর দ্বারা পুরুষ প্রমাণ করতে চায় — তারা সুস্থ সবল এক প্রাণী, যার ক্ষমতা নারীদের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, গবেষণায় দেখা গেছে নারীরা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি ধরে। এই শক্তি তারা কিন্তু শুধু শুধু অপচয় করে না। এই শক্তি তারা দশমাস সন্তান ধারণ ও প্রসবের সময় কাজে লাগায়।

আধুনিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বর্তমান সমাজে নারীদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপক জনপ্রিয়তা। প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে নারীর চার পাঁচটি সন্তান প্রায়শই দেখা যায়, কিন্তু জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির সঙ্গে সমাজে একটি বা দুটি সন্তানের রীতি চালু হয়েছে। তাছাড়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ অধিকাংশ দম্পতিকে একটির বেশি সন্তানে প্ররোচিত করে না। এর ফলে সন্তান ধারণের দৈহিক চাপ থেকে বর্তমান নারী সমাজ এখন প্রায় অনেকটাই মুক্ত।

এছাড়াও পূর্বে আলোচিত আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে সন্তান ধারণ ও সন্তান প্রসব এখন নারীদের ক্ষেত্রে অনেক সহজ হয়ে এসেছে।

সব মিলিয়ে বলা চলে নারীদের আয়ু ধীরে ধীরে শতবর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে।

পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের পার্থক্য রয়েছেই। তাই পুরুষরা হারিয়ে যেতে পারে যখন তখন। কিন্তু মেয়েদের হারিয়ে যেতে মানা আছে।

"একটি মেয়ে। একদিন ভর দুপুরবেলা তার হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হল। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া কি অতই সোজা। চার পাশে পরিচিত চিহ্ন সব ছাড়িয়ে আছে না? তবু, সেদিন তার মনটা তত ভাল ছিল না বলেই ..... খুব রোদ্দুরের সেই দুপুরবেলা সে অচেনা নম্বর লাগানো বাসে উঠে বসল। তারপর এক সময়ে নেমে পড়ল যেখানে, সেখানে অত্যাশ্চর্য্য এক মেলা বসেছে। মেলা! মেয়েটি আনন্দে দিশেহারা। হারিয়ে যাওযার জন্য এর চেয়ে ভাল জায়গা আর কীই বা হতে পারে?

মেলায় ঢুকে পড়ার হাজাবটা দরজা। যে কোনও একটা দিক দিয়ে টুক করে ঢুকে পড়লেই হল। মেয়েটি মাছির মতো ভিড় গলে ঢুকে পড়ল সেই প্রশস্ত মেলার মাঠ। এই মাঠে কারুর একার গলা আলাদা করে চেনা যাবে না। সবার গান আব কথা মিলেমিশে এক আজব কোরাস তৈরী হয়েছে। আর গোটা মাঠে ছড়িয়ে রয়েছে অদ্ভুত মোলায়েম হলুদ এক আলো। বাইরের রোদ্দুরের মতো নয়। এই আলোয় তার হারিয়ে যাওয়া সহজ হবে বলে ভাবল সে। কিন্তু অদ্ভুত এই মেলার মধ্যেও, এই বদলে যাওয়া হলুদ আলোতেও মেয়েটি দেখল, চারপাশের দৃশ্যপট আবার চেনা চেনা ঠেকছে। পাশেই গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে অগণন মানুষ, তাদের অনেকেই তার খুব পরিচিত। রুদ্ধশ্বাস দৌড়ে সে এ বার মেলা থেকে বেরিয়ে পড়তে চাইল। কিন্তু আশ্চর্য! মেলার দবজাগুলো কোথায়? আবাব তাকে হারান-ভ্রমণে বেরোতে হবে তো। মেলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত হয়রান হয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে সে। কিন্তু চারপাশ থেকে সব দরজা বন্ধ হয়ে এক বদ্ধ ক্ষেত্র তৈবি হয়ে গিয়েছে। সে এবার কী করে?

এটা একটা গল্প। বা গল্পের মতো কিছু। মূল এই গল্পটাই আমাদের জীবনে নানাভাবে ফিরে আসে। মেয়েরা হারিয়ে যেতে চাইলে হয়তো এমন কিছু ঘটতে থাকে সব সময়। মেলা বদলে যায়। 'মেলা' অর্থে আমরা যে মুক্ত মাঠের কথা ভাবি, তেমন মুক্তির মাঠ বলে মেয়েদের জন্য কিছুই বাঁচে না হয়তো। যেখানেই গিয়ে দাঁড়াও, মুক্ত ক্ষেত্রের চারপাশে ঘনিয়ে ওঠে পরিচয়ের মেঘ।

কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার প্রাক্ শর্ত হল, বেরিয়ে পড়া। ভ্রমণ। 'ভবন'-এ আটক না থেকে 'ভুবন'-এ প্রকাশিত হওয়া। কিন্তু কত দূর থেকে যেতে পারে একজন মেয়ে? কত দূর? কত দূর গেলে নিজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা যায় খানিকক্ষণ? নিজের মুখোমুখি এই নিবিষ্ট আলাপচারিতা কোথায় সম্ভব হয়? কোন মাটিতে? কিংবা কোন সে আকাশ?

প্রায় এই ধরণের একটা প্রশ্ন তুলেছিল ছোট্ট মেয়ে সোমো। ভূটানি লেখক কুনজ্যাং চোদেনের 'দ্য সার্কল অব কর্মা' উপন্যাসে সে তার মাকে জিজ্ঞেস করে ঃ সব চেয়ে দূর কতটা অবধি আমি বেড়াতে পারি, মা?

সোমো আর পাঁচটা মেয়ের থেকে একটু আলাদা। মা-বাবার বারো জন সন্তানের মধ্যে সে প্রথম মেয়ে, তৃতীয় সন্তান। কিন্তু তার জন্ম হয়েছে 'মাংকি ইয়ার'-এ। জন্মানোর বছর হিসেবে সময়টা বিশেষ সুবিধের নয়। তার হাঁটুতে রয়েছে বিশেষ জন্মচক্র। তা দেখে মেয়ের ভবিষ্যৎ বলতে এসেছেন জ্যোতিষী আর মা তা শুনছেন মন দিয়ে। দুশ্চিন্তার রেখা কপালে। হাঁটুর ওই

চিহ্নের মানে কি? মায়ের প্রশ্ন জ্যোতিষীকে।

— মানে আর কিছুই নয়। মেয়ে তেমন ধীর-স্থির হবে না। কোনও এক জায়গায় মন টিকতে চাইবে না তার। এখান থেকে ওখান ..... অস্থির, ভারী অস্থির এই মেয়ে শুধু বেড়াতে চাইবে।

মায়ের ভুরুতে ফের কুঞ্চন। কোথায় বেড়াতে পারে একটা মেয়ে? তারপর সে যদি সোমোর মতো 'অস্থির' কেউ হয়? কোথায়, কত দূর? মা তখনই ভেবেছিলেন। আর মেয়ে সেই একই প্রশ্ন করল একটু বড় হয়ে। স্বপ্নের ঘোর চোখে। ছেলেমানুষীও।

মায়ের বৃদ্ধ মনে স্তরে স্তরে পুরনো ভাবনার আগল। মেয়ের প্রশ্নে নাড়া খাচ্ছে সেই স্তর। মায়েব স্বরে কিছুটা দ্বিধা, কিছুটা কল্পনা, কিছুটা খেলা ......

"কত দূর? উত্তরে একেবারে তিব্বত .... দক্ষিণে, ধর ভারত!" নিজের ভাবনার দৌড়ে মা হেসে কুটিপাটি। একটা মেয়ে আবার কত দূর বেড়াবে?

এই প্রশ্নের বেশ পাতাজোড়া তথ্যসমৃদ্ধ উত্তর আমরা চাইলেই পেতে পারি। দেশ-বিদেশের মেয়েরা ভ্রমণেও বেশ বলার মতো রেকর্ড করে ফেলেছে। পাহাড়ে উঠেছে, সাত-সমুদ্র পেরিয়ে বরফ-রাজত্বে পৌঁছে গিয়েছে, গহন অরণ্যের বুকে সেঁধিয়েছে ...... জলের গভীরে, আকাশে, মহাকাশে, কোথাও নয়? আমরা ভবনপুরের অধিবাসীনিরা পরম নিশ্চিন্তে বিস্ময়রস উপভোগ করছি — চোখ টেলিভিশনের পর্দায়। ওই তো, দুঃসাহসী টেসা ম্যাকগ্রেগার গুঁড়ি মেরে পিছু নিচ্ছেন বাঘের। সুন্দরবনের ঘোর অরণ্যে তার এই অ্যাডভেঞ্চার দেখতে বেশ লাগছে। শনিবারের দুপুরে বর ফিরেছেন বেশ দুপুর-দুপুর। স্বামীর সোহাগে আহ্লাদী বধূ অলস হাতে পাত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছেন। কোন দুঃসাহসী বাঙালী কন্যে পাড়ি দিয়েছেন সুদূর আন্টার্কটিকা। সেই মেয়ের নামটাও ভুলে যাচ্ছেন হয়তো, বরের সোহাগের অতিশয্যে। কিন্তু এত কিছুর পরেও এক টুকরো অসম্ভব স্বপ্নের মতো লেগে থাকছে স্বাধীন এক মাটির স্বপ্ন। মাটির স্বাধীনতা মানে, ওই মাটি খুঁজে নিয়েছে যে মেয়ে, তারই স্বাধীনতা। ওই মাটিতে পৌঁছতে গেলেই তৈরী হয়ে যায় এক অসামান্য ভ্রমণগাথা। একা একটা মেয়ের নিজস্ব ভ্রমণের ইতিহাস। যেমন মীনাক্ষী। মীনাক্ষী আয়ার, মিসেস আয়ার। এই ক্রমে তার পরিচয়টা লেখা হল বটে, কিন্তু তার ভ্রমণকাহিনীতে সে পরিচিত হয় ঠিক এর বিপরীত ক্রমে। অপর্ণা সেনের মি. অ্যান্ড মিসেস আয়ার ছবিতে।

প্রথমে আমরা তাকে চিনি মিসেস আয়ার হিসেবে। ভ্রমণের শুরু থেকে শেষ অবধি তার এই পরিচয়টাই প্রাধান্য পায়। কিন্তু সে তো বাইরে। গোটা ছবিতে সে ভাবে দেখলে দুটো গল্প রয়েছে। ছবিটা দেখামাত্রই বাইরের গল্পটা পড়ে ফেলছি সহজে। কিন্তু এই গল্পের সঙ্গেই কিংবা তার সঙ্গে এক মধুর দূরত্ব রেখে দ্বিতীয় যে গল্প, সেখানে তো সেই একটা মেয়ের ভ্রমণকাহিনী। আর তার এই গল্পে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এক অসামান্য যাত্রাপথ। পাহাড় থেকে সমতল। শিশু কোলে মিসেস আয়ার। তার উপস্থিতির সঙ্গেই তার এই পরিচয়টাই মুখ্য হয়ে ওঠে। বিবাহসূত্রে পাওয়া তার এই পদবি।

তবু। তবু, প্রায় দু'দিনের এই একলা ভ্রমণে মিসেস আয়ার একটু একটু করে মীনাক্ষী হয়ে ওঠে। তার মঙ্গলসূত্র, সিঁদুর, ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতার হাজার বায়নাক্কার চিড় লাগে। জীবনকে অন্য একটা কোণ থেকে দেখার সুযোগ এসে যায়। সঙ্গী পুরুষটিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল, মীনাক্ষী তার ছকবন্দী জীবনের রীতি ভেঙে আস্ত দু'টো দিন কাটিয়ে ফেলে। দূরত্বের হিসেবে কত দূর ভ্রমণ হল, এই প্রশ্ন সরিয়ে রাখি যদি, তা হলে মনের এই সরণও

কম ভ্রমণ নয়। সূচনাবিন্দু থেকে অনেকদূরে সরে যায় মীনাক্ষী। মুসলিম জেনেও রাজার এঁটো বোতল থেকে জল খায়, প্রায় অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে একই ঘরে রাত্রিবাস করে, রাজার সঙ্গে তার হ্যান্ডিক্যামে চোখ রেখে চাঁদনি রাতে জঙ্গলে সারিবদ্ধ হরিণ দেখে, আর প্রায় একই ভাবে, বলা যায় রাজার দৃষ্টিপথ অনুসরণ করে একজন জলজ্যান্ত মানুষকে খুন হতেও দেখে। মাত্র এক রাতে জীবনের এই চরম দু'প্রান্ত ছুঁয়ে ফেলে সে।

যাত্রাপথে সে একাই ছিল। পিছনে তার যে পারিবারিক ইতিহাস, তার শেকল বেশ পোক্তভাবে বেঁধেছিল মীনাক্ষীকে। সে হিন্দু। সে ব্রাহ্মণ। সে বিবাহিতা। সে মা। — কিন্তু এই সব কিছু হলে যা-যা করতে নেই, সেই সবই তার করা হয়ে যায়। তার অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে গিয়েছে যে যে-সব পরিচয়ের বিষলতা (বিষ, কারণ তা জীবনের অন্য সব অমৃত ছুঁয়ে দেখতেও নিষেধ করে যে), তা ছিন্ন হয় এই পথে।

একা ভ্রমণে বেরনোর আগে মহিলাদের কি করা উচিত, কি নয়, সেই নিয়ে বেশ বিস্তৃত এক নির্দেশপত্র পাওয়া গেল ইন্টারনেটে। মেয়েদের অনেক রকম পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সেখানে। প্রথমেই বলা হয়েছে পোশাকের কথা। একা পথে বেরিয়ে কি পরা উচিত, কি নয়। একেবারেই নিজের খুশিমতো কিছু পরা যাবে না। ভেবেচিন্তে 'শোভন' পোশাক নির্বাচন করতে হবে, পথের দুরাচারী পুরুষদের চিত্তবিকার যাতে না ঘটে। তার পরেই বলা হয়েছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা : পথে বেরিয়ে ভুল করেও ছেলেদের সঙ্গে মেশা যাবে না। পরিবার নিয়ে পথে বেরিয়েছেন যারা, কিংবা বয়স্ক ব্যক্তি — এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা যেতে পারে, আপদে-বিপদে সাহায্যও চাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পুরুষদের সঙ্গে এই সব একদম চলবে না। একমাত্র তা হলেই বিপদের সম্ভাবনা কমানো যেতে পারে।

মীনাক্ষী যদি এই সব নির্দেশ মেনে চলত? তার আশেপাশেও তো বয়স্ক পারিবারিক মানুষজন কম ছিল না। যদি সে তাদের ছাড়া অন্য কোন মানুষকেই বিশ্বাসের যোগ্য বলে না ভাবত? দু'দিনের ভ্রমণ তার কাছে কোনও মানেই রাখত না তা হলে। অর্থাৎ, সুজনদের পরামর্শ হল, বাইরে বেরলেও হারিয়ে যেতে পারবে না মেয়েরা। চার পাশ থেকে চেনা মুখ, চেনা রীতি, চেনা শেকল তাকে বেঁধে ফেলবে আষ্টেপৃষ্টে। অপরিচয়ের খোলা বাতাসই যদি না গায়ে লাগবে, তবে তা কীসের ভ্রমণ?

শ্রীকান্ত যেমন। আমাদের নায়কশ্রেষ্ঠ শ্রীকান্ত। ভবঘুরে শ্রীকান্ত! স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণই যার জীবনের সার কথা। ভ্রমণের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা দিয়েই উত্তরোত্তর বেশ দার্শনিক হয়ে ওঠে সে। শরৎচন্দ্রের অন্য পাঁচ জন নায়কের মতোই শ্রীকান্তকেও আমরা চিনি এক মুক্তহৃদয় মানুষ হিসেবে। তার মনের প্রসারতা প্রমাণ করতেই লেখক তাকে এখান থেকে ওখান ছুটিয়ে মারেন। শ্রীকান্তের হাঁটুতেও কোনও জন্মচক্র ছিল কিনা জানা নেই। কিন্তু তাকে মোটেই সোমোর মত অস্থির আখ্যা দেওয়া হয় না। বরং তার 'ভবঘুরে' বিশেষণটি তার কাছে প্রশংসাসূচকই। কোথাও কোন বাঁধন নেই, পিছুটান নেই, চার দেওয়ালের বদ্ধতা নেই — ভুবনজোড়া সংসার বিছানো তার। কিন্তু এত যে ভ্রমণ করে শ্রীকান্ত, তাতে তার মনের কোনও সরণ ঘটে কি? ভুবনভ্রমণের পরেও ভবনের বদ্ধতা থেকে মুক্ত হয় কি সে? সেই তো আশৈশব লালিত চিন্তাভাবনাই বয়ে বেড়ায় এখান থেকে ওখান। তল্পিতল্পা তার সামান্যই, কিন্তু এই যে সংস্কারের ভার, সেটাও তো তার বোঝা হয়েই থাকে। সে ক্ষণে ক্ষণে অসুস্থ হলে সেবাদাসী

রাজলক্ষ্মীকে মনে পড়ে। তাকে মা আর সেবাদাসীর বাইরে অন্য কোনও পরিচয়ে ভাবতেই পারে না শ্রীকান্ত। অভয়ার তীব্র দৃষ্টি আর ততোধিক তীব্র প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে যায় দুর্বল ছুতোয়।

শ্রীকান্ত একাই তো নয়। গল্পে, উপন্যাসে পুরুষ চরিত্ররা প্রায় 'ভবঘুরে' হয়ে ঘুরে বেড়ায়, এখান থেকে ওখান। প্রতি অনুষঙ্গে একটা করে আধো প্রেমের গল্প তৈরী হয়, সেই গল্প মুছে দিয়ে তৈরী হয় নতুন কোন গল্প। কিন্তু যদি একটা মেয়ে সত্যিই এই ভাবে নানা ঘাটে একটু একটু পা ভিজিয়ে আসে? বাস্তব হল, কল্পনাতেও সে বেশি দূর যেতে পারে না। মনের গতি স্তিমিত হয়ে আসে। চিন্তার সামান্য দৌড়েও সেই মেয়ে হাঁফিয়ে ওঠে, ক্লান্ত হয়। 'অস্থির' বিশ্লেষণ কিংবা এই শব্দের মধ্যে নিহিত চারিত্রিক স্খলনকে স্বীকার করার ঝুঁকি নিতে ভয়ই লাগে। অস্থিরতা আসে, কোষে কোষে চারিয়ে যায় তীব্র গতির টান। শেষ পর্যন্ত বিশ্বসংসারের সহস্র ছবি স্রেফ ধূসর মানচিত্র থেকে যায়।

কিংবা সুযোগ আসে। হয়তো স্বামীসঙ্গে ভ্রমণ। হয়তো মধুচন্দ্রিমার যাত্রা কিংবা স্বামীর সঙ্গেই বিদেশে। অনেক সময়েই সে-ও একাকী ভ্রমণ। একটা বেড়ানো বাইরের। যেখানে সে আহ্লাদে ডগোমগো। অকারণে হেসে উঠছে বারবার। ঢলে ঢলে পড়ছে বরের গায়ে। বুভুক্ষু পুরুষটিকে মোলায়েম দুপুরে কিংবা রাত্রে নৈবেদ্যের মতো সাজিয়ে দিচ্ছে শরীর। আর একই সঙ্গে অন্য এক ভ্রমণও শুরু হয়ে যাচ্ছে তার। অন্য এক মানুষকে চিনে নেওয়ার এই যাত্রাপথে সে দারুণ রকম একা। এ তার একেবারে নিজস্ব এক ভ্রমণ। পুরুষটির কাঁধে মাথা রেখে, তার হাত মুঠোয় ধরে সমুদ্রে, জঙ্গলে, পাহাড়ে ...... অমন অপরূপ নিসর্গ .... কিন্তু সে একা। বেড়ানো ফুরিয়ে যায়, ফের খাঁচাবন্দি সেই মেয়ে।

অন্যের তোয়াক্কা না করে মেয়েরা নিজেদেব দল গড়ে ফেলেন মাঝেমধ্যে। এমন একাধিক মহিলা দল পাওয়া যাবে আমাদের এই শহরে কিংবা শহরতলিতে। নিজেদের উদ্যোগে পাহাড়-সমুদ্র-অরণ্য চষে বেড়ান তারা। কে জানে তারা সবাই গোটা ভ্রমণ পথে নিজের জন্য একটা করে হারিয়ে যাওয়ার মেলা খুঁজে পান কিনা।

আর, এই সব কিছুই যারা পারে না, সকাল থেকে রাত্রি অবধি রুটির জন্য দৌড়ে যাদের চোখে ঘনিয়ে এসেছে একশো বছরের ক্লান্তি?

ওই যে একজন। এই মাত্র কাঁধ থেকে ব্যাগের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে পড়ল। ছেড়ে দিয়েছে ন'টা পঞ্চান্নর বাস। দৌড় দৌড়। বাস থেকে ঝুলন্ত মানুষেরা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে। ভেতর থেকে কন্ডাক্টর চেঁচাল, গলা মেলাল যাত্রীরাও; মেয়েছেলে হয়ে এই ভাবে বাসে ওঠে নাকি কেউ? নেমে যান। নেমে যান।

কিন্তু এত সহজে নেমে গেলে তার চলবেই না। ওই বাসটাতেই যেতে হবে। নইলে সব ওলট-পালট। সময় তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে মারছে রোজ। প্রতিটি মিনিট তার কাছে অমূল্য রতন। শেষ পা-দানিতে তুলে দিয়েছে একটি পা। আর একটি এখনও বাইরে। ওড়নার মতো কিছু একটা জড়িয়েছিল কাঁধে, গলায় চেপে সেটা প্রায় ফাঁস। অসংখ্য মানুষের বগলের তলা দিয়ে, লোলুপ হাতের খামচানি বাজিয়ে সে নিজের জন্য তৈরি করে নিচ্ছে ইঞ্চি ইঞ্চি জমি। ব্যাগটি বুকে জাপটে ধরে সেবার পৌঁছে গেল একটা জানলার কাছাকাছি জায়গায়। এক হাতের নাগালে পেয়ে গিয়েছে আস্ত একটা রড! এর থেকে বেশি আর কি চেয়েছিল সে! ঘামে ভিজে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ। নিজেকে এ বার পরম বিজয়িনী বলে মনে হচ্ছে তার।

বাড়ি থেকে অফিস। আর অফিস থেকে বাড়ি। কিংবা বাড়ি থেকে কাজের বাড়ি, সেখানে ডিউটি সকাল আটটা থেকে রাত দশটা। তার এই নিত্য ভ্রমণ পথে এই বাসের সময়টুকুর যে যাত্রা তা-ই বা কম কিসে? বাস এই বার একটু গতি নিয়েছে। হাওয়া ঢুকছে এই মানুষবোঝাই দানোটার পেটের মধ্যেও। প্রতিদিন একই পথ। তবু প্রতিদিনই তা নতুন। এই পথের বাইরে অন্য কোনও পথ তার জন্য বরাদ্দ নেই বুঝে নিয়েই এই পথেই তার পর্বতাহোরণ, এই পথেই মহাকাশ যাত্রা। রাত্রি বেলা ফিরতি পথেও তাকে যুদ্ধ করতে হয়। কিন্তু লড়াইয়ের বাইরে ভ্রমণের পথটুকু তার নিজের। এখানে ঘাড় ঘোরালেই সে দেখতে পাচ্ছে একাধিক চেনা মুখের দেঁতো হাসি। কিন্তু বাসের মধ্যেকার মেলায় এখন সে হারিয়ে যাবে। কোনও কিছুতেই কিছু যায়-আসে না তার।

হু হু করে ছুটছে বাস। মহাকাশযানের বেগে। আকাশসীমা ভেদ করে পৌঁছে যাচ্ছে সে। খবরের কাগজে সেই মেয়েটির হাসি হাসি মুখ দেখেছিল সে। অদ্ভুত কমলা পোশাকে সর্বাঙ্গ মোড়া। সঙ্গী পুরুষদের পাশে বিজয়িনীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। যাওয়ার খবরে তত মন দেয়নি। খেয়ালই করেনি তেমন। কিন্তু তার ফেরত-সফরটি মনে গেঁথে গিয়েছে। প্রতিদিন এই সময়ে, হাতের নাগালে রডটি এসে যাওয়ার পর, দু'টি পা রাখার জমি পেয়ে যাওয়ার পর এবং বাসটি দ্রুতগামী হলেই সে নিজের মনে সেই মেয়েটিব মতো করে হাসার চেষ্টা করে। মনে মনে মহাকাশ ভাবে। কল্পনা। তার ভ্রমণসঙ্গীর নাম কল্পনা চাওলা।"

মউলি মিশ্রর ভাববাদী রোমান্টিক মানসিকতার পরশ পেতে ভালোই লাগে। কিন্তু, মেঘদূতের যক্ষের মতো অবস্থা'ত ছেলে বা পুরুষদেরও। কোথাও তাদের হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা। কিন্তু সে'ত শুধু মনে মনে। আমার মত বাঁধন হারা পুরুষ, দায়-দায়িত্বহীন পুরুষ কয়জন মেলে সংসারে? কিন্তু তাও আমার বইয়ের বন্ধন। এ-কয় মাস বাইরে বেরোতে পারছি না। আন্দামান নিকোবর যাওয়ার সুযোগ আছে। তাও বিভিন্ন কাজে বিশেষ করে লেখাটেকার কাজে আটকে যাচ্ছি। ছেলেরা'ত দূরে থাক, মেয়েদের'ত আমার মতো ভবঘুরে বাউন্ডুলে স্বভাবের হতেই পারে না। বিধাতা আমাকে এ-ভাবেই গড়েছেন। মেয়েদের গড়েছেন অন্য ভাবে। প্রাকৃতিক কারণেই তারা সংসার জীবনে বিশেষ ভাবে আবদ্ধ। প্রাকৃতিক কারণেই তারা পুরুষদের মতো যৌনসম্ভোগে উদ্দাম হয়ে উঠতে পারেন না। প্রাকৃতিক কারণেই তারা যত্র তত্র ভ্রমণ করতে পারেন না। প্রাকৃতিক কারণেই তারা একজন পুরুষকে ফাঁদে ফেলে কপালে কলঙ্কের টীকা এঁকে দিতে পারেন, সামাজিক বয়কটের ব্যবস্থা করতে পারেন। প্রাকৃতিক কারণেই তাদের চলার পথ বিপদ সঙ্কুল। পদে পদে বিপদ, তাদের চলার পথে হিংস্র শ্বাপদকূলের নিরন্তর আনাগোনা। নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো নারী স্বাধীনতার সওয়ালকারীদের যুক্তিগুলোকে দুর্বল করে দিতে পারে।

পার্থক্য আছে বলেই

নারী-পুরুষের পার্থক্য আছে বলেই কলকাতায় মহিলাদের লাঞ্ছনার ঘটনা বাড়ছে। ঝরণা ধর, দীপান্বিতা রায়, সফিউন্নিসা, মৌলি মিশ্ররা টতই চেঁচাচ্ছেন, নারী প্রগতির ধ্বজা ওড়াচ্ছেন, হাঁটতে বসতে শুধু পুরুষদের গালি দিচ্ছেন, ততই কিন্তু খোদ কোলকাতায় বেড়ে যাচ্ছে নারী নির্যাতন।

বধূ হত্যা, পণপ্রথা, ধর্ষণ প্রভৃতি এত বেড়ে যাচ্ছে কেন? নারীরা সবাই মিলে বিভিন্ন নারী নির্যাতনের হাতিয়ারগুলো ভোঁতা করে দিতে পারছেন না কেন? কেন আন্দোলন, মিছিল, মিটিং

করে সব বন্ধ করে দিতে পারছেনা।

আমাদের নেতারা একটা সতী দাহ হলে দেশ জুড়ে হৈ চৈ করেন, পার্লামেন্টে ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু করেন। কিন্তু সতীদাহের চেয়েও ভয়ঙ্কর প্রথা ঘরের বৌগুলোকে পুড়িয়ে মারছে যখন তখন এবং দাহপ্রথা সতীদাহ'র চেয়ে শতগুণ বেশি হারে ঘটে চলেছে তার বিরুদ্ধে নেতা নেত্রীরা সব চুপচাপ কেন?

নারীবাদীরা তাদের বাধ্য করতে পারেন না? শুধু পুরুষদের দোষ দিয়েই দায়িত্ব এড়ানো, শুধু পুরুষদের কাঁধে কামান দাগানো? পুরুষবিদ্বেষী এসব প্রগতিশীলারা কীভাবে মাতৃভক্ত নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল সন্তানের জন্ম দেবেন? তাদের সন্তানরা'ত গর্ভাবস্থাতেও নারী বিদ্বেষী হয়ে বেড়ে ওঠে!

এরা একবারও স্মরণ করেন না সেই সব মাতৃভক্ত যুবকদের যারা মাতৃজাতি নারীব সম্মান রক্ষার্থে জীবন দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। এখানেই'ত মেয়েদের এবং নারীদের সীমাবদ্ধতা।

কলকাতা পুলিশের রেকর্ড অনুযায়ী গত বছর অর্থাৎ ২০০২ সালের জানুয়ারী থেকে নভেম্বর প্রথম ১১ মাসে মহিলা অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ৭৯টি। ধর্ষণের ঘটনা বিভিন্ন থানায় রেকর্ড করা হয়েছে ২৪টি। তাছাড়া জুলাই থেকে নভেম্বরে — পাঁচ মাসে শ্লীলতাহানির ঘটনা ৭৫টি রেকর্ড করা হয়েছে।

কলকাতা পুলিশের একাংশের অভিযোগ, কোনও থানায় অভিযোগ রেকর্ড করা আগের চেয়েও কঠিন হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মহিলারা নিরাপত্তার আশঙ্কায় অন্তত পঞ্চাশ শতাংশ পুলিশকে কোনও অভিযোগ জানাতে চান না। তাতেও কলকাতায় নারী নির্যাতন বাড়ছে।

কলকাতা পুলিশ্রে রিপোর্ট অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে নভেম্বর মাসে ১৮টি। তার আগে জুলাইতে ১৬টি, আগষ্টে ১২ট, সেপ্টেম্বর মাসে ১৪টি এবং অক্টোবর মাসে ১৫টি। অর্থাৎ জুলাই থেকে নভেম্বরে — পাঁচ মাসে ৭৫টি। মহানগরীতে ধর্ষণের ঘটনা প্রতি মাসে বাড়ছে। এ বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বরে — ১১ মাসে ধর্ষণের ঘটনা বিভিন্ন থানায় রেকর্ড করা হয় ২৪টি। এর মধ্যে শেষ পাঁচ মাসেই অর্থাৎ জুলাই থেকে নভেম্বরে ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে ১৫টি। জুলাইতে ২, আগষ্টে ৪, সেপ্টেম্বরে ৪, অক্টোবরে ২ এবং নভেম্বরে ৩টি। অনেকদিন থেকেই অভিযোগ, ধর্ষণের অভিযোগ জানাতে থানায় গেলে প্রতিকারের চেয়ে হয়রানি হতে হয় বেশি। ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে পুলিশ সময়মতো চার্জশিট দেয় না, মামলা খারিজ হয়ে যায়। ধর্ষণকারী বেপরোয় হয়ে ওঠে।

মহিলা অপহরণের ঘটনা মাঝখানে প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইদানিং তা বাড়তে শুরু করেছে। প্রতি মাসেই বাড়ছে। সর্বশেষ পাঁচ মাসে — জুলাই থেকে নভেম্বরে কলকাতা থেকে মহিলা অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ১৭টি, জুলাইতে ২, আগষ্টে ৪, সেপ্টে'ম্বরে ৪, অক্টোবরে ৪ এবং নভেম্বরে ৫টি।

পুলিশ রেকর্ড অনুযায়ী, খুন ডাকাতির ঘটনা কমে গেলেও কলকাতায় অন্য কোনও অপরাধ কমেনি। বরং অপরাধীদের দৌরাত্ম বেড়ে গিয়েছে। অনেক ছোট-খাট ডাকাতির ঘটনা এখন রাহাজানির তালিকায় চলে যাচ্ছে।

আগের বছর ২০০১ সালের তুলনায় এ-বছর রাহাজানি, দিনে-রাতে চুরি, মোটর গাড়ির

যন্ত্রাংশ চুরি, পকেটমার-এর ঘটনা বেড়ে গিয়েছে। আগের বছর প্রথম ১১ মাসে রাহজানির ঘটনা ছিল ১৩৫টি। এ বছর বেড়ে হয়েছে ১৫২টি। স্কুটার মোটর সাইকেল চুরি ১০৪০ থেকে কমে হয়েছে ৯১১টি।

ডাকাতি ও খুনের ঘটনা পুলিশী খতিয়ান অনুযায়ী প্রতিমাসে কমে যাচ্ছে। খুনের ঘটনা ৬৪ থেকে কমে হয়েছে ৫০ এবং ডাকাতি ২৫ থেকে ১৮টি।

দৃশ্য - ১

খড়দহের পশ্চিম পল্লিশ্রীতে মঙ্গলবার রাতে এক আদিবাসী মহিলাকে গলা টিপে খুন করা হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, পারিবারিক ঝামেলার জেরেই এই খুন হয়েছে। মৃত মহিলার নাম ভিক্টোরিয়া ওঁরাও (৩০)। খুনীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ জানায়, এদিন রাতে পেয়ারাবাগানের মাংরা ওঁরাও মদ্যপ অবস্থায় ওই মহিলার বাড়ি যায়। দুজনের দীর্ঘদিন ধরে একটা সম্পর্ক ছিল। এই নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে ঝামেলা চলছিল। মাংরা এইদিন রাতে মদ্যপ অবস্থায় ওই মহিলার বাড়ি গিয়ে গলা টিপে তাকে খুন করে। বুধবার সকালে স্থানীয় ছেলেরা মাংরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে খুন করেছে স্বীকার করে।

দৃশ্য - ২

দোলের দিন সকালে পুরশুঁড়া থানার বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে মাধ্যমিকের ছাত্রীকে গোয়ালঘরে ঢুকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় সি পি এম নেতার ভাগ্নে জড়িয়ে পড়ায় এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামের কয়েকশ মানুশ নেতার ভাগ্নেকে গ্রেপ্তারের দাবীতে সোচ্চার হয়। দলবল নির্বিশেষে সবাই এর প্রতিবাদে মুখর হয়। খবর পেয়ে থানার ও সি ঘটনাস্থলে এলে গ্রামবাসীরা গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশকে দুদিন সময় দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, এ ব্যাপারে কোনও কেস হয় নি। গ্রেপ্তারের প্রশ্ন ওঠে না। ওরে নিজেরাই পরে মিটিয়ে নিয়েছে। (বর্তমান, ২১.০৩.০৩)

দৃশ্য - ৩

'ভ্যালেন্টাইনস ডে'-র নাম করে এক মহিলাকে উত্যক্ত করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে শিয়ালদহের ষ্টেশন এলাকায়, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ। পুলিশ জানিয়েছে, হালিশহরের বাসিন্দা এক মহিলা এদিন শিয়ালদহ ষ্টেশনে এক আত্মীয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই সময় দুটি ছেলে তাকে উত্যক্ত করতে শুরু করে। ওই মহিলা অন্যত্র চলে গেলে তারাও সেখানে যায়। মহিলা ফের আগের জায়গায় ফিরে এলে তার শাড়ি ধরে টানাটানি শুরু করা হয়। তখনই মহিলা মোবাইল পুলিশ ভ্যানের কাছে দৌড়ে গিয়ে অভিযোগ জানান। এরপর পুলিশ এক যুবককে ধরতে সমর্থ হয়। তার নাম রাজু সাহা। রাজারহাট থানা এলাকায় তার বাড়ি।

দৃশ্য - ৪

বন্ধ্যাকরণের অস্ত্রোপচার করতে আসা মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনায় দুর্গাপুরে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ২ স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুর্গাপুর সি টি সেন্টারে

সংগঠনের নিজস্ব হাসপাতালে বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি ১৫দিন অন্তর রেড ক্রস সোসাইটির তত্ত্বাবধানে সেখানে বন্ধ্যাত্বকরণের শিবিব হয়। দুর্গাপুরের আশপাশের গ্রামের ১৪ জন গৃহবধূ বন্ধ্যাত্বকরণ অস্ত্রোপচারের জন্য ওই হাসপাতালে ভর্তি হন। পরের দিন তাদের অস্ত্রোপচার হয়। এর পরে নার্স ও আয়াদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক থাকেন। দুই জন পুরুষ স্বেচ্ছাসেবককে রাখা হয় রোগিনীদের স্ট্রেচার বহনের জন্য। ওই দিন অস্ত্রোপচার শেষ হওয়ার পরে ওই দুই স্বেচ্ছাসেবক অন্যদেব খেয়ে আসতে বলে। অন্যেরা দু'জনের উপরে রোগিনীদের ভাব দিয়ে খেতে চলে যান। এই সুযোগে তারা কয়েকজন মহিলার শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ ওঠে। হাসপাতালে ভর্তি ১৪ জন গৃহবধূ দুর্গাপুরের মহকুমাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান। তারা জানিয়েছেন, অস্ত্রোপচারের পরে আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকায় তারা কোনও বকম বাধা দিতে পারেননি। পরে ঘোর কাটলে তারা রেডক্রসের নার্স ও আয়াদের এই কথা জানান। মহকুমাশাসক বলেন, "দুই স্বেচ্ছাসেবক দীনবন্ধু বর্মা ও সন্দীপ সাহাকে অবিলম্বে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছি।" পুলিশ ওই দু'জনকে গ্রেফতার করে।

স্থানীয় বাসিন্দা শোভা শিকদার বলেন তার পুত্রবধূ হাসপাতালে অস্ত্রোপচারেব জন্য এসেছিলেন। তিনিও শ্লীলতাহানিব শিকার হয়েছেন। বর্ধমানেব জেলাশাসক রেডক্রসেব জেলা কমিটির চেয়ারম্যান এদিন বলেন, "রাতেই যা ঘটাব ঘটে। সকালে মহিলারা মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করে বিস্তারিত ঘটনা জানান। কি করে ওয়ার্ডের ভিতরে এমন ঘটনা ঘটল তা ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি।" ওই হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত বেডক্রসের এক কর্তা বলেছেন, ওই দুই জন স্থানীয় ছেলে বলে ভরসা করে নেওয়া হয়েছিল। ভাবতেই পারিনি, ওরা এরকম করবে।" (আনন্দবাজার, ১৫.০২.০৩)

দৃশ্য - ৫

সোনাদানা বি এস এফ ক্যাম্পের সেই ঘরটি চিহ্নিত করলেন বাংলাদেশের মহিলা। তার অভিযোগ, গত ১০ জানুয়ারী ওই ঘরেই তার শ্লীলতাহানি করা হয়েছিল। বসিরহাটের এস ডি পি ও শিশির দাস বলেন, "বি এস এফের উচ্চপদস্থ অফিসারদের সামনে বাংলাদেশী মহিলা যে-ঘরে তাকে অত্যাচার করা হয়েছিল, সেটি দেখিয়ে দেন। ফলে পুরো ঘটনা নতুন মোড় নিল।" পুলিশ এবং বি এস এফ সূত্রে জানা যায়, ঘরটিতে ১২২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের এক পদস্থ কর্তা থাকতেন। ওই ঘটনার কয়েক দিন পরে তাকে সোনাদানা থেকে সরিয়ে সামশেরগর বদলি করা হয়।

যে ফুটো নৌকাতে ওই মহিলা ও তার পরিবারকে তুলে দেওয়া হয়েছিল, সেটিরও মাঝিকে মঙ্গলবার পুলিশের সামনে বি এস এফের তদন্তকারী অফিসার প্রেমজিৎ সিংহ জেরা করেন। বসিরহাট থানার ও সি-র সামনে মাঝি মহম্মদ করিম ঢালী বলেন, "বি এস এফ জওয়ানেরা অন্ধকারে ফুটো নৌকাতে ওই মহিলা ও দুটি শিশু সহ সাত জনকে বাংলাদেশ পার করে দিয়ে আসার জন্য আমাকে বাধ্য করেছিলেন। এমনকি বি এস এফের কোম্পানী কমাণ্ডার এই ঘটনা কাউকে বলতে বারণও করেছিলেন।" জেরার পরে প্রেমজিৎ সিংহ বলেন, "আমরা তদন্ত করছি। মহিলা ও নৌকার মাঝিকে জেরা করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।" ঘটনা অন্য দিকে মোড় নেওয়ায় বি এস এফের আইজি রাজিন্দর সিংহ এবং ১২২

ব্যাটেলিয়নের কমান্ডান্ট বি এস খুশওয়া সোনাদানা ক্যাম্পে আসেন। বি এস এফের তরফে বলা হয়েছে, তারা সীমান্ত পরিদর্শনে এসেছেন।

নৌকার মাঝি মহম্মদ করিম ঢালী বি এস এফের তদন্তকারী অফিসারের জেরায় জানান, বি এস এফের হয়ে তিনি বি ডি আর-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তার নৌকায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বি এস এফ রাতের অন্ধকারে ফেরত পাঠাত। ঘটনার দিন রাত আটটা নাগাদ বি এস এফ জওয়ানেরা ফুটো নৌকায় ওই মহিলাদের নিয়ে যেতে বাধ্য করেন। মাঝনদীতে নৌকা ডুবে যায়। একটি ড্রামে ভর দিয়ে ওই মহিলা ও তার এক শিশু কন্যাকে নিয়ে তিনি বাংলাদেশে ওঠেন। পরে একজন বাংলাদেশীর সাহায্যে দক্ষিণ বাগুন্ডিতে আসেন। করিম বলেন, ''পরে ঘটনাটি জানাজানি হয়ে যায়। সোনাদানা ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার ডেকে হুমকি দেন, যাতে ওই ঘটনা আমি কাউকে না বলি।''

বেলা দুটো নাগাদ ওই মহিলাকে সোনাদানা পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে ছিলেন বসিরহাট থানার সি আই জিয়াদুর রহমান, ও সি অসিত সাউ এবং তদন্তকারী অফিসার সুবোধ চক্রবর্ত্তী। ও সি বলেন, ক্যাম্পের যে-বেদিতে তাকে বসানো হয়েছিল ওই মহিলা প্রথমে সেটি দেখান। তার পরে যান যে-ঘরে তাকে অত্যাচার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ সেই ঘর যান এবং কেঁদে ফেলেন। বি এস এফের তদন্তকারী অফিসারের প্রশ্নে তিনি বলেন, ফরসা একজন তার উপরে অত্যাচার করেছিলেন। তার পরনে ছিল লুঙ্গি আর গেঞ্জি। তিনি চিনিয়েও দিতে পারবেন। এ বার পুলিশ 'টি আই প্যারেড'-এর জন্য আদালতে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার বলেন, ''অভিযোগ পাওয়ার পরে বি এস এফ কর্তাদের বলা হয়, সেদিন যাঁরা ক্যাম্পে ছিলেন, তাদের কাউকে যেন বদলি না করা হয়। তাও অফিসারকে সামশেরনগরে বদলি করা হয়েছে।'' (আনন্দবাজার, ১২.০২.০৩)

দৃশ্য - ৬

মহিলা ঘটিত ঝামেলায় ফেঁসে যাওয়া এক পুলিশ অফিসারকে বাঁচাতে গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে পুলিশ মিথ্যা মামলা সাজিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। হুগলি জেলার পোলবা থানার অন্তর্গত বারোল গ্রামে চুরি-ছিনতাইয়ের কেসে পুলিশ কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করলেও, উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ নেই বলে আদালত তাদের মুক্তি দিয়েছে। অবশ্য চাপে পড়ে অভিযুক্ত অফিসারের বিরুদ্ধে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ঘটনাটি ঘটে ১ ফেব্রুয়ারী রাতে বারোলে গ্রামরক্ষী বাহিনীর হাতে হেনস্তা হন বলে পোলবা থানার মেজবাবু একটি এফ আই আর করেন। তার অভিযোগ, ওইদিন রাত পৌনে তিনটের সময় একটি কেসের তদন্ত করে ফেরার সময় আর জি পার্টির কয়েক জন আমাকে ঘেরাও করে। কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রামের আরও ৪০/৫০ জন গ্রামবাসী জড়ো হয়। আমাকে একটি চাতালে বসিয়ে মারধর করতে থাকে।

সার্ভিস রিভলবারটি কেড়ে নেওয়ারও চেষ্টা হয়। আমার সঙ্গে আসা ফোর্সের দু'জনকে আমার কাছে আসতে দেয় নি। পরে টিভি ক্যামেরার সামনে তারা জোর করে অন্যায় স্বীকার করিয়ে নেয়।

এই ঘটনার প্রায় পাঁচ ঘন্টা পর থানার ওসি পুলিশ বাহিনী এনে মেজবাবুকে উদ্ধার করে।

ইতিমধ্যে গ্রামের লাগোয়া দিল্লী রোডে পথ অবরোধ শুরু হয়। পুলিশ এসে গ্রামবাসীকে আশ্বাস দেয়, সংশ্লিষ্ট অফিসারের সাজা হবে। কিন্তু গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সাজা তো দূরের কথা, পরের দিন রাত থেকে কমান্ডো-র‍্যাফ সহ কমবাট বাহিনী নিয়ে পুলিশ গ্রামে গ্রামে হানা দেয়। এরপর ধরপাকড় এবং মহিলাদের ওপর নির্যাতন চলে বলে অভিযোগ।

আসামীদের আদালতে হাজির করা হয়। গ্রামবাসীদেব বিরুদ্ধে ৩৭৯ ধারায় জামিন অযোগ্য চুরির কেস দায়ের করা হলেও চুঁচুড়া সদর মহকুমা আদালতের বিচারপতি কে ভট্টাচার্য ৪ ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তার হওয়া সকলকে জামিন দিয়ে তার আদেশে বলেন, চুরির অভিযোগ করা হলেও, পুলিশ আসামীদের কাছ থেকে কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি। তৃণমুল কংগ্রেস এই কেসটি মানবাধিকার কমিশনে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে। জেলার অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার আনন্দকুমার এই কেসের তদন্তের জন্য গ্রাম বাহিনীর সম্পাদক শ্যামল ঘোষ সহ বারোলের ৩ গ্রামবাসীকে নোটিশ দিয়ে ডেকে ঘটনার জবানবন্দী নেন।

গ্রামবাসীরা অবশ্য অত্যাচার সত্ত্বে আনন্দকুমারের কাছে গিয়ে প্রশ্ন তোলেন, রাত তিনটের সময় কিসের তদন্তে এক বিধবা মহিলার বাড়ি ওই পুলিশ অফিসার গিয়েছিলেন? আসলে অভিযুক্ত অফিসারকে আড়াল করতেই গোটা গ্রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবেছে পুলিশ। (বর্তমান, ১৪.০২.০৩)

দৃশ্য - ৮

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঘরে ঢুকিয়ে এক রোগিনীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে এক স্বাস্থ্যকর্মীর বিরুদ্ধে। সালারের তালিবপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত অভিযুক্ত কর্মী সি পি এম প্রভাবিত কো-অর্ডিনেশন কমিটির সক্রিয় সদস্য। সে জন্য বিষয়টি ধামাচাপা দিতে সালার থানার পুলিশ ঘটনার পরে ওই মহিলার অভিযোগ নিতে তো চায়নি, উল্টে ও সি-র ঘরে 'বিচারসভা' বসিয়ে টাকার বিনিময়ে মিটমাট করে দেয়।

'বিচারসভা'য় হাজির থাকা সি পি এমের তালিবপুর লোকাল কমিটির সদস্য নাজিমুদ্দিন আহমেদ বলেন, "মানবিক কারণে ওই ব্যক্তির ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ও সি-ও একই কথা বলেন। সেই জন্য থানায় অভিযোগ করা হয়নি।"

এর পরে ওই সি পি এম নেতা তার দলের রাজ্য সম্পাদকের ঢঙে বলেন, "মহিলার স্বভাবচরিত্র অবশ্য খুব একটা ভাল নয়।" এই কথা শুনে নির্যাতিতা বলেন, " পুলিশ-নেতারা আমার ইজ্জতের দাম কষেছেন ১০ হাজার টাকা। আমার কি-ই বা বলার আছে?"

'বিচারসভা' বসলেও কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি। বিষয়টি জানাজানি হয়ে যাওয়ায় চাপের মুখে পড়ে পুলিশ ঘটনার ১৩ দিনের মাথায়, সোমবার মহিলার অভিযোগ নথিবদ্ধ করে শ্লীলতাহানির মামলা রুজু করে। অভিযুক্ত ওই স্বাস্থ্যকর্মী অবশ্য তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

তালিবপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঘটনাটি ঘটে ২৬ ফেব্রুয়ারী, পুলিশের বিট হাউস থেকে তিনশো গজ দূরে। স্থানীয় মানুষ জানান, সপ্তাহে তিন দিন ঘন্টা তিনেকের জন্য এক জন চিকিৎসক থাকেন ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। বাকি দিনগুলিতে চিকিৎসা করেন জি ডি এ কর্মীরা। স্থানীয় বায়েনপাড়ার এক

গৃহবধূ পেটে প্রচন্ড ব্যথা নিয়ে ওই দিন তালিবপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান। তখন দুই জন স্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন। তাদেরই একজন শামসুর আলম।

ওই মহিলার অভিযোগ "রোগ দেখার নাম করে শামসুল আমাকে একটি ঘরে নিয়ে অত্যাচার চালায়। আমি বাড়ি ফিরে এসে স্বামীকে সমস্ত খুলে বলি।" শামসুল আলম অবশ্য এই অভিযোগ মানতে চাননি। সোমবার দুপুরে বাড়িতে বসে তিনি বলেছেন, "স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসা ওই মহিলার লিউকোমিয়া হয়েছে বুঝতে পেরে আমি তাকে ওষুধ দিই। আমার বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ মিথ্যা।"

সেদিনই নির্যাতিত স্ত্রীকে নিয়ে তার স্বামী বিট হাউসে যান। তাদের অভিযোগ, সেখানে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয় যে সালার থানার ও সি-র হুকুম ছাড়া কোনও অভিযোগ নেওয়া যাবে না। পুলিশের কাছে কোনও সুরাহা না পেয়ে ওই দম্পতি এর পরে সি পি এমের তালিবপুর লোকাল কমিটির সদস্য নাজিমুদ্দিন আহমেদ, সি পি আই-এর জেলা সম্পাদকমন্ডলীর এক সদস্য নওশাদ আলি শেখের কাছে যান। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ১ মার্চ সালার থানায় যে 'বিচারসভা' বসে, তাতে ও সি শিবনাথ মন্ডল ছাড়াও নাজিমুদ্দিন, নওশাদ ও জেলা স্বাস্থ্য দফতরের তিন অফিসার হাজির ছিলেন।

জেলার সহকারী মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, "সে দিন আমি সালার হাসপাতালে ছিলাম। ওই মহিলা অভিযোগ করতে এসেছেন বলে ও সি আমাকে থানায় যেতে অনুরোধ করেন। সেই মতো আমি থানায় যাই। সেখানে অভিযুক্তের ১০ হাজার টাকা জরিমানা, দূরবর্তী এলাকায় বদলি ও মহিলার কাছে ক্ষমা চাওয়া — এই তিনটি প্রস্তাব ওঠে। এর পরে মহিলার ইচ্ছা মোতাবেক লিখিত অভিযোগ নিয়ে আইনমতো ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে চলে যাই।"

এদিকে মহিলার শ্লীলতাহানি ও 'বিচারসভা'-র কথা জানাজানি হওয়ার পর এখন সকলে চাপান-উতোরে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শুধুমাত্র প্রস্তাব ওঠা পর্যন্ত 'বিচারসভা'-য় ছিলেন, সহকারী মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এই কথা বললেও অভিযুক্ত শামসুল বলেন, "স্বাস্থ্য বিভাগের তিন কর্তা, দুই নেতা এবং ও সি-র উপস্থিতিতেই ওই তিনটি প্রস্তাব রায় হিসেবে গ্রাহ্য হয়। সেই মতো জরিমানার ১০ হাজারের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা মিটিয়ে দিয়েছি। বাকি টাকা পাঁচ মাসের কিস্তিতে দেব। সেই সঙ্গে আমাকে বড়ঞার সুন্দরপুর-কয়থা হাসপাতালে বদলি করা হয়েছে।"

অভিযুক্ত এবং অভিযোগকারিণী দু'জনেই সি পি আই নেতা নওশাদ আলি শেখের 'বিচারসভা'-য় উপস্থিতির কথা বললেও তিনি অবশ্য তা স্বীকার করতে চান নি। তিনি বলেন, "সেই দিন আমি তো ছিলামই না, এমনকি থানায় কোনও 'বিচারসভা' বসেছে বলে শুনিনি।" সি পি আই নেতা একথা দাবি করলেও সি পি এম্ নেতা নাজিমুদ্দিন বলেন, "নওশাদ অবশ্যই ছিলেন। তাঁর সামনেই তো সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।" সি পি এমের তালিবপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক সৌমেন মুখোপাধ্যায় বলেন, "আইন মেনে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে থানায় বিচারের ঘটনা নিন্দনীয়। সেখানে দলের লোকজন থেকে অন্যায় করেছেন।" পরবর্তী জোনাল কমিটির বৈঠকে এই নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানান সৌমেনবাবু।

বামফ্রন্টের আর এক শরিক দল সি পি আইয়ের তরফেও দলীয় নেতার 'বিচারসভা'-য় হাজির থাকা নিয়ে কড়া বিবৃতি দেওয়া হয়। সি পি আইয়ের জেলা সম্পাদক মানিক মন্ডলের

বক্তব্য, "আমাদের দলের কেউ জড়িত থাকলে দলীয় নিয়মনীতি মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ সুপার বীরেন্দ্রও এই ব্যাপারে মঙ্গল বার আশ্বাস দিয়েছেন, "থানায় 'বিচারসভা' বসলে অবশ্যই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

দৃশ্য - ৯

নিখোঁজ হওয়া কিশোরীকে উদ্ধারের পর তিন দিন তিন রাত নবগ্রাম জোনাল কমিটির কার্যালয়ে রেখে দিয়ে মঙ্গলবার বিকালে পুলিশের হাতে তুলে দিল সি পি এম। অভিযুক্ত পাচারকারীকেও তিন দিন দলীয় কার্যালয়ে রাখার পরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার আগে অবশ্য সি পি এমের জোনাল কমিটির সম্পাদক সুনীল ঘোষ দাবী করেন, "ওই কিশোরী পাচারের ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সি পি এম সদস্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। এই খবর প্রকাশিত হওয়ায় দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। সি পি এমকে নারী পাচারকারী সাজিয়ে কংগ্রেসও আন্দোলন শুরু করেছে। এই কারণেই আমরা উদ্যোগী হয়ে কিশোরীকে উদ্ধার করেছি।"

১৪ বছরের এই কিশোরীর নাম নুরেজা খাতুন। বাড়ি নবগ্রামের গুড়া পশলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পুড়ি গ্রামে। ওই গ্রামের সম্পন্ন চাষী ও পঞ্চায়েত সদস্য হসরোতুল্লার বাড়িতে নুরেজা ৭ বছর বয়স থেকে পরিচারিকার কাজ করত। তার মা, স্বামী পরিত্যক্তা রহিদা বেওয়া অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন। গত ২৩ ডিসেম্বর থানায় লিখিত অভিযোগে জানান, তার মেয়ে নুরেজাকে ২১ ডিসেম্বর ওই পঞ্চায়েত সদস্য ওসমান গনি এক নারী পাচারকারীর হাতে তুলে দিয়েছে। ওসমানের বাড়ি বীরভূমের নলহাটি থানার মোস্তফডাঙা গ্রামে।

ওই পঞ্চায়েত সদস্যের স্ত্রী মাজেদা বিবি অবশ্য নুরেজাকে পাচারের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, "২০ ডিসেম্বর বিকালে নুরেজার হাতে সোনার এক জোড়া দুল দেওয়া হয়েছে। সে বীরভূমের মাসির বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছে বলে চলে গিয়েছে। তারপর আর কিছুই জানি না।" অভিুক্তদের গ্রেফতারের দাবীতে ও ওই কিশোরীকে উদ্ধারের জন্য কংগ্রেসের মহিলা সংগঠন আন্দোলন শুরু করে। কিশোরীর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটিকে সি পি এমের জোনাল সম্পাদক সুনীলবাবু তখন 'ছোটখাটো' ঘটনা বলে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনিই এদিন জানান, উত্তরপ্রদেশে ফোন করে নুরেজা ও ওসমান গণির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের ফিরিয়ে আনা হয়। গত শনিবার সন্ধ্যা থেকে তারা থাকে জোনাল কার্যালয়ে।

দলীয় কার্যালয় থেকে মাত্র শ'তিনেক গজ দূরে নবগ্রাম থানা ভবন। পাচার ও উদ্ধারের ব্যাপারে থানায় দিন সাতেক আগে লিখিত অভিযোগ করা সত্ত্বেও তাদের পুলিশের হাতে তুলে না দিয়ে তিন দিন ধরে দলীয় কার্যালয়ে রাখা হল কেন? সুনীলবাবুর বক্তব্য, "কংগ্রেসের মিথ্যা অভিযোগের জবাব দিতেই লোকজনকে জানিয়ে পুলিশের হাতে দেওয়ার জন্য থানার ও সি-র অনুমতি নিয়েই দু'জনকে পার্টি অফিসে রাখা হয়েছে।" দলের নেতা-কর্মীদের পাশে বসে অভিযুক্ত ওসমান গণি নিজেকে নুরেজার মামা হিসেবে দাবী করে বলেন, "ওর দিদাকে জানিয়েই ওর বিয়ে দিতে উত্তরপ্রদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওর মাকে অবশ্য একথা জানানো হয়নি।"

তবে নেতাদের পাশে বসে নুরেজা যা বলেছে, তাতে তার পরস্পরবিরোধী বক্তব্যই বেরিয়ে এসেছে। স্বেচ্ছায় চলে যাওয়ার কথা জানিয়ে এক বার সে বলে, "উত্তরপ্রদেশ যাওয়ার সময়

ট্রেনের এক যাত্রীকে সোনার দুল দু'হাজার টাকায় বিক্রি করেছি। ওই দুল আমাকে ৬-৭মাস আগে দেওয়া হয়েছিল।" কিছুক্ষণ পরেই নুরেজা ফের জানায়, "ওই দুল পেয়েছিলাম ২১ ডিসেম্বর, শনিবার। বিক্রি করেছি রামপুরহাটের এক দোকানে।" পার্টি অফিসে বসে নুরেজা এ কথা বললেও তার মা রহিদা অভিযোগ করেন, "এসব ওদের শেখানো কথা। মেয়েকে পাচার করার কথা ধামাচাপা দিতেই ওরা নুরেজাকে দিয়ে এসব বলাচ্ছে। সে জন্য তিন দিনেও ওরা মেয়েকে ফেরত দেয়নি।" কংগ্রেসের মহিলা সংগঠনের ব্লক সভানেত্রী লক্ষ্মী রায়চৌধুরীর অভিযোগ, "পার্টি অফিস থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করার জন্য বহু অনুরোধ করলেও পুলিশ এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়নি।" এ-ব্যাপারে জেলার পুলিশ সুপার বীরেন্দ্র বলেন, "এই ঘটনার তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" (আনন্দবাজার, ০১.০১.০৩)

দৃশ্য - ১০

নিখোঁজ হওয়ার ৩৫ দিন পর বারো বছরের এক স্কুল ছাত্রীকে বাবা-মার হাতে তুলে দিল কল্যাণীর পুলিশ। রচিতা সেনগুপ্ত (১২) নামে ওই স্কুল ছাত্রীর বাড়ি কলকাতার বেহালায়। গত ১৫ ফেব্রুয়ারী স্কুলে যাওয়ার পর থেকেই সে নিঁখোজ ছিল। পরদিন রচিতার বাবা মানস সেনগুপ্ত বেহালা থানায় একটি মিসিং ডায়েরী করেন। গত ৫ মার্চ তিনি বিষয়টি ভবানী ভবনে রাজ্য সি আই ডি দপ্তরে জানান। কল্যাণী পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে এ ব্লকে ইতস্তত ঘুরতে দেখে সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা ওই বালিকাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাগে রচিতা ওরফে সোনাই জানায়, সে কিভাবে এখানে চলে এসেছে তার কিছুই জানে না। শুক্রবার রাতেই পুলিশ মানসবাবুর হাতে তার মেয়েকে তুলে দেয়। কিভাবে বালিকাটি কল্যাণীতে এসেছে পুলিশ খতিয়ে দেখছে। (বর্তমান, ২৩.০৩.০৩)

দৃশ্য - ১১

গত বছর যাকে কেন্দ্র করে মহাকরণ পর্যন্ত উত্তাল হয়ে উঠেছিল এবং যার হয়ে ন্যায্য বিচারের দাবীতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে যুব কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা ব্যানার্জী পুলিশের হাতে প্রহৃত হয়েছিলেন ফুলিয়ার সেই দীপালি বসাক হুগলির একটি বেসরকারী হোম থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সোমবার বিকেলে হোম কর্তৃপক্ষ নদীয়ার শান্তিপুর থানার ও সি-র সঙ্গে দেখা করে দীপালির এই বেপাত্তা হওয়ার ঘটনা জানিয়ে গেছেন। শান্তিপুর থানার পুলিশ খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছে। তবে ফুলিয়ার দীপালিকে পাওয়া যায় নি। দীপালি ফুলিয়ারই মেয়ে।

শুধু শান্তিপুর থানাকেই নয়, হোম কর্তৃপক্ষ কলকাতার তিলজলা থানাকেও এ ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে জানিয়েছেন। কারণ এই হোমে আসার আগে দীপালিকে রাখা হয়েছিল তিলজলার একটি বেসরকারী অনাথ আশ্রমে। গত বছর মূক ও বধির দীপালি বসাক সংবাদের শিরোনামে আসেন যখন তার মা ফেলানি বসাক অভিযোগ করেন, ফুলিয়ার এক সি পি এম নেতা তার মেয়েকে ধর্ষণ করে, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তা পরে অস্বীকার করে। ওই সময় দীপালি তিন মাসের অন্তসত্ত্বা ছিল। ফেলানি বসাকের অভিযোগ ছিল, স্থানীয় সি পি এমের নির্দেশে শান্তিপুর থানা তার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে চায় নি। এরপর নদীয়ার জেলা যুব কংগ্রেস ঘটনাটি জানায়

মমতা ব্যানার্জীকে। মমতা ব্যানার্জী ছাড়াও এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষী ব্যক্তির শাস্তির দাবীতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রও ফুলিয়ায় সভা করেন। দীপালির ব্যাপারে কথা বলার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মমতা ব্যানার্জী নিগৃহীতা হন।

দীপালিকে এই সময় ভর্তি করা হয় দক্ষিণ কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে। সেখান থেকে প্রথমে তিলজলার এবং পরে হুগলির একটি হোমে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়। ইতিমধ্যে তার একটি সন্তান হয়। দীপালির মা ফেলানি বসাকের অভিযোগ, তিলজলা থেকে তার মেয়েকে স্থানান্তরিত করার খবর তাকে জানানো হয় নি। তিনি তা পরে জানতে পারেন। সেখানে মেয়েব সঙ্গে দেখা করতেও যান। ওই সময় তিনি হোম সূত্রে জানতে পারেন, মেয়েকে এখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কয়েকজন তাকে বলেন, দীপালির এই হোমে প্রাণ সংশয় রয়েছে। তাকে বিভিন্নভাবে পরোক্ষে হুমকিও দেওয়া হচ্ছিল।

এদিকে নদীয়ার জেলা কংগ্রেস নেতা নরেন চাকী অভিযোগ করেছেন, দীপালির ধর্ষণেব মামলা এখনও চলছে। তাই দাপীলির এই অন্তর্ধানের পেছনে সি পি এমের হাত আছে। দোষীকে বাঁচানোর জন্যই এই পদক্ষেপ বলে তিনি মন্তব্য করেন।

দৃশ্য - ১২

গত ১৫ মার্চ গভীর রাতে সবং থানাব খলনেড্যা গ্রামে তিনজন সি পি এম কর্মী এক কংগ্রেস সমর্থক মহিলার শ্লীলতাহানি করেছে এবং তার গোপনাঙ্গে কিছু তরল বিষাক্ত পদার্থ ঢেলে পালিয়েছে। ঘটনার পর ওই মহিলা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রথমে তাকে সবং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সেখানে তিনি সুস্থ না হওয়ায়, তাকে বুধবার রাতে মেদিনীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সবং থানায় এই ব্যাপারে তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হলেও অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয় নি।

রবিবার ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি সৌমেন খান ও মেদিনীপুর পুর কমিশনার ভানুরতন ওই ব্যাপারে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন। জেলাশাসক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার আশ্বাস দিয়েছেন। এই ঘটনার পর খলনেড্যা গ্রামে উত্তেজনা দেখা দেয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত ও সি পি এম কর্তারা এখনও এই ঘটনার প্রতিবাদে মুখর না হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

রবিবার সদর হাসপাতালে যন্ত্রণাকাতর ওই মহিলা জানান, ৮ বছর আগে তার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গেছে। বছর সাতেকের মেয়ে ছাড়াও তার কোলে একটি শিশুকন্যা আছে। বাপ-মায়েরও অভাবের সংসার। বাবা কীর্তন গাইয়ে। মা মুড়ি ভেজে সংসার চালান। ওই মহিলা থাকেন হতদরিদ্র বাবা-মায়েরই ঘরে। ঘর বাড়ি বলতে দরমা, বাঁশ, টালি খড়ের চালা। সেখানেই থাকেন মেয়েকে নিয়ে। ওই মহিলার অভিযোগ, অভিযুক্তরা প্রায়ই তাকে বিরক্ত করত। কুপ্রস্তাব দিত। কিন্তু তাদের বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করতে তিনি কোনওদিন রাজি হননি। তাই তারা প্রায়ই তাকে শাসাত এই বলে যে কোনও সময় তাকে 'মজা দেখাবে।' এসব কথা তিনি পাড়ার লোকজনদের বলেছেন। কিন্তু কাজ হয়নি।

১৫ মার্চ রাত ১টা। মেয়েকে নিয়ে তিনি ঘুমিয়েছেন। ওই তিনজন ছুরি, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে। মহিলা আঁতকে ওঠেন। সাড়া দেননি। তারা তার ঘরের দরজা

ভেঙে ফেলে। একে একে ঘরে ঢোকে। তার শ্লীলতাহানি করে। ধর্ষণের চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি তাতে বাধা দেন। তাকে তারা কিল, চড় লাথি মারে। পরণের কাপড় খুলে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলে এবং জোর করে তার গোপনাঙ্গে তরল বিষাক্ত পদার্থ ঢেলে দেয়। ছুরি বুকে ধরে শাসায়, এই ঘটনা জানাজানি হলে তারা তাকে খুন করবে।

ছোটখাটো গড়ন। মোটা কাপড় পরিহিতা মহিলা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। তার বাবা-মা উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। বড় মেয়েটা মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছে। তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে। নিপীড়িতা ওই মহিলার প্রশ্ন, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি কি আর খাটতে পারব পেটের জন্য, আমার মেয়ের জন্য? (বর্তমান ১৫.০৩.০৩)

দৃশ্য - ১৩

ভবানীপুরে এক পরিচারিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। সরমা (৩৫) নামে ওই মহিলাকে শনিবার সকালে রান্নাঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মৃত্যুর কারণ জানা যায় নি। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

এলগিন রোডে শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতালের ঠিক সামনে ৬, হসপিটাল রোডে চৌধুরী পরিবারে ছ'মাস ধরে কাজ করছিলেন সরমা। রাতে ঘুমোতেন ওই বাড়িরই একটি রান্নাঘরে। এ দিন অনেক বেলা হয়ে যাওয়ার পরেও রান্নাঘরের দরজা খুলছে না দেখে ওই পরিবারেরই এক পরিচালক দরজায় ধাক্কা দেন। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় তা খোলা সম্ভব হয়নি। ওই পরিচালর বাইরের লোকজন ডেকে দরজা খোলেন। দেখা যায়, মাটিতে মাদুরের উপর পড়ে রয়েছেন সরমা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিন দুপুরে ওই বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, বিশাল বাড়িতে কেউ নেই। 'চৌধুরী পার্ক' নামে বাড়িটির গেট অর্ধেক বন্ধ। সামনে পাহারা দিচ্ছেন নীল রঙের ইউনিফর্ম পরা একাধিক রক্ষী। পরিচারকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তারা কেউই এই বিষয়ে মুখ খোলেননি। পুলিশ তদন্তের জন্য বাড়ির জিনিসপত্র করছে। বাড়িটির মধ্যে যে পরিবারের পরিচারিকা ছিলেন সরমা, সেই জয় চৌধুরী বা তার স্ত্রী বাড়িতে কেউ নেই বলে জানিয়ে দেন রক্ষীরা। তারাই জানান, রান্নাঘরে পাইপলাইনের গ্যাস লিক্ হয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সরমা মারা গিয়েছেন বলে তারা শুনেছেন। যে রান্নাঘরে সরমা থাকতেন, সেখানে গিয়ে দেখা যায় তখনও মাদুর পাতা। বাসনপত্র নিখুঁতভাবে গোছানো। তবে দরজার বাইরে থেকে গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। এক পরিচারক জানান, ওই বাড়িতে পাইপলাইনের গ্যাস ব্যবহার করা হয়। তিনি এও জানান, সরমা আগে ওই বাড়িতে অন্য এক ভাইয়ের কাছে কাজ করতেন। অন্যান্য রক্ষীরাও জানান, সরমা কারও সঙ্গে নিজে থেকে কথা বলতেন না। এলগিন রোডেরই মালা নামে এক মহিল সরমাকে ওই পরিবারে কাজে ঢুকিয়েছিলেন।

ভারপ্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রধান প্রদীপ সান্যাল বলেন, সরমা ছ'মাস হল ওই পরিবারে কাজে এসেছিলেন। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদে। মৃতার শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় নি। মৃত্যুর কারণ জানতে ময়না তদন্ত চলছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বাড়ির লোকদের। (আনন্দবাজার, ১৬.০২.০৩)

দৃশ্য - ১৪

২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই ফের খুনের ঘটনা ঘটল পাণ্ডুয়ায়। এ বার থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে নামাজগড়ে। বৃহস্পতিবার রাতে তৃতীয় শ্রেণীক এক ছাত্রীকে গলা টিপে খুন করে দুষ্কৃতীরা চম্পট দিয়েছে। শুক্রবার রাত পর্যন্ত পুলিশ এক জনকেও ধরতে পারেনি। এদিন সকালে খেতের মধ্যে তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে গ্রামবাসীরা পুলিশে খবর দেন। নিহতদের নাম নুরি খাতুন (৯)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এক মাস ধরে পাণ্ডুয়ার উরুসের মেলা চলছে। বৃহস্পতিবার বিকালে বাবাকে বলে নুরি মেলায় যায়। ভাগাড় পাড়ায় রেল কলোনির ঝুপড়িই তাদের বাড়ি। কিন্তু সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরে না আসায় বাড়ির লোক তন্নতন্ন করে গোটা পাণ্ডুয়া খোঁজে। সারারাত ছেলেদের নিয়ে স্থানীয় সিনেমাহল সহ অন্যান্য জায়গায় খুঁজে না পেয়ে সকলে বাড়ি ফিরে যান। এ দিন ভোরে স্থানীয় এক গ্রামবাসী মাঠে যান। তিনি মুখে গ্যাঁজলা ওঠা অবস্থায় নুরির নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোককে খবর দেওয়া হয়।

তদন্তকারী অফিসারেরা জানিয়েছেন, নুরির নাকে সোনার নথ ও কানে রুপোর দুল ছিল, সেইগুলি দুষ্কৃতিরা খুলে নিয়ে গিয়েছে। মাথার উলের টুপি ছিল। গলায় ছিল আঙুলেব ছাপ। গলা টিপেই সম্ভবত তাকে খুন করা হয়েছে। নুরির বাবা আবদুর রহমান কলকাতার একটি হোটেলে মালিশেব কাজ করেন। তিনি পুলিশকে জানান, মেলায় যাওয়ার আগে নুরি দুই টাকা চায়। কিন্তু না থাকায় তিনি টাকা দিতে পারেননি। তার পর এই ঘটনা ঘটল। কেন এই খুন তা এখনও অস্পষ্ট। (আনন্দবাজার, ০১.০২.০৩)

দৃশ্য - ১৫

চাকরির নাম করে প্রতারণা করার ব্যাপারে আপত্তি জানানোয় হুক কষে এক বৃদ্ধাকে খুন করা হয়েছে। তার ছেলেকেও গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে চন্দননগরের ফটকগোড়ার আপনজনপল্লীতে। পুলিশ জানায়, বৃদ্ধার নাম আরতি ভৌমিক (৬৫)। চন্দননগরের এস ডি পি ও অশেষ বিশ্বাস বৃহস্পতিবার বলেন, 'অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা গিয়েছে। তল্লাশি চলছে।"

পুলিশ জানায়, আরতি দেবীর বেকার ছেলে তুষার হুগলিরই এক যুবক ওই বাড়িতে যাতায়াত করত এবং কয়েক দফায় বেশ কয়েক হাজার টাকা হাতিয়েও নিয়েছে ওই যুবক। পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই যুবকের সঙ্গে তার এক সঙ্গীও তুষারের বাড়িতে আসত। ছেলে বারে বারে টাকা দিচ্ছে অথচ চাকরি হচ্ছে না, এই দেখে আরতি দেবী রাগারাগি করেন। সেই কথা পৌঁছে যায় ওই প্রতারকদের কানে।

পুলিশ জানায়, বুধবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ অভিযুক্ত যুবক আরতি দেবীর বাড়িতে আসে। তুষারকে সে বলে যে তার চাকরি পাকা হয়ে গিয়েছে। তাই বিভিন্ন পরীক্ষার ফলের প্রতিলিপি দরকার। চাকরি পাওয়ার কথা শুনে আনন্দে তুষার দোকানে চলে যান। সেই সুযোগে বৃদ্ধাকে প্রথমে গলা টিপে, পরে মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয় বলে পলিশ জানায়। ইতিমধ্যে তুষার বাড়ি ফিরে দরজায় টোকা মারেন। কিন্তু ভিতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে তিনি ধাক্কাধাক্কি করতে থাকেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ওই যুবক দরজা খুলে দেয়। তুষার ঘরে ঢুকতেই সে তাকে আক্রমণ করে ও জখম করে চম্পট দেয়। (আনন্দবাজার, ২৪.০১.০৩)

দৃশ্য - ১৬

বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না-হওয়ায় এক তরুণীর গায়ে অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছে দুই দুষ্কৃতি। অ্যাসিডে ঝলসে গিয়েছেন ওই তরুণীর মা-ও। দু'জনকেই সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে রাণাঘাট থানার বীরনগরের উত্তর পালিতপাড়ায়। উত্তেজিত জনতা দুই দুষ্কৃতীকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

পুলিশ জানায়, ওই তরুণী তার মায়ের সঙ্গে থাকেন। ওই দিন এক প্রতিবেশীর বাড়িতে কনে সাজিয়ে সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরে আসেন। তিনি যখন দরজা খোলার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে মা-কে ডাকছেন, তখন কালু ও গণেশ নামে দুই প্রতিবেশী যুবক পিছনে এসে দাঁড়ায়। হঠাৎই বালতি ভর্তি অ্যাসিড ওই তরুণীর গায়ে ঢেলে চম্পট দেয় তারা। অ্যাসিড ছিটকে এসে লাগে তার মায়ের শরীরে। ওই তরুণীর মুখ এতটাই পুড়েছে যে, প্রায় চেনাই যাচ্ছে না। পুলিশ জানতে পারে, ওই তরুণী এক প্রতিবেশীর ছেলেকে পড়ান। সেই বাড়ির ছেলে গণেশ তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি রাজি হননি। এর পরেই গণেশ ও তার বন্ধু কালু তাকে পুড়িয়ে মারার ছক কষে। ওই তরুণী ও তার মা চিকিৎসক ও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কোনও রকমে বিষয়টি জানান।

পার্থক্যটুকু স্বীকার করে নিলেই মঙ্গল

অভিনেত্রী চূর্ণী গাঙ্গুলির একটি সাক্ষাৎকার (সন্দীপ কর্মকারের নেওয়া) পড়েছিলাম 'বর্তমান'-এ। সেখানে ছোট্ট একটি বক্তব্যকে তিনি নারী-পুরুষের পার্থক্যটুকু চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

"মেয়ে বলে সমস্যা তো নিশ্চয় কিছু থাকে। সব তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যেমন বেশি রাত করে মেয়েরা বাড়ি ফিরলে বাড়ির লোকেরা চিন্তা করে। মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব সর্বত্র। কি সংসারে, কি ভালবাসায়, কি মননে। তবে অন্য দিক দিয়ে বলব যে, আমি নারী বলে খুব খুশী। মেয়ে বলেই আমি মা। কাজের শেষে কিন্তু আমার ছেলের মুখটাই মনে পড়ে। সত্যি কথা বলতে কি, শুনতে ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হলেও এটাই সত্যি যে, মা হবার সময়টা প্রেসাস পিরিয়ড অফ মাই লাইফ। মা-বাই একমাত্র বোঝে এটা। আপনারা পুরুষরা এটা ঠিক বুঝবেন না।"

'বর্তমান'-এ আরও একটি সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম। অভিনেত্রী মৌমিতা গুপ্তর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন সন্দীপ কর্মকার। মৌমিতা'র মতে একমাত্র মেয়েরাই পারে সংসারে পূর্ণতা আনতে। মেয়েরা কি আজও সমাজে অবহেলিত এ-প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ

"আমি মনে করি, কেউ একা কিছু নয়। পুরুষ ছাড়া নারী হয় না, নারী ছাড়া পুরুষ। নারীবাদ-টারীবাদ একদম বুঝি না। বুঝতে চাইও না। আমি মনে প্রাণে একজন মেয়ে। মেয়ে হয়েই বাঁচতে চাই। আফটার অল, মেয়েরাই তো সবচেয়ে বেশি রোমান্টিক হতে পারে, হতে জানে।" আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ "…. অবস্থার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নিই। আর সত্যি কথা কি জানেন, মেয়েরা যেহেতু মায়ের জাত তাই তাদের সইবার ক্ষমতাও বেশি।"

সন্দীপের কাছে তার এ-বক্তব্য মনে হয়েছিল প্রাচীনপন্থী মেয়েদের। তার জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ

"পন্থী-টন্থী জানি না, আমার নিজের কথাই বলছি। জিনস্ পরলাম, মদ্যপান করলাম, আর নতুন পন্থী হয়ে গেলাম? তার মানে আবার এও বলছি না যে, এসব যারা করে তারা বাজে লোক। সংসারে যা করি ভালবাসা থেকেই করি। আফটার অল ভালবেসেই তো সংসার গড়েছি। মেয়েরাই পারে সেটা সামলে

রাখতে। সুন্দর করতে।"

নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য আছেই তা সাংবাদিক সেমন্তি ঘোষ স্বীকার করেছেন এভাবে ঃ নারীর অধিকারের কথাই যখন তুললেন, তখন আবার অন্য একটা কথাও উঠে আসে না কি? দেখুন আমার মনে হয় আইনজীবীরা যে কথাটায় জোর দিতে চাইছেন সেটাও কিন্তু দরকারি পয়েন্ট, আর একটু তলিয়ে ভাবা উচিত। ওরা বলছেন যে, 'সম্মতি' আর 'শর্তসাপেক্ষ সম্মতি' আসলে এক জিনিস নয়। অর্থাৎ ছেলেটি ও মেয়েটি যখন মিলিত হচ্ছে, তাদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে একটা সম্মতির বাতাবরণ থাকছে। যেন দুজনেই সম্মত, দুজনেই ব্যাপারটা সমানভাবে চায়। আসলে কিন্তু দুজনে একই তলে নেই — এক জন শর্তনিরপেক্ষ, আর এক জন শর্তসাপেক্ষে। একটা শর্তের উপস্থিতি তো গোটা পরিস্থিতিটাকেই পাল্টে দেয়। মেয়েটি দৈহিক-মানসিক-সামাজিক ভাবে আলাদা তলে বিরাজ করে, তাই তার কাছে শর্তটা থাকা আর না-থাকার মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। ছেলেটি বিয়ে করবে জানা থাকলে সে সহবাসে সম্মত, আর বিয়ে না-ও করতে পারে জানা থাকলে পুরোপুরি অসম্মত। সহবাস তো কেবল সহ-বাস নয়, একটা আনন্দ, যাতে 'বিপদ'-এর সম্ভাবনা প্রবল। অথচ সেই বিপদটা কিন্তু সহ-বিপদ নয়, কেবল এক পক্ষের বিপদ। মাতৃত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই, পিতৃত্ব অস্বীকার করা ভারী সহজ। যতই ডি এন এ পরীক্ষা আসুক, আমাদের দেশ-গাঁয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার গুরুত্ব কতটুকু! এই জন্যই 'বিয়ে বিয়ে' করে মাথা খোঁড়া। এই জন্যেই আমাদের মেয়েদের কাছে যৌনতার আনন্দ ব্যাপারটা আসলে আকাশকুসুম। এতটা পার্থক্য যেখানে, সেখানে পুরুষের অধিকার আর নারীর অধিকার বা অংশীদারিত্ব কি একই হতে পারে? অধিকারের প্রেক্ষিতটা এত আলাদা, আমাদের সেটা মাথায় রাখতে হবে বই কী।

সংসারের প্রতি, নিজের প্রতি, মানুষের প্রতি নারীর একটি বাড়তি দায়িত্ব রয়েছে। কারণ তিনি মা। প্রাকৃতিক কারণেই তিনি পুরুষদের চাল চলনকে অন্ধভাবে অনুকরণ করতে পারেন না। গর্ভস্থ সন্তান কেমন হবে তা নির্ভর করে জন্মদাত্রী মায়ের চাল চলনের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ একটি বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার কথাই বলছি ঃ

মাঝরাতে বাচ্চার কান্নার সঙ্গে টি.ভি. সিরিয়ালের কোনও সম্পর্ক আছে? রাত-কাঁদা বাচ্চার সঙ্গে টেলি-সিরিয়ালের সম্পর্ক খুঁজতে যাওয়া কি দক্ষিণ আফ্রিকায় ঝড়ের ফলে বাংলাদেশে বাড়ি ধ্বংসের যোগাযোগ খোঁজার মতো ব্যাপার নয়?

ডাঃ এস এলাঙ্গোর মতে তা নয়। তাঁর কথায়, দুটি ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এটা বলে দিচ্ছে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা। তাতে দেখা যাচ্ছে, রাতে যে শিশু ঘনঘন কেঁদে ওঠে, সেই কান্নার সঙ্গে মা'র গর্ভাবস্থায় রোজ রাতে টি.ভি.'তে দুঃখের সিরিয়াল দেখার সম্পর্ক রয়েছে। অনেকক্ষণ সিরিয়াল দেখে ওই মহিলা গভীর রাতে শুতে যেতেন। ফলে মাতৃগর্ভে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটত শিশুর। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সেই শিশুই এখন রাতে ঘনঘন কেঁদে উঠছে। ডাঃ এলাঙ্গো এলেবেলে কেউ নন। তিনি তামিলনাড়ুর হেলথ সার্ভিসের ডেপুটি ডিরেক্টর। সমীক্ষাটি হয়েছিল তার নেতৃত্বে। এই কারণেই ওই স্বাস্থ্যকর্মীর সতর্কবাণী, নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের রাতে দুঃখের সিরিয়াল দেখা উচিত নয়। এই নিষেধাজ্ঞা তাদের অক্ষরে অক্ষরে পালন করা উচিত। না হলে শিশুর জন্মের পর রাতে বারবার কেঁদে ওঠার রোগ তার মধ্যে দেখা দেবে, বা তা দেখা দেওয়ার ঝুঁকি থেকে যাবে। কেন রাতেই ঘনঘন কাঁদে কোনও বাচ্চা? ডাঃ এলাঙ্গোর সমীক্ষার

বিবেচ্য ছিল এটাই। তার জন্য ৩৭ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের মধ্যে তিনটি দলকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। প্রথম দলের মহিলারা শিশুর জন্মের আগে ওই মুহূর্তে ফি রাতে দু'ঘন্টা করে টি.ভি. দেখতেন। দ্বিতীয় দলটির সদস্যরা দেখতেন মাত্র আধ ঘন্টা করে। আর তৃতীয় দলটির অন্তর্ভুক্তরা রাতে টি.ভি.-ই দেখতেন না। সমীক্ষায় দেখা গেল প্রথম দলের সদস্যাদের বাচ্চারা প্রতি রাতে কম করে ২০ বার ঘুম থেকে জেগে উঠছে এবং কখনো আস্তে, কখনো জোরে কেঁদে মাত করে ফেলছে বাড়ি। এমনকি মা কাঁথা পাল্টে, খাইয়ে দেওয়ার পরও তার কান্না থামছে না। আসলে এই বাচ্চাটি ভুগছে অদ্ভুত এক নিরাপত্তার অভাবে। রাতে কান্নার নেপথ্যে রয়েছে এটাই। আবার এই সব শিশুরা কিন্তু দুপুরবেলায় টুঁ শব্দ না করেই ঘুমোচ্ছে। কাউকে বিরক্ত করছে না। দ্বিতীয় দলটি অর্থাৎ যে সব ৩৭ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা ভাবী মায়ের দল রাতে আধ ঘন্টা টি.ভি. দেখতেন, তাদের শিশুরাও কাঁদছে। তবে আগেরগুলির মতো এত ঘনঘন নয়। কাঁথা পাল্টে, খাইয়ে দেওয়ার পর ফের ঢলে পড়েছে ঘুমে। আর শেষের দলের মহিলাদের ক্ষেত্রে এই কান্নার সমস্যা প্রায় নেই। দিনেও ওই সব বাচ্চার বারবার কান্না আসছে না। (বর্তমান ০৪/০৮/০৩)

'স্ত্রী শিক্ষা' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নরনারীর পার্থক্য সুন্দরভাবে চিহ্নিত করেছেন ঃ

"কিন্তু মানুষকে পুরো পরিমাণে মানুষ করব এ-কথা আমাদের সকলের অন্তরের কথা নয়। যখন সর্ব সাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয় তখন এক দল শিক্ষিত লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথা হইতে? বোধ হয় শীঘ্রই এ-সম্বন্ধে রসিক লোকে প্রহসন লিখিবেন যাহাতে দেখা যাইবে — বাবুর চাকর কবিতা লিখিতেছে কিংবা নক্ষত্রলোকের নাড়ীনক্ষত্র গণনা করিবার জন্য বড়ো বড়ো অঙ্ক ফাঁদিয়া বসিয়াছে, বাবু তাহাকে ধুতি কোঁচাইবার জন্য ডাকিতে সাহস করিতেছেন না পাছে তার ধ্যানের ব্যাঘাত হয়। মেয়েদের সম্বন্ধেও সেই এক কথা যে, তারা যদি লেখাপড়া শেখে তবে যে ঝাঁটা বঁটি ও শিলনোড়া বাবুদের ভাগে পড়ে।"

"বিধাতা এক দিন পুরুষকে পুরুষ এবং মেয়েকে মেয়ে করিয়া সৃষ্টি করিলেন, এটা তাঁর একটা আশ্চর্য উদ্ভাবন, সে কথা কবি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবতত্ত্ববিদ্ সকলেই স্বীকার করেন। জীবলোকে এই যে একটা ছেদ ঘটিয়াছে এই ভেদের মুখ দিয়া একটা প্রবল শক্তি এবং পরম আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। মেয়েরা যদি বা কান্ট-হেগেল্ও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর-ছাই করিবে না।"

"মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র হইয়াছে। আজকাল বিদ্রোহের ঝোঁকে এক দল মেয়ে এই গোড়াকার কথাটাকে অস্বীকার করিতেছেন। তাঁরা বলেন, মেয়েদের ব্যবহারের ক্ষেত্র পুরুষের সঙ্গে একেবারে সমান।

এটা তাঁদের নিতান্তই ক্ষোভের কথা। ক্ষোভের কারণ এই যে, পুরুষ আপন কর্মের পথ ধরিয়া জগতে নানা বিচিত্র ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে, কিন্তু মেয়েদের কর্ম যেখানে সেখানে অধিকাংশ বিষয়ই তাহাদিগকে দায়ে পড়িয়া পুরুষের অনুগত হইতে হইয়াছে। এই আনুগত্যকে তাঁরা অনিবার্য বলিয়া মনে করেন না"

"এতদিনের মানবের ইতিহাস যদি এই কথাটাই সর্বদেশে সপ্রমাণ হইয়া থাকে যে দাসীত্ব মেয়েদের স্বাভাবিক, তবে পৃথিবীর সেই অর্ধেক মানুষের লজ্জায় সমস্ত পৃথিবী আজ মুখ তুলিতে পারিত না। কিন্তু, আমি বলি, বিদ্রোহী মেয়েরা স্বজাতির বিরুদ্ধে এই যে অপবাদ ঘোষনা করিয়া বেড়াইতেছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আসল কথা এই, স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব, দাসী হওয়া নয়। ভালোবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে — এ নহিলে সন্তান মানুষ হইত না, সংসার টিকিত না। স্নেহ আছে বলিয়াই মা সন্তানের সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই; প্রেম আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই।"

"মেয়েরা স্বভাবতই ভালোবাসে এবং একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের আদর্শকেই সামাজিক শিক্ষায় তাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে। এই সুবিধাটুকু ধরিয়া অনেক স্বার্থপর পুরুষ তাদেব প্রতি অত্যাচার করে। যেখানে পুরুষ যথার্থ পৌরুষের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট সেখানে মেয়েরা আপন উচ্চ আদর্শের দ্বাবাই পীড়িত ও বঞ্চিত হইতে থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে যত বেশি এমন আর কোনো দেশে আছে কিনা সন্দেহ করি। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথাটাকে উড়াইয়া দেওযা যায় না যে, সমাজে মেয়েরা যে ব্যবহারের ক্ষেত্রটি অধিকার করিয়াছে সেখানে স্বভাববশতই তাবা আপনিই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বাহিরে কোনো অত্যাচার তাহাদিগকে বাধ্য করে নাই।

একথা মনে রাখিতে হইবে সমাজে পুরুষের দাসত্ব মেয়েদের চেয়ে অল্প নহে, বরঞ্চ বেশি। ...... রাজতন্ত্রে বাণিজ্যতন্ত্রে এবং সমাজের সর্ববিভাগেই দাসের দল প্রাণপাত করিয়া সমাজ-জগন্নাথের প্রকাণ্ড রথ টানিয়া চলিতেছে। .... সমস্ত আজীবন দিনের পর দিন এমন দায বহন করিতেছে যাহার মধ্যে প্রীতি নাই, সৌন্দর্য নাই। এই দাসত্বের বারো আনা ভাগ পুরুষেব কাঁধে চাপিয়াছে। মেয়েদের ভালোবাসাব উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে এই জন্য মেয়েদেব দায় ভালোবাসার দায়। পুরুষের শক্তির উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এই জন্য পুরুষের দায় শক্তির দায়। অবস্থাগতিকে সেই দায় এত অতিরিক্ত হইতে পারে যাহাতে ভালোবাসা উৎপীড়িত হয় ও শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। তখন সমাজের সংস্কার আবশ্যক হয়। .... পুরুষ পুরুষই থাকিবে, মেয়েরা মেয়ে থাকিয়া যাইবে বলিয়াই তার সংকটে সহায়, দুরুহ চিন্তায় অংশী এবং সুখ দুঃখের সহচারী হইয়া সংসারে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।" (রচনাবলী, ১৪ খন্ড, পঃ বঃ সবকাব, ১৩৯৮)

আমার অভিজ্ঞতা

এই অধ্যায় আমার 'সখি ভালবাসা কারে কয়', ২য় খন্ড (অপ্রকাশিত) থেকে নেওয়া।

শম্ভুদার কাছ থেকে একটা ঘটনা শুনেছিলাম। শুভ তার খুবই পরিচিত। খুবই আড্ডাবাজ এবং ফূর্তিবাজ ছেলে। ভাল চাকরীও করে। অফিসের পর ধর্মতলা চলে যেত। কখনো ইংরেজি সিনেমা দেখতো, কখনো ভাল একটা রেস্তারায় ভাল খাওয়া দাওয়া সেরে রাতের দিকে বাড়ি ফিরত। সে-দিন ছিল বাদলা দিন। বৃষ্টি থামে না কিছুতেই। দাঁড়িয়েই থাকে, দাঁড়িয়েই থাকে। হঠাৎ তলপেটে চাপ আসে। বেশ কিছুক্ষণ সহ্য করে সে চাপ। শেষ পর্যন্ত পারে না। এত বিশ্রি রকম সমস্যায় পড়ে তার ত্রাহি রব। হঠাৎ দেখে একটা ঘোড়ায় টানা রথ দাঁড়িয়ে আছে। সহিসকে কাল বিলম্ব না করে জিজ্ঞেস করল - যাবে হাওড়া ষ্টেশন? ভাড়া যা চাইল তা অযৌক্তিক ভাবে বেশি হলেও উঠে পড়ল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পেছনে বসার জায়গাটা পলিথিন দিয়ে ঢাকা ছিল। চুপি চুপি কাজ সারতে অসুবিধা হল না। হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছতেই দিব্যি ভাল মানুষের মতো নেমে পড়ল। ভাড়াটা দিতে দিতে বলল - 'যা উপকার করলে আমার! কী বলে যে ধন্যবাদ দেব।' সহিস কিছু বুঝে ওঠার আগেই চম্পট দিল।

শুভ'র সব রকমের বদ নেশাই ছিল। মাঝে মধ্যে সন্ধ্যের পর বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম চত্বরে গিয়ে দাঁড়াত। এক জন মহিলাব সঙ্গে আলাপ করল। ঠিক হল মহিলা তার ঘরে নিয়ে যাবে। এ-রকম সুযোগ'ত সহজে পাওয়া যায় না। বেশ হৃষ্টচিত্তে মহিলার সঙ্গে যাত্রা করল তার টালিগঞ্জের বাড়ীতে।

বস্তি এলাকা, কোন মতে মাথা গুঁজে থাকে। ঘরে ঢুকতেই দেখে তক্তপোষে শুয়ে আছে এক জন। একটা আট দশ বছবের মেয়ে, আর একটা চার পাঁচ বছর বয়সী ছেলে। জিজ্ঞেস করে -- এরা কারা?

— আমার ছেলে মেয়ে।

— তুমি বিবাহিতা?

— হ্যাঁ, ঐ যে শুয়ে আছে আমার স্বামী।

পাশের ঘরে ঢুকেই মেয়েটা বলে বসুন বাবু। একটা তক্তপোষ। তাতে পাতা সাধারণ একটা চাদর। 'তোমার স্বামী শুয়ে আছে যে!'

— স্বামী অসুস্থ। যক্ষ্মা রোগে ভুগছে। কখন মারা যায় ঠিক নেই। দু'এক বাড়ি কাজ করি। তাও চিকিৎসার খরচ যোগাতে পারি না।

শুভ যেন আকাশ থেকে পড়ে। 'তোমার আর কে কে আছে?'

— দেখবার মতো আর কেউ নেই।

হঠাৎ যেন শুভ'র কান্না পায়। দু'চোখ ভিজে ওঠে উষ্ণ জলে। রুমাল দিয়ে চোখ দুটো

মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। আসবার সময় অবশ্য অল্প বয়সী মেয়েটার হাতে এক'শ টাকার একটা নোট গুঁজে দিয়ে আসে।

সমাজে এ-রকম মহিলা অসংখ্য। এরা দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আধুনিক সমাজ এদের কি চোখে দেখে তা জানিনা। হয়তো ঘৃণ্য অপাংক্তেয় ভাবে। কিন্তু, পাশে গিয়ে দাঁড়ায় কি?

ও-পাড়ায় থাকতাম। কানে এসেছিল একটা মেয়ে, মোটামুটি লেখাপড়া জানা, পুরুষেব মনোবঞ্জন করে বেড়ায়, অবশ্য অর্থের বিনিময়ে। বাবা নেই, ছোট ভাই বোন, কোন রকম কাজকর্মও একটা জোটাতে পারে নি। দু'এক বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতো। সংসারটাকে টেনে নিতে হবে যে কোন উপায়ে। কিন্তু,একদিন এক বাড়ীর বড়ো ছেলে সুযোগ বুঝে তার ওপব ঝাঁপিয়ে পড়ে, পাশবিক অত্যাচার করে। ঝি'এর কাজ করতে গিয়ে যদি এ-ভাবে নিজেকে সঁপে দিতে হয় তাহলে সরাসরি ও-কাজে নেমে পড়াই ভাল। একটু চোখের ঈশারাতেই মোটা টাকা আসবে।

মেয়েটাকে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। শেষ পর্যন্ত একই পাড়ার একটা মেয়েকে পড়াবার সুযোগ পেলাম। শুভেন্দু ডিফেন্স একাউন্টসে কাজ করে। আমার সঙ্গে খুব ভাব। একদিন বলল ঃ 'পরমেশদা আমার বোনটাকে পড়াতে পারবেন? ইংরেজিতে কোনো মতেই পাশ করতে পারছে না। বার বার ফেল করছে। আপনাব'ত মোটামুটি সুনাম আছে। যদি একটু পড়ান। 'কোন ক্লাসের'? হায়ার সেকেন্ডারী? না মাধ্যমিক?

— হাযার সেকেন্ডারী।

— কথা মতো চললে অবশ্যই পাশ করে যাবে।

— সে জন্যই'তো আপনাকে বলছি। গতবার কলকাতা গিয়ে পড়তো এক প্রফেসরেব কাছে। তাও পারল না।

— ঠিক আছে সামনের মাস থেকে আসব।

একদিন জিজ্ঞেস করলাম - তার পাড়ার ও-মেয়েটির কথা। ও, উর্মিলা দি, খুব চিনি।' এর উত্তর দেওয়ার ধরণ দেখে মনে হল দু'জনের মধ্যে খুব ভাব।

এ সখ্যতার কারণ কি? এ-অন্যায় কৌতূহলটা আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। শেষ পর্যন্ত এ-কথা সে-কথা বলতে বলতে ওর মনের কথা বের করে ফেলি। মাঝে মধ্যে উর্মিলাদির সঙ্গে বের হয় পয়সার লোভে। বিশেষ করে অবাঙ্গালী বেওসায়ী যুবরকরাই তাদের টার্গেট। যা রোজগাব করে তা দিয়ে দামী দামী জিনিস কেনে, ইচ্ছে মতো খরচা করে। দাদার কাছ থেকে সামান্য যা পাওয়া যায়, আর ফ্যামিলি পেনশন-ভোগী মাকে পটিয়ে যা কিছু আদায় করা যায় তাকে হাত ডুববে'ত থাক আঙুলও ডোবে না।

সস্তা পয়সার লোভে এ-ভাবে মেয়েরা নিজেদের পবিত্র-দেহ মন্দিরটাকে সস্তা করে তোলে। ভোগবাদী সভ্যতায় ভোগসর্বস্ব জীবনে এর চেয়ে আর বেশি কি আশা করা যেতে পারে। এ-বিশ্বায়নের যুগে নগ্ন কিংবা অর্ধ-নগ্ন দেহটাকে যখন অতি লোভনীয় পণ্য হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে তখন'ত এর থেকেও বেশি কিছুর জন্য তৈরি থাকতে হবে মানব সমাজকে। বিশ্বায়নের যুগের শুরুতেই আমাদের সমাজে মেয়েদের যে-ভাবে ভয়ঙ্কর রূপে বিবৃত করেছেন প্রাতঃস্মরণীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী তাতে আঁৎকে উঠতে হয় ঃ

''আমি সমগ্র ভারতবর্ষ, ইউরোপ আর ব্রিটেন ঘুরে এসেছি। ব্রিটেন ও ইউরোপের

বেশ্যাবৃত্তির সঙ্গে ভারতে প্রচলিত গণিকাবৃত্তির পার্থক্য রয়েছে। ভারতীয় সমাজের শতকরা আশিভাগ মেয়েই বর্তমান বেশ্যায় পরিণত হয়েছে। এর জন্য প্রধানত দায়ী মা ও বাবা। সর্বস্তরের মানুষ এর সঙ্গে জড়িত। অবৈধ যৌনবৃত্তির জন্য মেয়েদের ঘৃণা করা হয়। কিন্তু যে-সব পিতা মাতা নিজেদের মেয়েদের নানান রকমের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও ভীতি প্রদর্শন করে এই যৌনব্যবসায়ের পথে এনেছেন এরা ঘৃণিত নন কেন? মেয়েরা শতকরা ৫০ ভাগ এবং পুরুষরা শতকরা ২০ শতাংশ যৌন রোগী। অবৈধ যৌন ব্যবসার শাখা প্রশাখা বহুদূর বিস্তৃত। অনেক জায়গায় অনেক ঘরে গোপনে নারীর নগ্ন দেহ প্রদর্শনের ব্যবসাও চলছে। ছোট হোটেলে কম টাকা ও বড় হোটেলে লক্ষ টাকাতে সারা বছরের জন্য পিতা মাতা নিজের মেয়েকে বিক্রয় করে দেবার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। রাতারাতি এ-সব হোটেলের মালিক এসব মেয়েকে যথেচ্ছ শোষণ করে কোটিপতি হয়ে পড়েছেন। শোষণ-বিরোধী রাজ্য বলে পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য ও সুনাম থাকলেও যৌন ব্যবসা সম্পর্কে অধিকাংশই মৌনতা অবলম্বন করে আছেন কেন? সমাজ ধ্বংসের এই ভয়াবহ অবক্ষয়ের সময় এই মৌনতা কাপুরুষতারই নামান্তর। অন্যদিকে সব জেনেও গোয়েন্দা ও পুলিশ বিভাগ চুপ করে আছেন কিসের জন্য? .... নিজের কন্যাকে নগ্ন করে কিছু ক্ষুধার্ত নেকড়ের মুখে ছেড়ে দিয়ে যারা সমাজে আদর্শের কথা বলেন, অন্যের সমালোচনা করেন, তাদেরকেও শিল্পি সাহিত্যিকরা আজ সর্বসাধারণের সামনে নগ্ন করুন। এই সব অর্থবান ও অর্থলোভী পিশাচ পিতা মাতা ও ক্ষমতাবান লোক এবং সমাজবিরোধীদের আসল রূপ সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে শিল্পি ও সাহিত্যিকগণ এগিয়ে আসুন।' — ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী, কলকাতা, বর্তমান ১০.০৬.৯১।

যতই নারী প্রগতিশীল (তথাকথিত) বাড়ছে, নারী-মুক্তির নামে যতই সংগঠন জন্ম নিচ্ছে, ততই মিটিং মিছিল বাড়ছে ততই তলে তলে নারীমেধ যজ্ঞ অধিক মাত্রায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজকাল সবই বড় বড় বুলিসর্বস্ব। বুলির আড়ালে স্বার্থসিদ্ধি। যতই দুর্নীতি দুর্নীতি করে সোরগোল তোলা হচ্ছে, ততই দুর্নীতি বেড়ে যাচ্ছে। নারী মুক্তি আর নারীপ্রগতির নামে যারা মুখর, তারাই নারীদের শোষণ করছে, নারী পাচার করছে, শিশুকন্যা বিক্রি করছে, অসদুদ্দেশ্যে। দুঃস্থা মেয়েদের জন্যে যে-সব আশ্রয় স্থল গড়ে উঠছে সেখানেও নারী নিরাপদে নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রক্ষকরাই ভক্ষক।

তাই একবিংশ শতকে প্রবেশ করেও ভারতীয় নারীদের কী হাল হয়েছে! দিন দিন বেড়ে চলেছে নারীর ওপর অবিচার, অত্যাচার, হত্যা, ধর্ষণ প্রভৃতি ঃ

	১৯৯৬	১৯৯৮
বধূহত্যা	৫,৫১৩	৬,৯১৭
ধর্ষণ	১৪,৮৪৬	১৫,০৩১
নির্যাতন	৩৫,২৪৬	৪১,৩১৮
শ্লীলতাহানি	২৮,৯৩৯	৩১,০৪৬
যৌন নির্যাতন	৫,৬৭১	৮,১২৩

এ-সংখ্যাগুলো কিন্তু বাস্তবে যা ঘটছে তার তুলনায় অনেক কম। অনেক ঘটনাই'ত প্রকাশ পায় না। জাতীয় মহিলা কমিশনের হিসেব মতে প্রতি ২৬ মিনিটে একজন মহিলার শ্লীলতাহানি ঘটে; প্রতি ৫৪ মিনিটে একজন মহিলা ধর্ষিতা হন; প্রতি ৪৮ মিনিটে একটা ইভটিজিং-এর ঘটনা

ঘটে। প্রতি ৪ মিনিটে একজন মহিলাকে অপহরণ করা; প্রতি ১০ মিনিটে একজন মহিলাকে পুড়িয়ে মারা হয়; প্রতি ৩৩ মিনিটে একজন মহিলাকে নিষ্ঠুরতার শিকার হতে হয়; প্রতি সাত মিনিটে একটা নারীঘটিত অপরাধ ঘটে থাকে।

এসবের মধ্যে কিন্তু আত্মীয় স্বজনদের হাতে অত্যাচারিত হওয়ার সংখ্যা ধরা হয় নি। দিল্লী কেন্দ্রিক এক মহিলা সঙ্গটনের হিসেব মতে এর শতকরা হিসেব ৮৭.৪। এ-সব পারিবারিক ব্যাপার পরিবারেই সীমাবদ্ধ থাকে, পুলিশ পর্যন্ত গড়ায় না।

দিন পনেরো আগে কামারহাটিতে ঘটে গেল একটা ধর্ষণের ঘটনা। অভিযুক্ত এক যোগাশ্রমের অধ্যক্ষ। যোগপ্রেমিকদের কাছে খুবই প্রিয় ওই আশ্রম। আশপাশের ছেলে মেয়েরা ভীড় জমায় ওখানে। একদিন এক যুবতী অভিভাবকদের নিয়ে স্থানীয় থানায় নালিশ জানালো আশ্রমের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে। নিজের শোয়ার ঘরে ধ্যান মন্ত্র দেবেন বলে ডেকে নিয়ে গিয়ে আরও হিপ্‌নোটাইজ করে নাকি তার সতীত্ব হরণ কবা হয়। মেয়েটার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরও তিনটি মেয়ে। ওরাও নালিশ করে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে তাদের সঙ্গেও। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে আশ্রমের অধ্যক্ষকে।

অধ্যক্ষ মহোদয় যোগী পুরুষ, তিনি কি সত্যিই অপরাধী? ভেতরের ব্যাপার হলো, আশ্রমের কয়েক জন সন্ন্যাসী কিছু দুষ্ট চক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আশ্রমের বিশাল জমিজমা আত্মসাৎ করতে চান, তুলে দিতে চান প্রমোটরের হাতে। অধ্যক্ষ বাজি হন না কিছুতেই। তাই তাকে হেনস্থা করবার জন্যই এ-ষড়যন্ত্র।

আর একটা ঘটনার কথা জানি। ঘটেছিল আমাদের এলাকাতেই। ভদ্রলোক স্কুল শিক্ষক। এ.বি.টি.এ.'র সঙ্গে ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। এক সময় রাজ্য সরকার ঠিক করলেন -- শিক্ষকদের অবসরের বয়স পঁয়ষট্টি থেকে কমিয়ে ষাট করবেন। শিক্ষক মহল ক্ষেপে গেলেন এ সিদ্ধান্তে। আন্দোলন শুরু হল। উপরোক্ত ভদ্রলোক সারাজীবন বামপন্থী আন্দোলন করলেও, বামপন্থী সরকারের দৃঢ় সমর্থক হলেও বন্ধু সবকারেব এ-সিদ্ধান্ত কিন্তু তিনি মেনে নিতে পারলেন না। তিনিও আন্দোলনের সামিল হলেন। পার্টি থেকে তাকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হল অনেক। কিন্তু তিনি পথ আগলেই রইলেন। এতে পার্টি রেগে গেল তার ওপর।

শিক্ষক ভদ্রলোক ছাত্র-ছাত্রী পড়াতেন বাড়ীতে। আজকাল সব শিক্ষকই পড়ান, ক্লাসে না পড়িয়ে বাড়ীতে পড়ান। একদিন সকালে একটি মেয়ে এসে কড়া নাড়ে। দরজা খুলে শিক্ষক মহাশয় বেরোলেন 'কী ব্যাপার?' 'স্যার, আমাব বোন আপনার কাছে পড়বে। আপনার পড়ার ঘরে চলুন না স্যার ওখানেই কথা হবে।'

— কিন্তু, আমি'ত এখন ছাত্রছাত্রী নিচ্ছি না। এখন'ত বছরের অর্ধেক কেটেই গেল।

— আসুন না স্যার, বলতে বলতে পড়ার ঘরে ঢুকে গেল মেয়েটি।

ভদ্রলোক একটু আশ্চর্য হয়ে তার পিছু পিছু গেলেন। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে মেয়েটি। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা কেউ আসে নি।

দরজা বন্ধ করেই ও ব্লাউজের কয়েকটা বোতাম খুলল, তার পর যত জোরে চেঁচাল - 'বাঁচাও, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!'

ক্যাডাররা সব বাইরে তৈরি ছিল। চীৎকার শুনেই ঝাঁপিয়ে পড়ল বাড়ীটার ওপর। টেনে

হিঁচড়ে তাকে ঘর থেকে বের করে রাস্তায় নামালেন। ভদ্রলোক এ-সবের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। পাড়া পড়শীরা সব ভীড় জমিয়েছে বাড়ীর সামনে। মেয়েটি বিব্রস্ত্র বেশে কাঁদছিল। সুশৃঙ্খল ক্যাডার বাহিনী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল এ-চরিত্রহীন লোকটিকে আপনারা পাড়ায় রেখেছেন? তাড়িয়ে দিন, তাড়িয়ে দিন। আপনাদের মা বোনের ইজ্জৎ নিরাপদ নয় এ-বদ্‌মাশ লোকটির হাতে।

পাড়ার কয়েকজন স্ত্রীলোক বলে ওঠে - ওমা, তাই নাকি। জানতামই না'ত! মাষ্টার মশায় এ-রকম! বুড়ো বয়সে মতিভ্রম হয়েছে!

পাড়ার প্রায় কেউ-ই জানে না পার্টির সঙ্গে তার ঝগড়ার কথা। তাই, শিক্ষক মহাশয়কে জনসমক্ষে হেনস্থা করার পূর্বপরিকল্পিত জঘন্য ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে কেউ কোন সন্দেহ করতে পারে নি। পরে অবশ্য সব কিছু ফাঁস হয়ে যায়।

এযুগে নারী জাতির অবস্থা খুবই সঙ্গীন। এরা নিজেদের ভোগ্যবস্তু হিসেবে গণ্য করে, পয়সার লোভে নিজেদের বিক্রি করে, এ মানসিকতার জন্যই পুরুষরাও তাদের শুধু ভোগ্যবস্তু হিসেবেই গণ্য করে। তাদের প্রতি যে সম্মান, যে শ্রদ্ধা, তা কয়জন পুরুষের আছে।

সে-দিন সাগরের শালী এসেছিল তার এক বান্ধীকে সঙ্গে নিয়ে। সাগরের বাড়ী যেতেই ওদের সঙ্গে দেখা। আলাপ ছিল আগেই। তাই বায়না ধরল ঃ দাদা, একটু ফোন করা যাবে?

— ফোন করবে? কোথায়?

— বন্ধুর কাছে ফোন করব।

শালির আবদার শুনেই সাগর আমার দিকে তাকায়। মুখে হাসি। অর্থাৎ সেও কামনা করে আমি ওর আদরের শালীকে ফোন করার সুযোগ করে দিই। তাই আসবার সময় বলে আসলাম নিয়ে এসো তাহলে।

ওদের আর তর সয় না। পাশের বাড়ি থেকে আমার পিছু নেয়। সঙ্গে সাগর। ওর খুব উৎফুল্লচিত্ত।

— তোমার বান্ধবী কি করে ববিতা?

— ও আমার সঙ্গেই পড়ে।

— বারো ক্লাসে?

— হ্যাঁ।

— কে ফোন করবে? তুমি, না ও?

— আমি করব। ও আবার কি ফোন করবে?

ববিতা খুবই চনমনে। আগে এমনটি ছিল না। মাধ্যমিক পাশ করে কলেজে ঢোকার কিছুদিন পর থেকেই দিন দিন ওর উন্নতি ঘটেছে। কথা বলার সময় শুধু ঠোঁট দুটোই নড়ে না, চোখ নাক, পুরো মুখটাই যেন মুখর হয়ে ওঠে। বান্ধবীটা মোটাসোটা, চলেফেরায় ধীর, কেমন যেন গোবেচারা ভাব। ববিতা যেন ঘোড়া, ও যেন রথ। ঘোড়া না চললে রথ চলে না।

ববিতা ফোন ধরে। ঝরে কথার ফুলঝুড়ি। গলাটা নীচু রাখতে চায় সযত্নে। কিন্তু, মাঝে মাঝে বড় শোনায়। কি বলে তা শোনার কৌতূহল তাই কান পেতে থাকি।

ববিতা ফোন ছাড়েনা। কথা বলছে'ত বলছেই। উৎসুক হয়ে ওর কাছাকাছি পায়চারী করি। হঠাৎ কানে এল বিকেল পাঁচটা, ও কিন্তু বাড়ী থেকে বেরোতে পারে না। আজ সুযোগ পেয়েছে।

আমারও কিছু পয়সা কড়ি দরকার।

ওর পয়সাকড়ি দরকার! কিন্তু, ওর বাবা'ত ফুড করপোরেশনে কাজ করে। বাড়ীতে মা, আর ছোট ভাই। ওদের'ত ভাল অবস্থা। তাহলে?

মনে মনে ভাবি। কিন্তু, এখনকার মেয়েদের কি আর অল্প হাত খরচায় চলে। মা বাবা'ত অকারণে অনাবশ্যক পয়সা তুলে দেবে না হাতে। তাই'ত নিজের কিছু রোজগার দরকার , সে যে করেই হোক।

ছ'সাত মিনিট পর ফোন ছাড়ে ববিতা। খুব উৎফুল্ল ভাব। বান্ধবীকে বলল ঃ তোর কাজটা হয়ে গেল।

— তোর হয়নি?

— আমার না হলে তোর হবে নাকি? একা পারবি সামলাতে? কী বোকা বোকা কথা।

মেয়েটি চুপ করে থাকে। তবে কিছু প্রাপ্তির আশা চোখে মুখে। আমি ববিতাকে বললাম ঃ অবাঙ্গালী বন্ধু মনে হচ্ছে।

— বাঙ্গালীদের হাতে পয়সা আছে নাকি? হঠাৎ ফস্ করে কথাটা বলে ফেলে নিজেই নিজের মুখটা চেপে ধরে ববিতা।

— কী হল? বন্ধুদের সঙ্গে মিশবে তাতে পয়সার প্রশ্ন কেন।

— না, মানে এমনি। এই রেষ্টুরেন্টে বসব, খাব দাব, ট্যাক্সিতে ঘুরে বেড়াব, পয়সা লাগবে না?

— ও, তাই বল। পয়সা না থাকলে'ত ফূর্তি করা যায় না।

— তোমার বান্ধবীর বাড়ীতে কে আছে?

— মা আর ছোট ভাই। ওর মা ও'কে একদম ভালভাসে না। খালি মারে। যত আব্দার ছেলেকে নিয়ে।

— কি করেন ওর মা?

— ঘর ভাড়া পায় আর পেনসন।

— বাবা কোথায় কাজ করেন?

— ফুড করপোরেশনে। রিটায়ারমেন্টের আগেই মারা গেছে।

— তাহলে'ত ওর মা'র প্রচুর টাকা।

— হুঁ থাকলে কি হবে, মেয়ের হাতে একটি পয়সাও দেয় না।

— কলেজে যাওয়া আসার খরচা?

— কলেজ'ত বাড়ীর কাছেই।

— ও, হীরালাল পাল কলেজে পড় তোমরা।

— হ্যাঁ, কিন্তু টিফিন খরচা পর্যন্ত দেয় না, বলে বাড়ী ফিরে খাবি।

— কিছু'ত একটা হাত খরচা চাই বলুন, আমারও'ত সখ আহ্লাদ আছে।

এতক্ষণ পর মেয়েটি মুখ খোলে। ক্ষোভের বর্হিপ্রকাশ।

আমি দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললাম - তা'ত ঠিকই। মনে মনে ভাবলাম 'তা বলে দেহ বিক্রি করে!'

জানেন একটু টের বেটের হলে ওর মা ওকে যখন তখন মাবে।

— না, এটা ঠিক নয়। মেয়ে বড়ো হয়েছে। মারা ঠিক নয়।

— ওকে বাড়ী থেকে বেরোতে দেয় না। আমি অনেক কায়দা করে, মিথ্যে কথা বলে বের

করে নিয়ে আসি।

— হ্যাঁ, শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজাতে ওস্তাদ তুমি।

— আচ্ছা, পরমেশদা, আপনি'ত একা আপনার কোন বান্ধবী নেই?

— না।

— কি করে থাকেন একা? নিশ্চয়ই আছে। বৌ নেই, ছেলেমেয়ে নেই, বান্ধবী নেই। এভাবে কেউ বাঁচতে পারে নাকি! বিশ্বাস হয় না।

— একা থাকতে'ত বেশ ভালই লাগে। একা থাকবার চেষ্টা করেছ কোন দিন?

— না, একা থাকব কি করে। আমার'ত মা, বাবা ভাই সবাই আছে। আর আছে অনেক বন্ধু বান্ধবী।

— তাই'ত বলছি একটু একা একা থাকতে অভ্যেস কর। নিজের সঙ্গে নিজে থাকবে না, নিজের সঙ্গে নিজে একটু কথা বলবে না? আপন মনে বসে বসে গাছপালা পশুপাখী, আকাশ বাতাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবে না?

— এ-সব আবার কি কথা। এ-সব কবিদের কথা বুঝি না বাপু।

— কবিদের কথা নয়। জানালার বাইরে দৃষ্টি পাঠিয়ে বসে থাকার চেষ্টা করো কিছুক্ষণ তাহলেই বুঝতে পারবে।

— আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। আপনার কথা শুনলে মাথা ঘুরে যায়, বাপরে বাপ। আর কিছুক্ষণ থাকলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। যাই। চলুন জামাইবাবু।

ওরা বেরিয়ে যাবার পর ভাবলাম - এ অস্থির চিত্ততা এ-যুগের ধর্ম। নিজের মনটাকে শুধু ঘুড়ির মত ওড়ায়, ঘুড়ির মত সদা চঞ্চল উরু উরু ভাব, মাটির সংস্পর্শে, নিজের সমস্পর্শে আসতে চায় না। নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায় না। নিজের মধ্যে যে আনন্দের গোপন খনি সেখান থেকে আনন্দ উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালায় না। হরিণের মতো অবস্থা। সব গন্ধ, সব অমৃত রয়েছে তার পেটে। কিন্তু, সে গন্ধের খোঁজ করে বেড়ায় বাইরে, উন্মত্তের মতো ছোটাছুটি করে এ-কি সে-দিক। তার বোধ শক্তি নেই, তাই।

একালের মানুষেরও বোধশক্তি নেই। বোধের যে শিক্ষা সে শিক্ষার মধ্যে সে বরম সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পায়।

সাগরকে পরে বলেছিলাম ঃ তোমার শালীদের আর কখনো এনো না এখানে। আমি ও -দুষ্টচক্র কে প্রশ্রয় দিতে পারবো না।

এপ্রসঙ্গে মনে পড়ছে শুদ্ধার কথা। শুদ্ধা এখন ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারে থাকে। স্বামী ডাক্তার। ওর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা ফরিদপুরের বাঙ্গাল, এখন চিরস্থায়ী ভাবে থাকেন বাঙ্গুর এ্যাভিন্যুতে। শুদ্ধারা খাঁটি এদেশি। দুজনকে বেশ সুন্দর মানিয়েছে। শুদ্ধারা এখন খুব সুখে সংসার করছে। একটি ছেলে, বছর চারেকের বয়স এখন। সম্প্রতি দুটো যমজ মেয়ে হয়েছে শুনলাম। ওর সঙ্গে বিয়ের পর থেকে আর যোগাযোগ হয়নি। একবার চিঠি লিখেছিলাম। জবাব পাই নি। দ্বিতীয় বার আর চিঠি লিখিনি। অত সময়ই বা কোথায়?

শুদ্ধা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না, তার পেছনে অবশ্য একটা কারণ আছে। আমি যদি যাই ওর ওখানে বেড়াতে। আমার পেছনে খরচা করবে মেয়ে জামাই এটা অভিপ্রেত নয় শুদ্ধার মা বাবার। নিছক অনুমান নয়। শুদ্ধার বিয়ের ঠিক পরে পরেই গিয়েছিলাম দিল্লীতে। তখন দিল্লীতে

ওদের বাসাতেই উঠতাম। বাসা ছিল কনট প্লেসের কাছাকাছি। তাই, পাবলিশার্সদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সুবিধে হতো। ওদের আন্তরিকতাও খুব ভাল লাগত। ওর বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ওর জন্মের আগেই। ওর বাবাকে ডাকতাম দাদা। মাকে কিন্তু বৌদি না ডেকে দিদি ডাকতাম। খুব শ্রদ্ধা করি দু'জনকে। এখন দাদা রিটায়ার্ড হয়ে নজফগড়ে বাড়ী করেছেন।

যাই হোক, শুদ্ধার কথাতেই আসি। সেবার কিন্তু শুদ্ধাকে হাসিখুশী দেখতে পাইনি। কেমন যেন পাল্টে গেছে। মা বাবা কিছু বলতে গেলেই রাগ রাগ ভাব দেখায়। বুঝতে পারলাম মেয়ের সঙ্গে মা বাবার ঠান্ডা যুদ্ধ চলছে। দুপুরে খেতে বসেছি। শুদ্ধাও বসেছে। ঋদ্ধাদি হঠাৎ বললেন তোব মনে যে কী আছে বুঝতে পারছি না!' মুখ তুলে তাকালাম। দেখলাম কড়মড়ে দৃষ্টি শুদ্ধার দিকে। শুদ্ধার দিকে তাকালাম। বাঁ হাতের কনুইটা টেবিলে রেখে বসেছিল। দেখলাম ও অন্তর্বাস কিছু পরেনি। চোখে পড়তেই চোখ নাবিয়ে নিলাম। দ্বিতীয়বার ওর দিকে আর তাকাইনি। সদ্য স্নান সেরে এসেছে। অসতর্ক মূহুর্তে খেয়ালই করেনি। শুদ্ধা যখন এক বছর বয়স, তখন থেকে ও আমার অতীব স্নেহের পাত্রী, কন্যাস্থানীয়া।

বিকেলের দিকে বললাম - 'চল শুদ্ধা একটু ঘুরে আসি।'

— কোথায় যাবে কাকু?

— চল, কাছেই। মাংস কিনব। বলছিলে কোন দোকানে নাকি ভাল ড্রেস্‌ড মাংস পাওয়া যায়। শুদ্ধা মাংসপ্রিয়া। তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল।

পাঁচ তলার ফ্ল্যাট থেকে নামলাম লিফ্‌টে। পথ চলতে চলতে বললাম - 'আচ্ছা, ব্যাপার কি বল'ত। মা বাবার সঙ্গে তোমার ঠান্ডা যুদ্ধ চলছে দেখছি। আগে'ত এরকম কোনো দিন দেখিনি। এ-বিয়েতে কি তোমার সায় নেই?

— দেখ না কাকু, মা এখন থেকেই কি পরামর্শ দিচ্ছে ....

— মা'ত ভাল পরামর্শই দেবেন। তার পরামর্শ'ত তোমার শোনা উচিৎ।

— কি বলছে জান, বিয়ের পর কিন্তু বুঝে শুনে খরচা করবি। উল্টো পাল্টা খরচা করবি না। টাকা জমাবি যথাসম্ভব। সুব্রত যখন দেশে ফিরবে তখন চেম্বার বানাতে হবে, সেজে গুজে বসতে হবে। প্রচুর খরচা, বুঝলি। এখন বিয়েতে যা দিচ্ছি দিচ্ছি। তখন কিন্তু এক পয়সাও দিতে পারবো না। এধরণের নানা রকম পরামর্শ। এসব শুনলে কার না রাগ হয়।

— ও, একথা। ওদের হয়তো এখন মাথার ঠিক নেই। কিছুদিনের মধ্যে মেয়ে চলে যাবে বিদেশে। সেই জন্মের পর থেকেই'ত এক সঙ্গে আছ। কখনো'ত কাছ ছাড়া হওনি।

— তা নয় কাকু। এখন সবাই স্বার্থপর। স্বার্থ ছাড়া আর কিছু চিন্তা করে না।

ভাবলাম যখন কোন্নগরে থাকতেন তখন'ত এরকম ছিলেন না। দিল্লীর আবহাওয়া, উষ্ণ শুষ্ক আবহাওয়া অনেক পাল্টে দিয়েছে অতি প্রিয় দাদা দিদিকে।

— আচ্ছা কাকু, বিদেশের লাইফ-স্টাইল'এর সঙ্গে কি মানিয়ে নিতে পারব? কেমন যেন ভয় ভয় করে, নার্ভাস লাগে।

— কেন পারবে না। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছ, এম. এস. সি. পাশ করেছ ভাল ভাবে। যে-কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা তোমার আছে।

— না, মানে আমি'ত সাধাসিধে জীবনই পছন্দ করি। ওখানকার জীবনযাত্রা নাকি অন্য রকম, উচ্ছৃঙ্খল ধরণের। আমার ইউনিভার্সিটির বান্ধবীরা বেশ ভালই মানিয়ে নিতে পারত।

— কি রকম?

— ওদের জীবনযাত্রা, দর্শনই অন্য রকম। ওদের হাই ফাই ব্যাপার। এক এক জন ডেইলী যা খরচা করে তুমি চিন্তাই করতে পারবে না। দলবেঁধে দামী রেষ্টুরেন্টে ঢুকলো'ত তিন চার হাজার টাকা খরচা করে ফেললো। এক দিন এক এক জনের পালা।

— তুমি যাও না ওদের সঙ্গে?

— না।

— কেন? আমি'ত ওদের মত অত খরচা করতে পারব না।

— ও। ওরা হয়তো খুব অবস্থাপন্ন।

— তা নয়, ওরা যে কিভাবে টাকা রোজগার করে তা বলতে পারব না।

— নিজেদের বিক্রি করে! বলেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে-দিন শুদ্ধা বলেছিল - তাছাড়া আর কি! ওদের ধাবে কাছেই আমার যেতে ইচ্ছে করে না।

আজ (১৯.০৫.২০০১) আনন্দবাজারে শনিবার সাময়িকী পড়ছিলাম। উঠতি ছেলেমেয়েদের গোপন সমস্যা নিরসনে পরামর্শদাত্রীর কাছে কয়েকজন কিশোরী যুবতী তাদের সমস্যার প্রতিকার চেয়ে লিখছে ঃ

প্রথম জন বর্ধমানের। নাম দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি না। নাম একটা দিয়েছে বটে, কিন্তু সে নাম আসল নয়। সে লিখেছে তার বয়স ষোল। এক বন্ধুর সঙ্গে এক রাত কাটাবার সুযোগ হয়েছিল। পরিণামে সে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। উত্তরদাত্রীর পরামর্শ, ব্যাপারটা মা বাবাকে খুলে বলা উচিৎ। তারাই তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন অর্থাৎ গর্ভপাত ঘটাবার ব্যবস্থা করবেন।

দ্বিতীয় জনের বয়স এখন ১৯। সদ্য বিয়ে হয়েছে। তার যখন ৬ বছর বয়স তখন থেকে সে একজন পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করছিল। বিয়ের আগে পর্যন্ত সে-সম্পর্ক ছিল, এমন কি বিয়ের পরও তারা কয়েকবার দৈহিক সংসর্গে লিপ্ত হয়েছে। ব্যাপারটা এ-ভাবে চললে সাংসারিক জীবনে ভবিষ্যতে কোনো জটিলতা সৃষ্টি হবে কিনা জানতে চেয়েছে।

আর এক জনের বয়স ২১। গানের শিক্ষকের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক চলে আসছে। সম্প্রতি তার বিয়ের ঠিক হয়েছে। শিক্ষক মহাশয় বিবাহিত, ছেলে মেয়েও আছে। তবুও তিনি ছাত্রীকে হারাতে চান না। ছাত্রীকে ভয় দেখাচ্ছেন নানাভাবে। বলছেন — সে যদি বিয়ে করে তাহলে তাদের মিলনের কয়েকটা নগ্ন ছবি যেগুলো তার কাছে রক্ষিত আছে, সেগুলো শ্বশুর বাড়ীর লোকের কাছে প্রকাশ করে দেবে।

এ-প্রসঙ্গে আমি আমার একটা বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বলি। ভদ্রলোক আমার এক জামাইবাবুর বন্ধু। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র শিল্প বিভাগের একজন স্টেনো ছিলেন। স্টেনোগ্রাফি শেখাতেন কয়েকজন ছেলে মেয়েকে। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। বিবাহিত ভদ্রলোকের ছেলে মেয়েও বড় হয়েছে। তবু তিনি তার এক বিবাহিত ছাত্রীর সঙ্গে গোপনে মিলিত হন ছাত্রীর শ্বশুর বাড়িতেই। মাষ্টার মশায় সেজে যান। বাড়ীতে একমাত্র শ্বাশুড়ি। শ্বাশুড়ি মহোদয়া একটু খাওয়া দাওয়া ভালবাসেন। মাষ্টার মশায় ভাল মন্দ খাবার নিয়ে যান তার জন্য। তিনি খাওয়াতেই ব্যাস্ত থাকেন। পাশের ঘরে তখন রতিক্রীড়ায় উন্মত্ত হয়ে ওঠেন ছাত্রী আর মাষ্টার মশাই।

স্বাতী ভট্টাচার্য কর্তৃক একটা ওয়েব পেজ দেখছিলাম কম্পিউটারে। বে-আইনীভাবে যে সব

কিশোর কিশোরী (বাঙ্গালী) গর্ভপাত ঘটাতে চায তাদের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে, ফলে প্রাইভেট নাসিংহোম গুলোর রমরমা অবস্থা। হু'ব হিসেব মতে অবৈধভাবে গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রাণ হারাচ্ছে ৫০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ কিশোরী যুবতী।

গবেষিকা কিরণ জিজিবয়ের বিশ্বাস, যে সব মেয়েরা গর্ভপাত ঘটাতে যায় তারা অপ্রাপ্তবয়স্ক। অনেকের বয়স ১৫ বছরেরও কম। নিরাপদ এবং আইন সিদ্ধ গর্ভপাত সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ। ফলে গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয়।

আরতি বসুর মতে, গর্ভপাত যাবা ঘটায, তাদের অর্ধেকই অপ্রাপ্তবয়স্ক (teanager)। পশ্চিমবঙ্গেব স্বাস্থ্য এবং পরিবার মন্ত্রকের সেক্রেটাবী মিস্টার বি. আর. শতপথির মতে, বেআইনী ভাবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে যেসব মহিলা গর্ভপাত ঘটান তাদের ৬০ শতাংশই অবিবাহিতা, অপ্রাপ্তবয়স্কা।

পরিবার সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ইন্দ্রাণী মুখার্জীর অভিজ্ঞতা ঃ 'ইউনিফর্ম পরিহিতা স্কুলের মেয়েরা আমাদের ক্লিনিকে আসে। তাবা এত ভযার্ত এবং নার্ভাস থাকে ভালভাবে কিছু প্রকাশ করতেও ব্যর্থ হয়, এতটা সন্ত্রস্ত থাকে প্রেসক্রিপশনটাও সঙ্গে নিতে চায় না পাছে মা বাবা ধরে ফেলে।

এফ. এম. রেডিও'র কর্ণধার অরিন্দম সেনগুপ্ত এবং তার সতীর্থরা সপ্তাহে প্রায় কয়েকশো চিঠি পান তাদের দপ্তরে। দৈনিক পাবলিক ফোন বুথ থেকেও ভেসে আসে ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর। এরা সবাই স্কুল ছাত্রী। জানতে চায়, সমাধান চায় সেক্স সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার।

এ-যুগের কিশোর যুবতীদের সমর্থনে নারীবাদী এক গবেষক বলছেন ঃ স্ব-ইচ্ছায় নিজের সতীত্ব বিসর্জন দেয় বা কিশোর যুবকদের সঙ্গে রতিক্রীড়ায় মত্ত হয় এ-রকম মেয়ের সংখ্যা খুবই নগন্য। অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে দৈহিক মিলনের স্বর্গসুখময়ও হয়। অনেক সময় রাজি না হলে বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটবার ভয় থাকে। এ-যুগের উঠতি মেয়েরা কি তাহলে পঞ্চতন্ত্রের সেই কাকের মত। কাকটা অনেক দিন পর এক টুকরো সুস্বাদু মাংস যোগাড় করতে পেরেছিল। ওটা হরণ করে সে নিরাপদ আশ্রয় এক সুউচ্চ বৃক্ষে গিয়ে বসেছিল। লাল টক্‌টকে বড় মাংসের টুকরো মুখে বসে থাকা কাককে দেখতে পায় এক শেয়াল।

শেয়ালের খুব লোভ হয়। ও-মাংসটুকু খেতেই হবে। কিন্তু, কী ভাবে। সে'ত গাছে চড়ে অত উঁচুতে উঠতে পারবে না। তাহলে উপায়? ধূর্ত শেয়ালের'ত ছলের অভাব নেই। তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। কাকটাকে লক্ষ্য করে বলল - কাক, তুমি কী সুন্দর দেখতে।

কাক চুপ করে থাকে। শেয়ালটাকে ভয় পাবার কিছু নেই। শেয়াল অত উঁচুতে উঠতেই পারবে না।

— তুমি কি সুন্দর, কী মসৃণ! শেয়াল আবার বলে? কাক চুপ করে থাকে। তার সৌন্দর্য্যের এত প্রশস্তি'ত আগে কখনো শুনেনি, কিছুটা খুশী হয়।

— যে এত সুন্দর মোলায়েম দেখতে তার গলাটা কী মিষ্টিই না হবে!

কাক ভাবে শেয়ালটা খুব ভাল'ত। ও নিশ্চয়ই আমার বন্ধুত্বে পড়ে গেছে। নইলে এত প্রশংসা করবে কে। প্রশংসা শুনতে শুনতে লোভনীয় মাংসের টুকরোর কথা ভুলেই যায়। বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টি পাঠায় শেয়ালটার দিকে।

— বন্ধু, তোমার গলাটা কি মিষ্টি। আমি না যখন সুযোগ পাই কাকের ডাক শুনি। ভারী মিষ্টি লাগে।

বলে কি! আমার ডাকটাও অত মিষ্টি। কই কোন দিন'ত কেউ বলেনি। লোকে'ত আমার ডাক শুনলে তাড়ায়। শেয়ালটা নিশ্চয়ই আমার প্রকৃত বন্ধু।

— বন্ধু একটু গান শুনি, শোনাবে? শুনে জীবন সার্থক হোক।

অত প্রশংসা শুনলে কার না মাথা ঘুরে যায়। কাকেরও গেল। ডেকে উঠলো 'কা, কা', অমনি মাংসের টুকরোটা পড়ে গেল মুখ থেকে। ধূর্ত শেয়াল ওটা নিয়ে চম্পট দিল। বোকা বোকা দৃষ্টিতে কাক সে দিকে তাকিয়েই রইল।

ছেলেরা ধূর্ত শেয়াল আর মেয়েরা বোকা কাক। পাঠক, নারীবাদীরা নিশ্চয়ই রাগ করবেন। নারীবাদীরা মনুর ওপরও বীতশ্রদ্ধ। কারণ, তিনি বলেছেন নারীরা অস্থির চিত্ত, পুরুষদের মত তারা দৃঢ়চেতা নয়, শারীরিক দিক দিয়েও ওরা দুর্বল। সুতরাং, পুরুষের সঙ্গে তাদের তুলনাই চলে না। মনুকে দোষ দিলেও অমর কবি শেকস্‌পীয়রকে কিন্তু কিছু বলার সাহস পান না। শেকস্‌পীয়র বলেছেন ঃ 'ফ্রেইলটি, দাই নেম ইজ্ ওম্যান!' 'নারী তোমার নাম অস্থিরতা'।

শুধু অবিবাহিত যুবক যুবতীই নয়, বিবাহিতারাও একই দোষে দোষী। খবরের কাগজে পড়েছিলাম একটা ঘটনা। উত্তর কলিকাতার এক গৃহবধূ পুলিশের দ্বারস্থ। অভিযোগ তার ছেলে বন্ধু তাকে ঠকিয়েছে। পত্রমিতালীর মাধ্যমেই তাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। এ বন্ধুত্ব শুধু মানসিক বা ইউটোপীয়ানই ছিল না। বস্তুত দৈহিক ঘনিষ্টতাই ছিল সে বন্ধুত্বের আসল কথা। দু'জনে ডায়মন্ডহারবারে, পুরীতে কাটিয়েছে হোটেলে। ভদ্রমহিলার স্বামী কলকাতা থেকে দূরে থাকেন। একমাত্র মেয়ে হস্টেলে। তাই বলার মতো কেউ নেই। যৌথ পরিবারের দিন'ত শেষ। কাজেই শাশুড়ি, ননদ, দেওর কেউ নেই।

বন্ধুত্ব বা ভালবাসার নাম করে প্রিয় বন্ধু তার কাছ থেকে হাতিয়েছিল নগদ ত্রিশ হাজার টাকা আর চল্লিশ হাজার টাকার মতো গয়না। মহিলাকে তার প্রতারক বন্ধু বলেছিল তার মা'র হার্ট অপারেশন করাতে হবে। তাই প্রচুর টাকা দরকার। এক বিধবা মহিলাকে মা সাজিয়ে আলাপও করিয়ে দিয়েছিল তার সঙ্গে।

টাকা পয়সা হাতিয়ে নেবার পর থেকে কিন্তু প্রিয় বন্ধুর দেখা মেলে না। ফোন করেও পাওয়া যায় না। বুঝতে পারে সে প্রতারকের পাল্লায় পড়েছে। তাই পুলিশের কাছে নালিশ। অনেক খোঁজখবর করে পুলিশ প্রতারককে পাকড়াও করে। গ্রেপ্তার করে বিধবা মহিলাকেও। প্রতারক যুবক মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে বন্ধুত্বের ছলনায় মোহিত করে ঠকিয়েছে আরও অনেক মহিলাকে।

এ-ধরণের অবৈধ প্রেমের ফলে কত খুন খারাপি হচ্ছে। এ-মাসে (৫.২০০১) খবরের কাগজে পড়েছি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মহেশতলায় তিন ব্যক্তি খুন। প্রথম জন একজন যুবক। পরস্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক সঙ্গসুখ উপভোগ করার সময় ধরা পড়ে যায়। মহিলার স্বামী ও তার প্রতিবেশীরা এমন বেদম মার দেয় যে সে অকুস্থলেই প্রাণ হারায়। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মৃতর পাড়া পড়শীরা ছুটে আসে। মারা পড়ে এ-পক্ষের দু'জন।

এধরণের ব্যপার নিয়ে বেশি আলোচনা করে লাভ নেই। সংবাদপত্রে প্রায়ই প্রকাশিত হয় এ-ধরণের খবর। নারী প্রগতির নামে নারীরা নিজেদের অসম্মানের পথে ঠেলে দিচ্ছে। নারীপ্রগতি মানেই কি নারীর শরীর মনকে অবাধে বিলিয়ে দেওয়া!

আজকাল কোন নীতিবোধ নেই, নৈতিকতা নেই। যাহোক করে জীবনটাকে উপভোগ করতে পারলেই হল। হাত বাড়ালেই যদি নারীকে হাতের মুঠোয় পাওয়া যায় তাহলে আর নারীর মর্যাদা থাকে কোথায়? তার নিজের দোষে নারী আজ পুরুষের কামনার শিকার, আধিপত্যের শিকার। এটা কোনো পুরুষশাসিত সমাজের ব্যাপার নয়। আমাদের এই পুরুষশাসিত সমাজেও'ত নারীদের আধিপত্য। মাতৃতান্ত্রিক সমাজেও নারীরা কি পুরুষদের বিশেষ খাতির করেন না? খাসিয়া সমাজেও কি পুরুষরা যথেচ্ছাচার করেন না? নারীরা দিন রাত পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করে, আর পুরুষরা ইচ্ছে মতো ঘুরবে ফিরবে, নেশা করবে। শরৎচন্দ্রের লেখা থেকেও জানতে পারি বার্মার মেয়েদেব বাঙালী স্বামীর জন্য কী আন্তরিকতা, কী স্বার্থত্যাগ, তাকে আঁকড়ে থাকবার জন্য কী অপরিসীম বাসনা। এক এক জন বার্মা রমনী যেন ত্যাগ ও সেবার প্রতিমূর্তি। কিন্তু, অত যত্ন করেও সে তার স্বামীকে রাখতে পারে না। তার স্বামী পালিয়ে আসে তার পরিবারের কাছে।

পুরুষ প্রাধান্যের ব্যাপারটা পুরুষতন্ত্র বা মাতৃতন্ত্রের ব্যাপার নয়। এটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। পুরুষ দৈহিক এবং মানসিক দিক দিয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। এই অসম প্রতিযোগিতায় নারীরা পেরে উঠবে কেন? নারী পুরুষকে বশ করতে পারে রেষারেষি করে নয়, গা জোয়ারী করে নয়, সমান অধিকাব দাবী করে নয়, বশ করতে পারে তার মাতৃত্ব দিয়ে,মমতা দিয়ে, প্রেম ভালবাসা দিয়ে।

নারীর রক্ত মাংস দিয়েই'ত পুরুষরা তৈরি। পুরাণকথিত কাহিনীর মতো পুরুষের শরীর থেকে নারীর জন্ম নয়, নারীর শরীরই পুরুষদের জন্ম দেয়। যার শরীর থেকে পুরুষের জন্ম, যার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে জড়িত ছিল তার বাঁচা মরার প্রশ্ন, সেই নারীর প্রতি কি করে পুরষরা হয়ে ওঠে খড়্গাহস্ত? কি করে অত্যাচার করে, লাঞ্ছনা করে নারীকে? পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ভাবে'ত নারীই দায়ী। কেন সু-সন্তান জন্ম দিচ্ছে না নারী? পুরুষরা'ত আজ শুধু নারীর কামনাজাত, দৈহিক লালসা চরিতার্থ করবার নামান্তর মাত্র। কোথায় সংযম, কোথায় তিতিক্ষা, কোথায় ভক্তিভাব।

আধুনিক চিকিৎসকরাও'ত পরামর্শ দেন — সন্তান ধারণকালে মা'র সংচিন্তা, সৎধ্যান করা উচিৎ, খাওয়া দাওয়ায় বিশেষ সংযম দেখানো উচিৎ। বাবার জন্যও পরামর্শ থাকে — এ-কয় মাস মদ্যস্পর্শ করবেন না, ধূমপান করবেন না, স্ত্রীর সঙ্গে নম্র ব্যবহার করবেন, পারিবারিক আবহাওয়াটাকে উত্তপ্ত করে তুলবেন না, প্রভৃতি।

যাহোক করে হোক সন্তানের মা বাবা হলেই হল? সন্তান জন্মাবার পরও মা বাবার সংযত আচরণ করা উচিৎ, পারিবারিক আবহাওয়া যাতে সুস্থ সুন্দর থাকে সে চেষ্টা করা উচিৎ। সুস্থ, স্বাস্থ্যকর, সুন্দর মনোরম পরিবারই সুস্থ সুন্দর ছেলের জন্ম দিতে পারে।

এ প্রসঙ্গে একজন মহিলার কথা মনে পড়ছে। ভদ্রমহিলা বাঙ্গালী খ্রীষ্টান। বিয়ে করেছেন বাঙ্গালী হিন্দুকে। বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদের'ত বোঝাই যায় না। শাড়ি পড়েন, শাঁখা পড়েন, সিঁদুর পড়েন। এমনকি নামেও বাঙ্গালী। চাল চলনে কথা বার্তায় মেমসাহেবী ভাব নেই। খাওয়া দাওয়াতেও কোনো পার্থক্য নেই। ভদ্রমহিলা খুবই সুন্দর দেখতে, বেশ ভক্তিমতী চেহারা। শ্রদ্ধা জাগে মনে।

তার দু'ছেলে। এক দিন কথায় কথায় বলছিলেন — জানেন, আমার ছোট ছেলেটার জন্য একটু মনমতো সাজগোজ করতে পারি না।

বললাম — কেন, আপনি নিজে সরকারী চাকরী করেন। দাদাও ভাল চাকরী করে।

— না, সেসব নয়। সে-দিন একটু হয়তো বেশিই সেজেছিলাম। ছেলেটা কিছুক্ষণ তাকিয়ে

কি বললে জানেন? বললে সংক্ষিপ্ত তিনটে কথা - 'তুমি না মা!' শুনে আমিও যেন নিজেকে ফিরে পেলাম। মাদের মা হয়েই থাকতে হয়। তাদের লোভী অসংযত হতে নেই এ-বোধটুকু আমার জাগলো। সেই থেকে আমি উগ্র সাজ পোষাক পরি না। মা'দের অনেক স্বার্থ ত্যাগ করতে হয় ছেলেমেয়েদের জন্য।

— আপনার ছেলে কোন ক্লাসে পড়ে?

— এখন ক্লাস টু'তে।

— কোন স্কুলে পড়ে?

— কলকাতা বয়েজ'এ। বড়ো ছেলেটাও একই স্কুলে পড়ে।

— দুটো ছেলেকেই ভাল মানুষ করেছেন বলতে হবে। চাকরী করে অসুবিধা হয় না সংসার সামলাতে, ছেলেদের সময় দিতে।

— হ্যাঁ, তা হয় বই কি। রান্না বান্না ঘরের সব কাজ কর্মই'ত করতে হয়। তবে এর মধ্যে আনন্দও আছে। এ-কষ্ট'ত নিজের জন্য, আমার সংসারের জন্য, আমার ছেলেদের জন্য। আমার স্বামীর জন্য।

— আপনাকে দেখলেও ভাল লাগে। সত্যিই পুণ্যবতী।

ভদ্রমহিলা একটু লজ্জা পেলেন যেন।

ছেলেরা মা'কে মা হিসেবেই দেখতে চায়। ওরা'ত সুন্দর ফুলের মতো। ওদেরও সুন্দর জিনিস, ভাল জিনিস পছন্দ। যা কিছু অসুন্দর, মন্দ তা তাদের মনে দাগ কাটে। আমাদের পাড়ার একটা ঘটনার কথা বলি — একটা ছেলে, বয়েস সাত আট। একদিন বাবাকে চুপি চুপি বললে - বাবা, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।

— কি কথা বাবা?

— এদিকে এসো, চুপি চুপি বলছি।

— হ্যাঁ, বলো।

— কাউকে বলবে না কিন্তু। মাকে বলবে না'ত!

— আরে না, না।

— মা কি সব পোশাক পরে ভাল লাগে না।

হো হো করে হেসে উঠেছিলেন ভদ্রলোক। ছেলেটা সভয়ে ঠোঁট দুটো তর্জনী উঁচিয়ে বন্ধ করে বললে 'চুপ! বোলো না কিন্তু।

ভদ্রলোক স্ত্রীকে বলেছিলেন ছেলের গোপনীয় কথাটা। লজ্জা পেয়েছিলেন। তাব পর থেকে চলাফেরায় খুব সাবধানী।

মেয়েরা সুন্দর পবিত্র হোক

পুরুষ মেয়েদের অংশবিশেষ। একজন পুরুষের শরীরের দুই তৃতীয়াংশই নারীর। নারীই পুরুষের আশ্রয়, আনন্দ, বেদনা, আশা ভরসা সব। পুরুষের স্বার্থেই মেয়েদের সুন্দর, পবিত্র সুস্থ হতে হবে। নারীকে হতে হবে আদর্শ জননী, আদর্শ ভগিনী। কিন্তু, বিশ্বায়নের যুগে ভোগবাদী পৃথিবী নারীকে নিছক পণ্য করে তুলেছে। বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা বাড়ানোর জন্য টি.ভি.'তে যে সব বিজ্ঞাপন দেখা যায় সে গুলোকে নারীশরীরটাই পণ্যের চেয়েও লোভনায় হয়ে ধরা পড়ে। এ-

যুগে নারীর দেহটা আর দেব মন্দির নয়, শ্রদ্ধেয় কিছু নয়, নিছক পণ্যসামগ্রী। এ-দূষিত পরিবেশে নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পাওয়াটাই স্বাভাবিক। নারীর ওপরই নির্ভর করছে একটা সুন্দর সুস্থ, সুখী পৃথিবী রচনা করার ভার। এত হিংসে থাকবে না, মারামারি থাকবে না, দাঙ্গা হাঙ্গামা থাকবে না, নারী-দেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা থাকবে না। নারীরাই এটা পারে সুন্দর সুস্থ সুখী পরিবার রচনা করার মাধ্যমে। কিন্তু, নারীবাদীরা এবং প্রগতিশীল পুরুষরা সগর্বে বলেন নারীদের গৃহের চার দেওয়ালে আবদ্ধ রাখার যে ভারতীয় ঐতিহ্য তাই'ত নারী নির্যাতনের সামিল।

কবি বলেছেন 'বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃ ক্রোড়ে'। গৃহই মেয়েদের জন্য সুন্দর আদর্শ জায়গা - শিশুদের যত্ন দিয়ে, সেবা দিয়ে দুগ্ধ দিয়ে বড়ো করে তোলা, বড় হলে তাদের মায়া মমতা দিয়ে ঘিরে রেখে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই'ত নারীর আসল কর্তব্য। সুন্দর গৃহ রচনার কাজে নারী পুরুষের ভূমিকা যদি একই হতো তাহলে হাসপাতালে, নার্সিংহোমে বিমানে নার্স হিসেবে, সেবিকা হিসেবে মেয়েদের একচেটিয়া অধিকার কেন?

পত্র পত্রিকায় মাঝে মধ্যে পড়ে থাকি ইউরোপের উন্নত দেশগুলোতে বিশেষ করে জার্মানীতে মেয়েরা চাকরী ছেড়ে সুগৃহিনী সাজবার মধ্যেই বেশি আত্মপ্রসাদ লাভ করছে। জাপানে'ত বিবাহিত মেয়েরা চাকরীই করতে পারে না। হয় চাকরী, নয় বিয়ে দুটো এক সঙ্গে চলে না।

আমি নারীদের অনুরোধ করব - পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দেবার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় না মেতে তোমরা নিজেরা এমন একটা আন্দোলন শুরু কর যাতে প্রতিটা পুরুষ সুন্দর হয়ে ওঠে। কোনো পুরুষই যেন তোমাদের প্রতি কু-দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে। তার ওপর দৈহিক এবং মানসিক উৎপীড়ন চালাবার আগে যেন নিজেকেই ক্ষত বিক্ষত করে।

মা তোমার ছেলেকে প্রভাবিত কর, বোন তার দাদা বা ভাইকে প্রভাবিত কর। যে নিজের মাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে, আন্তরিক ভাবে শ্রদ্ধা করে সে কি কোনো অনাত্মীয়া মহিলাকে অসম্মান করতে পারে? যে দাদা তার বোনকে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, যে ভাই তার দিদিকে আন্তরিকভাবে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে তার পক্ষে কি অন্য মেয়েকে অপমান করা, অত্যাচার করা সম্ভব?

তোমরা মেয়েরা কী করে যে ছেলেদের, তোমরা নারীরা কী করে যে পুরুষদের আলাদা করে, দুটো গোষ্ঠীতে আলাদা হয়ে পরস্পরকে কেবল দোষারোপ কর, তা ভেবে আশ্চর্য হই। তোমরা ছাড়া ছেলেদের বা পুরুষদের অস্তিত্ব কোথায়?

বাবা মারা গেছেন। বাবাই মানুষ করেছেন। তাই বাবার কাছেই যত কৃতজ্ঞতা। তার স্মৃতি ব্যথা দেয় মাঝে মধ্যে। কিন্তু মা? জানিই না মা জিনিসটা কেমন। মনেই পড়ে না তার অস্তিত্বকে। যার রক্ত মাংসে গড়া আমার এ-শরীর তিনি আমার কাছে একটা স্বপ্ন। আমার যখন আড়াই বছর বয়েস তখন তিনি মারা গেছেন। কিন্তু, মা জিনিসটা যে কি তা বুঝতে না পারলেও অবচেতন মনে তিনি নিশ্চয় পরমারাধ্যা হয়ে টিকে আছেন। তাই হয়তো নারী জাতিকে আমি এত শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। তাদের কোনো দিন আঘাত করতে পারিনি, বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারিনি। যারা তোমাদের ওপর অত্যাচার করে, অবিচার করে, নির্যাতন করে তাদের অবচেতন মনে নিশ্চয়ই কোনো ক্ষোভ আছে তোমাদের প্রতি। গর্ভাবস্থায় বা নিতান্তই বোধশক্তিহীন শৈশবাবস্থায় তার মনে হয়তো এমন কোনো খারাপ ছাপ ফেলেছ যার ফলে পরিণত বয়সে হয়ে উঠেছে অসুস্থ

প্রকৃতির, মানসিক রোগগ্রস্ত। তাই সে, তারা তোমাদের ওপর শুধু অত্যাচার করতে চায়, নির্যাতন করতে চায়।

পুরুষের প্রকৃতি দুরন্ত দুর্ধষ অশ্বের মতো। তাদের লাগাম পরিয়ে সংযত সুস্থির রাখার দায়িত্ব বিধাতা দিয়েছেন তোমাদের। তাই'ত তিনি তোমাদের ঘাসের মতো এতো কোমল, কচি পাতার মতো এত পেলব, ফুলের মতো এতো রূপসী করে গড়েছেন। মাঝে মাঝে তোমাকে ফুলের চেয়েও বেশি সুন্দর মনে হয়। বিশ্বের সব সৌন্দর্য্য দিয়ে, সব কোমলতা দিয়ে গড়া তোমার মানব মূর্তি। কেন? পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলবে বলে, কোমল করে তুলবে বলে, নিষ্প্রাণ পুরুষ হৃদয়ে ভালবাসায় মমতায় প্রাণের জোয়ার বইয়ে দেবে বলে। আজ পুরুষেব সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে, সমান অধিকার দাবী করার মানে তুমিও নিষ্প্রাণ নির্দয় হয়ে উঠেছ। পৃথিবীটা আর মানুষের থাকে কি করে।

তোমরা যারা আনন্দের পূজারী, রসের কারবারী; তোমরা যারা প্রেমপ্রীতি ভালবাসা আদর্শকেই বেশি মূল্য দেওয়ার কথা — সেই তোমরাই যদি স্থূলবুদ্ধি ব্যবসায়ী কিংবা জড় বুদ্ধি মানুষেব মতো লোভে প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে নিজের সব বিবেক, বুদ্ধি, পবিত্রতা, সৌন্দর্য্যবোধ, আনন্দবোধ প্রেম প্রীতি ভালবাসা আদর্শকে বিসর্জন দাও তাহলে মানব সমাজকে সুন্দর করবে কে — তাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ, সুস্থ করে তুলবে কে? মা জননী, বোন ভগ্নি তোমরা একতাবদ্ধ হও, দৃঢ় হও, নিজেদের বাঁচাও, তোমাদের ছেলে সন্তান, স্বামী, ভাই দাদাদেব বাঁচাও!

আমেরিকায় সতীত্ব আন্দোলন

আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা ভাবে নিজের শবীরটাকে যা খুশি করা, ছিনিমিনি খেলা যেন তাদের সংস্কারমুক্তির পথে, প্রগতিশীলতার পথে এক যুগোপযোগী পদক্ষেপ। এ-ব্যাপারে আমাদের দেশের সামাজিক পীড়াপীড়ি, বাধা নিষেধ, ধর্মীয় অনুশাসন এ-সব বড্ড বেশি সেকেলে। তারা কি একটা ব্যাপার খেয়াল করেছে? আমেরিকার সম্রাট (প্রেসিডেন্ট) রবার্ট বুশের দু'মেয়েকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বিচার হয়েছে, শাস্তি হয়েছে। এদের অপরাধটা কি ছিল? মদের বোতলশুদ্ধ ধবা পড়েছিল। আমেরিকায় উনিশ বছরের নীচে ছেলে মেয়েদের পক্ষে এটা অপরাধ। অথচ আমাদের অর্বাচীন অনুকরণপ্রিয় আধুনিক ভারতীয় সমাজে মদ্যপান একটা প্রগতিশীলতার লক্ষণ। টীন এজারদের পক্ষে মদ্যপান একটা বিরাট চমক।

কয়েক বছর আগে হিন্দুস্থান টাইমস্-এ একটা লেখা পঁড়ছিলাম। শোভা দে'র লেখা। লিখেছিলেন আমেরিকার ছেলে মেয়েরা এ-যুগে গল্পগুজব করে, টেবিলে থাকে মিনারেল ওয়াটারের বোতল। আর আমাদের ছেলে মেয়েরা রাখে মদের বোতল। ওদের কাছে এটা একটা ফ্যাশন, আধুনিকতার লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আত্মার সঙ্গি সঙ্গিনী

১৩ই জুন, ২০০১ নিউইয়র্কের খবর আমেরিকার ছেলেরা এখন শুধু মেয়েদের দেহটাই চাইছে না। বিশোর্দ্ধ ছেলেরা এমন মেয়েকে বিয়ে করতে চায় যারা তাদের অন্তরতম প্রদেশের আদর্শ, আনন্দ বিষাদের অন্তরতম সঙ্গিনী হবে। সেই সব মেয়েদের তারা জীবন সঙ্গিনী করতে চায় যারা তাদের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করবে, সমগ্র হৃদয় প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে। বিয়ের ব্যাপারে [illegible]

বিত্ত, স্বধর্ম প্রভৃতি ব্যাপার তাদের মতে গৌণ। এ-প্রজন্মের আমেবিকার মেয়েদের মানসিকতাও তাই। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে এ-সব। এরা'ত সবাই দেখছি আমার মতো মানসী খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওদের সবার জীবনে মানসী আসুক, ওরা সুখী হোক, শান্তিতে থাকুক, আনন্দে থাকুক।

সমীক্ষাটা চালিয়েছিলেন রাত গার বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাশনাল ম্যারিজ প্রোজেক্ট। "মন মতো জীবন সঙ্গি বা সঙ্গিনী পাওয়ার মানসিক যে চাহিদা তার মধ্যে নতুন কিছু নেই। নতুন এবং কিছুটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হলো - মন মতো জীবন সঙ্গি বা সঙ্গিনীর স্বার্থে তারা পাল্টি ঘর, অর্থিক স্বচ্ছলতা, সামাজিক মর্যাদা, স্বধর্ম এমনকি আদর্শ মা বাবার যোগ্যতা পর্যন্ত উপেক্ষা করতে প্রস্তুত।" এ-প্রজেক্টের সহ-পরিচালক ডেভিড পোপন'র (Popnoe) এই অভিমত।

এক'শ জনের মধ্যে চুরানব্বই জন ছেলেমেয়েদের চাহিদাই এ-রকম। এক'শ জনের মধ্যে অষ্টআশি জনের মতে — তাদের বিশেষ একজন, যে জন আত্মার সঙ্গি বা সঙ্গিনী (Soul-mate) অপেক্ষা করে আছে কোথাও না কোথাও। এদের সাতাশি জনেরই বিশ্বাস - সেই সঙ্গিবা সঙ্গি নীকে তারা খুঁজে পাবে বিয়ের সময়।

মেয়েদের শতকরা আশিজনই কামনা করে — তাদের স্বামী তাদের অন্তরতম প্রদেশ অধিরাজ হবে, সেখানে থাকবে তার একচ্ছত্র আধিপত্য। এই পরম বন্ধু আত্মার সঙ্গি কতটা উপার্জনক্ষম তা তাদের কাছে গৌণ।

পোপনু'র মতে - এটা একটা বিবাট বিশাল পরিবর্তন। পূর্ববর্তী প্রজন্ম একমাত্র বৃদ্ধ বয়সেই আত্মার সঙ্গি বা সঙ্গিনী কামনা করতেন। কিন্তু এখনকার প্রজন্ম জীবনের শুরু থেকেই তা চাইছে!'

'It's the term of the hour . It's a big chenge from times past when you may be, hoped a spouse would be a soul mate by the end of life you didn't start out looking for such a person'

আমার মানসী'র সঠিক ইংরাজী প্রতিশব্দ এত দিনে খুঁজে পেয়েছি। মানসী = soulmate. আমি'ত এই soulmate -ই চেয়েছিলাম। যে আমাকে ভাল বাসবে, শুধু মানুষ হিসেবে, আমার চাকরি বাকরি উপার্জন ক্ষমতাকে নয়, অর্থ বিত্ত সম্মানকে নয়।

আমেরিকার এ--প্রজন্মেব ছেলেমেয়েদের আমি শ্রদ্ধা জানাই। ওরাই পৃথিবীতে প্রেমশিশু দেবশিশু উপহার দেবে। কামজ-পশু, ভোগে আকণ্ঠ পশুর জন্ম দেবে না। পৃথিবী'ত আমেরিকাকেই অনুকরণ করে সব দিক দিয়ে। তাদের দেখা দেখি পৃথিবীও প্রভাবিত হবে, পৃথিবীতে নর দেবতার সংখ্যাধিক্য হবে - পৃথিবী সুন্দর সুস্থ হবে, এই কামনা করি অন্তরের অন্তস্থল থেকে।

মানসী খোঁজা, সব কিছুর উর্দ্ধে শুধু একমাত্র ভালবাসার মানুষটিকেই প্রাধান্য থেকেই চ্যাস্টিটি আন্দোলনও বেড়ে যাচ্ছে।

সতীত্ব আন্দোলন

জিও সিটিজ (Geo Cities) পরিবেশিত ওয়েব পেইজ 'সতীত্বের আনন্দ' পড়ে এত বেশি আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি যা প্রকাশ করা অসম্ভব। পরিবেশক বলছেন ঃ

"তোমার বন্ধুরা কামনামুক্ত লোকেদের সঙ্গে মেলা মেশা করছে দেখে তোমার মনে ক্ষোভ জন্মাতে পারে। নিজেকে ভাবতে পার বঞ্চিত। কেউ তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এগোবে না, কারণ

তুমি অতদূর এগোতে চাইবে না, কোনো কু-প্রস্তাবে সম্মত হবে না। অতএব কোনো পুরুষ বন্ধু তোমার সঙ্গে বেরোবার দিন-ক্ষণ ঠিক করতে আগ্রহ দেখাবে না।

এই কামান্ধ সমাজে তোমার এ-রকম একটা পরিতাপ আসতেই পারে, বিশেষ করে যখন তুমি হাইস্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়। কিন্তু, তুমি হয়তো জান না, তোমার মতো অনেকেই আছে। দিন দিন তোমাদের সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে। 'ট্রু লাভ ওয়েটস' নামে আন্দোলন গড়ে উঠছে, একটু তাকিয়ে দেখ।

তোমার মত সঙ্গী চাও। তাহলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান কর, সৎসঙ্গে মেলামেশা কর। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, তিনি তোমার মন মতো সঙ্গী বা বন্ধুর সন্ধান দেবেন। তুমি যদি সত্যিই বিবাহিত জীবন যাপনের জন্য জন্মে থাক, তাহলে জেনো, ঈশ্বর নিশ্চয় তোমার জন্য সেই পুরুষটিকেও পাঠিয়েছেন।

সতীত্বের উপকারিতা

সতীত্বের কতকগুলো উপকারিতাও আছে। তুমি কি চাও তোমার শরীরটাকে মাটির ভাঁড়ের মত ব্যবহার করুক। চা খাক, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিক। মনে রেখো তোমার শরীরটাও পবিত্র। পবিত্র মনের আধার পবিত্র শরীর।

তাছাড়া গর্ভবতী ও যৌনরোগগ্রস্ত হবার ভয়'ত আছেই। আমেরিকায় এ-ধরণের যৌন-রোগগ্রস্ত মেয়েদের সংখ্যা কতো জান? ১,২০,০০০,০০ জন। তাও সংখ্যাটা প্রতি বছরের। আমেরিকায় প্রতি বছর অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের সংখ্যাটাও জেনে রাখ। প্রায় ৩,৫০,০০০ জন। এরা সবাই কিন্তু টীন এজারস। (উৎস ঃ Almance, 1996)

যৌন শিক্ষা সত্ত্বেও

এ-সব বেড়ে যাচ্ছে যৌনশিক্ষা বা সেক্স এডুকেশন সত্ত্বেও, সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও। কনডম যখন বিধিসম্মতভাবে অর্থাৎ দক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় তখনো অন্নত দশ শতাংশ বিপদ থেকে যায়। স্বাস্থ্যকর্মীদের তাই পরামর্শ - সব চেয়ে ভাল পন্থা, গর্ভবতী এবং যৌনরোগগ্রস্ত হওয়ার কোন ঝুঁকি না নেওয়া। 'সেক্স'কে দৃঢ়ভাবে 'না' বলাটাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

মানসিক স্বাস্থ্য

দেহ ছাড়া মনটা'ত আছে। মেয়েদের মন কোমল শরীরের মতোই নরম। নরম মাটির মতো নরম মনে সহজেই ছাপ পড়ে। তাই ওরা সহজে বিভ্রান্ত হয়, ফাঁদে পড়ে, মানসিক যন্ত্রণা পায়। তাই মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও সতীত্বভাব বজায় রাখা দরকার। যার মানসিক শান্তি স্থৈর্য্য আছে সেই-ই শান্ত-সুখী। যার পবিত্র ভাব থাকে তার মনের জোরটাও বেশি। এই মনের জোরে সে অন্যান্য বহু দৈহিক বিরূপতা জয় করতে পারে। সবল মনই সবল স্বাস্থ্য দিতে পারে। সবল মনের জন্যই দরকার পবিত্র ভাব।

তারপর ধর বিয়ের ব্যাপারটা। তোমার সঙ্গীকে যদি পবিত্রতার মধ্যে দিয়েই সারাজীবনের জন্য পেতে পার তাহলে তোমার সঙ্গীও তোমাকে পবিত্রভাবে গ্রহণ করবে, তোমার পবিত্রভাবটা উপলব্ধি করতে পারবে, তোমাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসার অনুপ্রেরণা পাবে। প্রেম যতই গাঢ়

হয়, সেক্স ততই মূল্যবান হয়। তখন ভালবাসার অপর নামই সেক্স।

তাছাড়া সতীত্বের সাহায্যে তুমি তোমার সঙ্গীকে যাচাই করে নিতে পার। সে কি শুধু তোমার শরীরটাকেই চায়। শুধুমাত্র শরীরের টানকেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ নয়। তোমার সঙ্গী সত্যিই যদি তোমাকে ভালবাসে তাহলে তার দেহের চাহিদা কম থাকবে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

এখন কয়েকজন নেট বন্ধুর অভিজ্ঞতার কথা শোনাব ঃ

ক্লীবল্যান্ড থেকে এলিজাবেথ —

'তোমার প্রদর্শিত পথেই আমি চলেছি। বিয়ের সেই শুভ-রাত্রি পর্যন্ত নিজেকে সুরক্ষিত রেখেছি। আমি খুব সুখী। আপনি আপনার আন্দোলন চালিয়ে যান। বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলোর কথাও আমাদের ভাবতে হবে। খুবই পরিতাপের ব্যাপার তের বছরের আগেই ওরা সেক্স-সংক্রান্ত নানা দুঃসহ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে বাধ্য হয়। আমার এক বন্ধু আমাকে বলেছিল — আমিই তার অনুপ্রেরণা। ক্যালিফোর্ণিয়ার একটা স্কুলে সেক্স নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে যে-ভাবে স্কুল জীবনটা পেরিয়ে এসেছি তা তার মতে অনুকরণীয়। এমনকি কলেজে পড়বার সময়ও আমি কাজকর্ম — বাড়ির কাজ, প্রোজেক্ট প্রভৃতি, যে আমি অন্য দিকে মন দেবার সময় পেতাম না। শুধু ভারী অন্তরে দেখতাম সেক্সকে অতিমাত্রায় প্রাধান্য দিয়ে আমার বন্ধুরা কী পরিমাণ মানসিক যন্ত্রণায় এবং গর্ভবতী অবস্থা এবং যৌনরোগাদিতে ভুগছে। এ-সব দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে লাভ? জীবনটাই'ত ওদের নরক হয়ে গেল।

নিকোল (Nicole) ঃ

আমাকে আমার ক্লাসে ওরা জিজ্ঞেস করেছিল ছাত্রীরা, বিবাহ-পূর্ববর্তী জীবনে আমার যৌন-অভিজ্ঞতার কথা। আমি বললাম — আমার বিয়ে হয়েছে যখন আমার আমাব বয়স ছিল পঁচিশ। তখনো পর্যন্ত আমার কোন যৌন অভিজ্ঞতা ছিল না। শুনে ওরা অবাক হলে, ওমনকি হী হী করে হাসলও। ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। সমাজটাই'ত এ-ভাবে চলে এসেছে। ছেলে মেয়েরা শিখে এসেছে নরনারীর মধ্যে একমাত্র বন্ধন যৌনতা, একে অপরের সঙ্গে মেলা মেশা করবে শুধু, যৌন-আনন্দের জন্য। বিবাহ পরবর্তী জীবনের নরনারীর যে পবিত্র অনাবিল যৌনবিহার সে-অভিজ্ঞতাটুকু ওদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। যৌনক্লাসে এদের শুধু শেখানো হয়েছে কিভাবে নিরাপদে সেক্স উপভোগ করতে হয়। যৌনতা জিনিসটা আদতে কি, মানব জীবনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটাই বা কি তা শেখানো হয় না। আমার সর্বশেষ অভিজ্ঞতার কথাই বলি। জীবনে হতাশা নিরাশার অনেক কারণ আছে — তার মধ্যে সেক্স বা যৌনতাও অন্যতম। যৌনতা হলো নিষিদ্ধ কিছু। এটা মনে রাখাটাই জীবনে সব চেয়ে জরুরী।

জো (Joe), ইংল্যান্ড থেকে ঃ

কেউ যদি সতীত্ব ভাবটাকে বোঝা বা কু-সংস্কার মনে করে তাহলে বুঝতে হবে সে মানসিক দিক দিয়ে অসুস্থ। তার চিকিৎসার প্রয়োজন। সেক্সকেই জীবনের সবকিছু এ-রকম ভেবে থাকে যারা তারাই এ-অসুস্থ মানসিকতার স্বীকার হয়। কারও সঙ্গে বেরোবার পর (dating) তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'তুমি কি কিছু পেয়েছিলে?' যেন কোন ভোগ্য সামগ্রী বেচা

কেনার ব্যাপার, অথবা বিনা পয়সায় কিছু পাওয়া। এ-ক্ষেত্রে নৈতিকতা এবং পবিত্রতা পুরোপুরি অনুপস্থিত। সতীত্ব ঈশ্বরের সব চেয়ে বড়ো দান, তোমার সবচেয়ে বেশি ভালবাসার পাত্রকে উপহার দেওয়ার মতো উপযুক্ত উপহার। সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে মহৎ, সবচেয়ে মূল্যবান, কারণ এ-উপহারের একদিকে জড়িয়ে আছে আধ্যাত্মিকতা, অন্য দিকে দৈহিক মিলনের চরম তৃপ্তি। পবিত্রভাব দৈহিক মিলনেও এক চরম পরিতৃপ্তির স্বাদ এনে দেয় যা এককথায় স্বর্গীয়। ঈশ্বরের শক্তিই যেন তাদের আবৃত করে রাখে। তখন দম্পতি যাই করুন তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। ঈশ্বর বলতে যে পবিত্র ভাবের উদ্রেক হয় দু'জন সুখী দম্পতির সংসারও তাই। ঈশ্বরের আশীর্বাদ সব সময় তাদের ওপর বর্ষিত, তাদের সুখে দুঃখে থাকেন ঈশ্বর। তিনি স্বয়ং তাদের বহু প্রশ্নের উত্তর বহু প্রশ্নের সমাধান। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমে, সংসারে যদি ঈশ্বরের ভূমিকা অস্বীকার করে তাঁকে যেন আমরা অবমাননা কবি।

ঘটনাচক্রে দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি কারও সতীত্বের মতো মহান সম্পদ হারিয়ে যায়, তাহলে তার দমে যাবার মতো কোনো কারণ নেই। সে তার সতীত্ব ফিরে পেতে পারে অন্তত মানসিক ভাবে, সে যদি আধ্যাত্মিক গুরুর শরণাপন্ন হতে পারে। মানসিক পবিত্রতা, সংযমভাবটাই হলো আসল সতীত্ব।

ক্যারোলিন অন্টারিও, কানাডা —

'সতীত্বই আমাদের কাছাকাছি টেনে এনেছিল। এ-ভাব নিয়েই আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখি, বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়। আমার স্বামী (তখন বন্ধু ছিল) এক সময় বেশি কিছু চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি। দূরত্ব বেড়েছিল এক সময়। কিন্তু, আমার সতীত্ব, পবিত্রতার কাছে সে নত হলো। আমার প্রতি তার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল'।

জিম —

'সতীত্ব বজায় রাখা একটু শক্ত কাজ। এর মধ্যে কষ্ট আছে। কিন্তু, ছেলে মেয়েদের একথাটাই বোঝাতে হবে - তোমাদের এই তিতিক্ষা স্বর্গীয় কিছু লাভ করার জন্য। ঈশ্বর অবশ্যই তোমাদের কষ্টকে আনন্দে পরিণত করবেন। যিশাসকে কতো অমানুষিক শাস্তি পেতে হয়েছিল ভেবে দেখ'ত! সে কেন, নিজের আদর্শ বজায় রাখবার জন্যই'ত। তোমাদের তিতিক্ষা যিশাসের সঙ্গে একাত্ম করে তুলবে তোমাদের। তখন দেখবে কী আনন্দ, কী প্রশান্তি।

ট্রেইসি —

"তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পার, তুমি বিয়ে পর্যন্ত কুমারী ছিলে তার জন্য কি অনুতপ্ত? আমি বলব না। দুঃখ শুধু এই স্বামী হিসেবে আমার নির্বাচনটা সঠিক ছিল না। আমি তাড়াতাড়ি ২১ বছর বয়সেই ভাল মন্দ বিচার না করেই বিয়ে করে ফেললাম।

তোমাদের কাছে আমার উপদেশ — বিয়ে ব্যাপারটা একটা আশ্চর্য্যজনক অভিজ্ঞতা। এই স্বর্গীয় অভিজ্ঞতার জন্যই তোমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক ভাবে, চিন্তার দিক দিয়ে পরিপক্ক করে তোল। সতীত্ব অবস্থা বজায় রাখ, এটাই সবচেয়ে বড় উপহার যা কোন স্বামী তার স্ত্রীকে, এবং কোন স্ত্রী তার স্বামীকে দান করতে পারে। তুমি যদি বিয়ে পর্যন্ত সতীত্ব ভাব বজায় রাখতে না পার, তাহলে ভাববে তুমি তোমার জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে বঞ্চিত করছ। আর একটা ব্যাপারে

সাবধান থেকো, জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনী বেছে নেওয়ার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করো। এ-ব্যাপারে যদি ঐশ্বরিক কৃপা লাভের চেষ্টা কর'ত সব চেয়ে ভালো। যখন আমি সবে যুবতী হলাম, বিয়ে করলাম ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়ে। আমি'ত তাঁকে আমার পছন্দ অপছন্দের কথা জানাইনি!"

নিউ অরলিয়েন্স থেকে ক্রিস্টা/১৯ বছর —

"আমি মনে করি নিজেকে পবিত্র রাখার সিদ্ধান্ত আমার জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এতে পেয়েছি আত্মসম্মানবোধ, শিখেছি নিজেকে শ্রদ্ধা করতে। বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করি এই ভেবে যে আমি এক জন অসাধারণ মেয়ে। ছেলেরাও তা বলে থাকে। আসলে ওরা আমার মানসিক শক্তি বা মনের জোর দেখে বিস্মিত। যারা আমার ওপর বিরক্ত তাদের কোনো গুরুত্বই দিতে চাই না।

আমি মনে করি প্রাক্‌-বৈবাহিক জীবনে যৌন-সংসর্গ বিয়ের বাতটাকে মাটি করে দেয়। এটা যেন পবিত্র সম্পর্কটাকেই নষ্ট করে দেয়। আরও ভাবি আমার জীবনে সঙ্গী যদি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে রাত কাটিয়ে থাকে তাহলে তার পক্ষে শুধু আমার সঙ্গসুখ নিয়ে তৃপ্ত থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ, সে-তখন তুলনা করে অতীতের অভিজ্ঞতা।

যখন দেখি কোনো বন্ধুব মনে দৈহিকভাবে আমাকে পাওয়ার ইচ্ছে জেগেছে তক্ষুনি তাব সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করি। আমি নিজের সঙ্গে নিজে যৌন পরিতৃপ্তির কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করি না, পর্নোসও দেখি না।"

শুধু নারীর দুর্দশা কেন, এ-সব নিন্দুকরা ভারতীয় সমাজের কিছুই ভালো চোখে দেখতে পায় না। কারণ এরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। যারা তাদের শিক্ষক তারা ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিখে এসেছে ভারতবর্ষ কু-সংস্কারের দেশ, জাতপাত নিয়ে রেষারেষির দেশ, নারী নির্যাতনের দেশ ....ভারতবর্ষের দোষের আর সীমা পরিসীমা নেই।

সত্যিই কি তাই? সনাতন ভারতবর্ষে নারীদের কি চোখে দেখা হয় তা ১৮৬০ সালে লেখা (আজ থেকে প্রায় দেড়'শ বছর আগে) এক গ্রন্থ থেকে জানা যায়। বইটা একজন দেশীয় খ্রীষ্টানের লেখা। নাম 'Domestic Manners and Customs of the Hindus of Northern India" by Baboo Ishree Dass.

লেখক ভারতীয় সমাজে নারীদের সম্বন্ধে কি বলেছেন শোনা যাক ঃ

"কিছু কিছু রাজপুত ছাড়া দেশের প্রায় সর্বত্রই কন্যা সন্তানদের প্রতি খুবই সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়, পুত্র সন্তানদের মতো একই রকম সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয় - কোনো রকম বৈষম্য দেখানো হয় না। তবে সব মেয়েদের লেখাপড়ার ওপর ছেলেদের তুলনায় অতোটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু ছেলেদের তুলনায় ওরা পার্থিব উপকরণ বেশি পায়। ভাল ভাল কাপড় চোপড়, গয়না পত্তরের কোনো অভাব থাকে না। বিয়ের আগে পর্যন্ত তাদের খুব পবিত্র দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাদের খুব শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয়। অভিভাবকরা জানেন মেয়েদের বেশি দিন রাখা যাবে না সে পরের ঘরে যাবেই, তারা অন্য ঘরের গচ্ছিত সম্পত্তি। তবুও অভিভাবকরা কিছু আশা না করেই তাদের আন্তরিক ভাবেই ভালবাসেন।" (পৃঃ ১৫২)

কই আজকাল'ত এই দৃষ্টিভঙ্গি নেই। মেয়েদের প্রতি সেই শ্রদ্ধার ভাব কোথায়? আজ তাদের প্রতি এতো বৈষম্য কেন, এতো ভ্রূণ হত্যা কেন। কারণ, তাদের প্রতি আমাদের আর সেই

নির্লোভ পবিত্র ভাব নেই। তাই, অতীতের ঘরের অতি পবিত্র কন্যা সন্তানদের, ঘরের লক্ষ্মীদের সংখ্যা অস্বাস্থ্যকর ভাবে হ্রাস পাচ্ছে ঃ

	পুরুষ	নারী
১৯০০	১০০০	৯৭২
১৯৬১	১০০০	৯৪১
১৯৯৯	১০০০	৯২৭

মাঠে ময়দানে নারী প্রগতির নামে যতো মিছিল বেরোচ্ছে, যতই শোরগোল তোলা হচ্ছে ততোই মেয়েদের অবস্থার অবনতি হচ্ছে। ঘরে বাইরে মেয়েদের পবিত্রভাবে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয় না। ওরা যেন আজ বস্তু। তারা ভোগ সামগ্রীর মতো পুরষদের প্রলুব্ধ করে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে, পোশাক পরিচ্ছদের মাধ্যমে। অভিভাবকরা মনে করে বোঝা। কারণ এদের পেছনে টাকা ঢেলে প্রতিদানের আশা করা যায় না। সবাই এখন লোভী। ফ্যাশন সর্বস্ব মেয়েরা দেহ পর্যন্ত বিক্রি করে ঠাঁট বজায় রাখার জন্য।

অর্থপিশাচ অভিভাবকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন

আজকাল অভিভাবকদের অনেকেই মেয়েদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। তাদের পবিত্র গচ্ছিত সম্পদ হিসেবে সযত্নে লালন পালন এবং রক্ষা করার চেষ্টা করে না। আবার এদের মধ্যে অনেকেই সুন্দর পবিত্র মেয়েগুলোকে ঘরে বাইরে মাংসাসী নেকড়ের মুখে ঠেলে দিয়ে অর্থোপার্জন করে। এক বছরের জন্য, কয়েক বছরের জন্য ছোট বড়ো হোটেলগুলোকে বিক্রি করে দেয়। ক্রীতদাসীদের মতো ওদের দিয়ে যা খুশি তাই করনো হয়।

সুতরাং, প্রশ্নটা বিরাট — বিশ্বায়নের যুগে মেয়েরা এগোচ্ছে না পিছোচ্ছে? আমাদের পাড়ায় আজ (৭.৭.২০০১) এক বয়স্কা মহিলাকে কয়েকটা অল্প বয়সী ছেলে পেটাল। কেন? কারণ মহিলা প্রতিবাদ করেছিলেন। কিসের বিরুদ্ধে ? কয়েকজন স্কুল-ছাত্রীকে উত্যক্ত করছিল ওরা। তার বিরুদ্ধে। গতকাল খবরে শুনলাম কল্যাণীতে এক জন খুন, অন্য জন গুরুতর আহত হয়েছে। কি ব্যাপার? ওরা কয়েকজন সিনেমা হলের মধ্যে ধূমপান করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল তাই।

সতীত্ব আন্দোলন শুরু হোক

সমাজটা কোন অরাজক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে! এ'ত হবেই। এ-দিকটা হয়তো সমাজ বিজ্ঞানীরা ভেবে দেখেন না। মেয়েরাই ঘরের পরিবেশ সুন্দর পবিত্র রাখেন। সেই সুন্দর পবিত্র পরিবেশেই ছেলেরা সত্যিকার ভাবে সুন্দর সুস্থ হয়ে বেড়ে উঠতে পারে। সেই মেয়েদেরই যখন আজ অপবিত্র অসুন্দর করে তোলা হচ্ছে, তাদের আজ পণ্য হিসাবে বিক্রি করা হচ্ছে, বা তারা নিজেরাও বিক্রি হচ্ছে তখন সুন্দর সুস্থ পরিবার ও সে পরিবার সমষ্টি সমাজ সুন্দর সুস্থ হয়ে উঠতে পারে কি ভাবে?

তাই আমেরিকার মতো আজ আন্দোলন শুরু করা দরকার। মেয়েদের শ্রদ্ধার চোখে, পবিত্রভাবে দেখার আন্দোলন। মেয়েরা ভোগ্য সামগ্রী নয়, তারা আমাদের অতি পবিত্র মা বোন।

আর যে-সব অভিভাবকরা মেয়েদের ভাড়া খাটিয়ে টাকা রোজগার করে তাদের চিহ্নিত কর, সামাজিক বয়কট কর, শাস্তি বিধান কর। নিছক ঘরোয়া ব্যাপার বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না। এটা একটা গোটা সমাজ ব্যবস্থার প্রশ্ন।

এ-প্রসঙ্গে 'ক্রয়টজার সোনাটা'র নায়ক পজদানিসেক'এর অভিজ্ঞতার কথা একটু শোনাই ঃ

"আমি শুনেছি ওটি করার পর আমার জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হবে। জিনিসটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল — কথাটা শুনেছি, পড়েছি। ওটা করার মধ্যে উপকার কিছু আছে, আছে বাহাদুরি- বন্ধুরা বলেছে। তাই বিশ্বাস করেছিলাম জিনিসটার মধ্যে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু নেই। রোগের ভয়? প্রতিরোধ'ত আগে থেকেই করা হয়। বেশ্যালয় তদারকের আয়োজন সরকার করেছেন, যাতে স্কুলের ছাত্ররা নির্বিঘ্নে নিজেদের লালসা চরিতার্থ করতে পারে। এর জন্যে মাইনে দিয়ে ডাক্তার রাখা হয়েছে। আর এটাই'ত সমীচিন। স্বাস্থ্যের পক্ষে নাকি লাম্পট্য ভাল। তাই তারাই পরিষ্কার পরিপাটী করে লাম্পট্যের ব্যবস্থা করে রাখেন। দেখেছি ছেলেদের স্বাস্থ্যের জন্য মেয়েরাও বিস্তর মাথা ঘামান। বেশ্যালয়ে ছেলেদেব পাঠায় স্বয়ং বিজ্ঞান।

সিফিলিস সারাবার জন্য আয়োজন বিস্তর। তার কয়েক শতাংশ লাম্পট্য দূর করার কাজে লাগালে সিফিলিসের অবসান ঘট্‌ত অনেক আগে। কিন্তু, লাম্পট্য দূর করার জন্য নয়, প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যই যত ব্যবস্থা, দূর করার জন্য নয়।

শুধু আমাদের মতো সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এমনকি চাষী শ্রেণীব মধ্যেও ছেলে ছোকরা দশ জনের মধ্যে ন'জনেরই আমার মতো অবস্থা। আমার ক্ষেত্রেও এ-সাঙ্ঘাতিক ব্যাপারটা ঘটল, আমি পাপ করলাম কোনো বিশেষ স্ত্রীলোকের রূপের মোহে বিভ্রান্ত হয়ে নয়, কোনো স্ত্রীলোক আমায় পটায়নি। পাপ করলাম শুধু এই জন্য যে, আশপাশে লোকজন বলতো ওটা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, আমার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য জরুরী ও হিতকর। অনেকের চোখে ওটা যৌবনের স্বাভাবিক আমোদ প্রমোদ, নির্দোষ আনন্দ বিলাস। তখন আমি ওটা পাপ বলেই ধরিনি।

শুনেছিলাম জিনিসটা কিছুটা আনন্দের, বিশেষ একটি বয়সের নিছক তাগিদ মেটানোর ব্যাপার। শুনেছিলাম, আর লালসা চরিতার্থ করতে শুরু করেছিলাম যেমনভাবে শুরু করেছিলাম ধূম আর মদ্য পান। কিন্তু, কিছু দিনের মধ্যেই একটি অস্বস্তিকর বিষণ্ণতা আচ্ছন্ন করল আমাকে। কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। যে নিষ্পাপ অবস্থা খুইয়েছি! মেয়েদের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক আর কোন দিন গড়ে উঠবে না। কেঁদেছিলাম সেই শোকে। মেয়েদের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক বিদায় নিল চিরতরে। মেয়েদের প্রতি বিশুদ্ধ মনোভাব আর রইল না,থাকতেই পারে না। যাকে বলে লম্পট তাই হয়ে দাঁড়ালাম। লম্পট হওয়া মানে মদ্যপ, ধূমপায়ী বা আফিমখোরের শারীরিক অবস্থায় উপনীত হওয়া। মদ্যপ, ধূমপায়ী কিংবা আফিমখোর কোনোভাবেই স্বাভাবিক নয়। তাদেরই মতো হল আমার অবস্থা। শুধু সম্ভোগের জন্য কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে শোওয়া! সে লোকের বেজে গেছে বারটা। সে তখন পুরোপুরি লম্পট। মদ্যপ বা আফিমখোরের যে রকম তার ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যায় সে-রকম বোঝা যায় একজন লম্পটকেও। স্ত্রী লোকের সঙ্গে শুদ্ধ সহজ সরল সম্পর্ক সে আর কোন দিনই গড়ে তুলতে পারবে না।

একজন লম্পটের সৎসাহসই থাকে না। লম্পট ভদ্রলোকগুলো আমার বোন বা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে। আমি জানি তিনি কীভাবে জীবন যাপন করেন। আমার'ত উচিৎ তাকে চুপিচুপি এক পাশে ডেকে নিয়ে বলা — মহাশয়, আপনার ব্যাপারে আমি সব জানি। কোথায়

কোন রমণীর সঙ্গে কত রাত কাটিয়েছেন তা আমি জানি। আমার পরিবারে আপনার মতো লম্পট ভদ্রলোকের কোন জায়গা হতে পারে না। এখানে নিষ্পাপ পবিত্র মেয়েরা আছে, দয়া করে চলে যান এখান থেকে।

কিছু বলা'ত দূরে থাক, যখন এ-ধরণের কোনো ভদ্রলোক আমার মেয়ে বা বোনের কোমড় জড়িয়ে ধরে নাচতে থাকেন, তখন তিনি সঙ্গতিসম্পন্ন বা প্রতাপশালী হলে'ত আমরা অত্যন্ত খুশী হই। লম্পটরূপে বাত্রি যাপনের পবও তিনি আমার কন্যা বা মেয়েকে সু-নজরে দেখবেন এটাই আমরা প্রত্যাশা করি। দূষিত হন তিনি, দুরারোগ্য রোগ থাকুক তার, এতে কিছু যায় আসে না। .... উচ্চ সমাজের কয়েকটি মা নিজেদেব মেয়েদেব সিফিলিস রোগীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে অত্যন্ত কৃতার্থবোধ করেছিলেন। আমি জানি। উঃ, কি নোংরা ব্যাপার! এ-নোংরামি আর মিথ্যার মুখোশ কোনো দিন খুলে যাবে কি!

হাজারটি লোক বিয়ে করে সামাজিক ভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে। কিন্তু, সে-যে গোপনে কয়টি বিয়ে করেছে সে খবর কেউ রাখে কি? অন্তত দশ বার বিয়ে করেছে সে ইতিমধ্যে। আর ডন জুয়ানের মতো শতাধিক বা সহস্রবার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে এমন লোক'ত আছেই।

আপনারা হয়তো বলবেন বেশ্যালয়ের মেয়েদের থেকে আলাদা কোনো উদ্দেশ্য আমাদের সমাজের মেয়েদের রয়েছে। কিন্তু, আমাব অভিজ্ঞতা অন্য রকম। প্রমাণও দিতে পারি। তাদের জীবনে স্বতন্ত্র কোনো উদ্দেশ্য থাকলে, জীবনেব মাপকাঠি আলাদা হলে তাদেব জীবনের বাহ্যিক রূপও আলাদা হতে বাধ্য। যে-সব দুর্ভাগা মেয়েবা আমাদের চোখে ঘৃণার পাত্র, তাদের দিকে তাকান, তারপর পরখ করে দেখুন সমাজের সর্বোচ্চ স্তরের মহিলাদের — সেই এক প্রসাধন, সেই একই কায়দা, সেই সেন্ট, সেই নগ্ন হাত, নগ্ন কাঁধ আর বুক; সেই পেছন ফাঁপানো ফ্রক; হীরে জহরৎ আর দামী চকচ্‌কে গয়নাগাটির ওপব সেই লোভ, সেই একই আমোদ প্রমোদ, নাচ আর গান বাজনা। পুরুষ পটাবার পদ্ধতি দু'শ্রেণীর মধ্যে একই। একটুও হেরফের নেই। চুলচেরা বিচার করতে গেলে বলা যায় - অল্পদিনের বেশ্যাদের আমরা ঘৃণা করি, দীর্ঘদিনের বেশ্যাদের সম্মান দেখাই।

বিয়ের পর আমার স্ত্রী আমাকে যতটা ঘৃণা করত, আমিও ঠিক ততোটা ঘৃণা করতাম তাকে। অবাক লাগত আমার। কিন্তু, যা পরিবেশ, এ-ছাড়া অন্য কিছু বুঝি হতেই পারত না। একই রকম অপরাধে দুই মহাপরাধীর প্ররোচনা দান ও অংশ গ্রহণের ফলস্বরূপই এ-ঘৃণা। বিয়ের এক মাসের মধ্যেই ও সন্তান সম্ভবা হল। তাও আমাদের পাশবিক ক্রীড়ার বিরাম ছিল না। এটা একটা অপরাধ'ত বটেই। ভাবছেন হয়তো আমি অবান্তর কথা বলছি। বিচারকালে ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল — কী ভাবে, কী দিয়ে ওকে আমি হত্যা করেছি। নির্বোধ সব! ওরা ভেবেছিল ওকে মেরেছি ছুরি দিয়ে। দিনটা ছিল অক্টোবরের পাঁচ তারিখ। তবে ওকে হত্যা করেছি অনেক আগে।

পুরষ ও স্ত্রীর গঠন ঠিক পশুদের মতো। ইন্দ্রিয়সর্বস্ব প্রেম। উপভোগের পর আসে গর্ভাবস্থা, খাওয়াতে হয় বাচ্চাকে। এই অবস্থায় সহবাস জননী ও শিশু উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকারক। নারী ও পুরুষ সংখ্যায় সমান। এটা কিসের ইঙ্গিত? সংযমের ইঙ্গিত। পশুদের এ-সিদ্ধান্তে পৌছুতে মহাজ্ঞান সঞ্চয় করতে হয় না। কিন্তু আমরা মহাজ্ঞানী হয়েও তা করি না। রক্তে লিউকোসাইটের সঞ্চরণে ইত্যাদি অনেক তুচ্ছ ব্যাপার বুদ্ধি খাটিয়ে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু ওপরের কথাটা বোঝার মতো বুদ্ধি তাদের হয় নি। অন্তত ভুল করে হলেও ব্যাপারটা তাদের

মুখে আসে না।

প্রকৃতির বিরোধিতা করে নারীকে একই সঙ্গে হতে হয় প্রসূতি, জননী ও স্বামীর রক্ষিতা। এ-অবস্থা কিন্তু কোনো পশুও মেনে নেয় না। এ-সব কটি দায়িত্ব একসাথে পালন করার ক্ষমতা মেয়েদের নেই। তাই আমাদের মেয়েদের স্নায়ুবিকার ও হিস্টিরিয়ায় ভুগতে হয়। অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর মেয়েরা হয়ে দাঁড়ায় 'ক্লিকুশি'। দেখুন না নিষ্পাপ মেয়েবা, অল্প বয়সী মেয়েরা 'ক্লিকুশি' হয় না। সেটা হয় তাদেরই যারা পুরুষদের কামানলে দগ্ধ হয়।

বিজ্ঞানের মাননীয় পন্ডিত ব্যক্তিরা অতীব বিনয়ের সঙ্গে এটা প্রচার করে থাকেন, বেশ মোলায়েম ভাবে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে থাকেন পুরুষের পক্ষে নারী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নারীদের জোর করে এ-কাজে লাগালে তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে এ-সব সমাজ সচেতন আচার্যরা কী বলেন জানতে ইচ্ছে করে। মানুষকে বুঝিয়ে বলুন যে ভোদকা, তামাক ও আফিম তার প্রয়োজনীয়, অমনি সেগুলো তার প্রয়োজন হয়ে পড়বে। মনে হয় ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন বেঠিকভাবে। কারণ, তিনি মানুষের পক্ষে কোনটা অপরিহার্য সে-বিষয়ে আমাদের মতামত নেননি। পুবষ ঠিক করে নিয়েছে — লালসার পরিতৃপ্তি ঘটানো চায় যে কোনো ভাবে। এ-ক্ষেত্রে শিশুর জন্ম দান, তার লালন পালন কোন কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আচার্যদের কি এ-ক্ষেত্রে কিছুই কবণীয় নেই? উঃ, ডাক্তারদের মিথ্যার মুখোশ যে কবে খুলে যাবে!

জন্তু জানোয়াররাও জানে বংশ রক্ষার জন্য বাচ্চার দরকার, আর এ-বিষয়ে প্রকৃতির সুপরিমিত নিয়মই মেনে চলে তারা। এ-জ্ঞানটুকু নেই শুধু মানুষের। জানার ইচ্ছাও নেই। সে শুধু চায় প্রাণভরে ভোগ করে নিতে। অথচ সে নাকি সৃষ্টির সেরা জীব, বিশ্ব চরাচরের অধিপতি! সন্তান জন্মানোর দরকার যখনই মনে করে তখনই শুধু পশুরা সহবাস করে। আর বিশ্বচরাচরের ঈশ্বর মানুষ যখন তখন সহবাস করে শুধু ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করার জন্য। এ-ভাবে সত্য ও মঙ্গলের পথে পুরুষের যার নম্র সহচরী হওয়া জরুরী, সে কেবল পুরুষের ভোগবস্তু হয়ে থাকে এবং মানসিক দিক দিয়ে শত্রু হয়েই থাকে।

কলেজে, অফিস আদালতে মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়, অথচ ওরা যে ভোগের মাল পুরুষের এ-মনোভাবটা পাল্টায় না। যত দিন মেয়েদের এ-ভাবে নিজেদের দেখতে শেখানো হবে ততদিন ওরা নীচু স্তরের জীব হয়েই থাকবে। তারা অর্থপিশাচ, বিবেকহীন ডাক্তারদের সাহায্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করবে, অর্থাৎ পুরোপুরি বেশ্যায় পরিণত হবে। ওরা পশুও নয়। বস্তু, শুধু ভোগ্যবস্তু। এদের অনুভূতি থাকতে নেই, আধ্যাত্মিক বিকাশের সুযোগ নেই।

স্কুল কলেজ এ অবস্থা পাল্টাতে পারে। না, এ-ক্ষেত্রে যা জরুরী তা হল মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষের মনোভাবের পরিবর্তন। মেয়েদেরও আত্মসচেতন হয়ে উঠতে হবে, সম্ভ্রমশীলা হয়ে উঠতে হবে। মেয়েরা যখন সতীত্ব বা কুমারী অবস্থাকে সব চেয়ে উঁচু স্তরের জিনিস বলে মনে করবে, এখনকার মতো লজ্জা ও নিন্দার জিনিস নয়, তখনই শুধু মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে"।